প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষা

ডিপিএড

এক্সপ্রেসিভ আর্ট

তথ্যপুস্তক

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী (নেপ)
ময়মনসিংহ
ডিসেম্বর ২০১৯

প্রথম সংস্করণ ও পরিমার্জিত সংস্করণ ২০১৪	পরিমার্জিত সংস্করণ ২০১৯
লেখক এ. এইচ.এম বশির উল্লাহ প্রফেসর সুমিতা নাহা মজুমদার পরিতোষ কুমার মোহাম্মদ ফরিদ হোসেন মজুমদার পরিতোষ কুমার (পরিমার্জিত সংস্করণ ২০১৫) নিরেশ চন্দ্র মুখার্জি (পরিমার্জিত সংস্করণ ২০১৫) আহম্মেদ জাকি রায়হান (পরিমার্জিত সংস্করণ ২০১৫)	**লেখক** কৃষ্ণা রানী বসু মো: আব্দুল আল মামুন খান মাহবুব মোস্তফা
কারিগরি পরামর্শক ও গ্রুপ লিডার এ. এইচ.এম বশির উল্লাহ	**কারিগরি পরামর্শক ও গ্রুপ লিডার** -
বিশেষজ্ঞ পাঠক প্রফেসর সালেহ মতিন	**বিশেষজ্ঞ পাঠক** মো: রবিউল ইসলাম রতন কুমার সরকার
পরামর্শক রবার্ট জেফকট্	**পরামর্শক** -
সম্পাদক আমিরুল ইসলাম (পরিমার্জিত সংস্করণ ২০১৫)	**সম্পাদক** তাপস কুমার বিশ্বাস রতন কুমার সরকার
কারিগরি পরামর্শ ও সার্বিক তত্ত্বাবধান প্রফেসর শামিম আহমেদ টিম লিডার ডিপিএড কার্যক্রম	**কারিগরি পরামর্শ ও সার্বিক তত্ত্বাবধান** তাপস কুমার বিশ্বাস

মুখবন্ধ

বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতার মানোন্নয়নে সার্টিফিকেট ইন এডুকেশন (সি-ইন-এড) কোর্সটি সুদীর্ঘকাল উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে আসছে। দেশের সরকারি ও বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অধিকাংশ শিক্ষক সি-ইন-এড প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের শিখন চাহিদায় পরিবর্তন এসেছে। পরিবর্তিত পরিস্থিতির প্রয়োজনে শিক্ষক-উন্নয়ন কার্যক্রমেরও পরিবর্তন অপরিহার্য হয়ে পড়ে। বাংলাদেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রচলিত সি-ইন-এড কোর্সটিকে পরিবর্তন করে ২০১১ সালে ডিপ্লোমা ইন প্রাইমারি এডুকেশন (ডিপিএড) কোর্স চালু করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ডিপিএড এর ৭টি বিষয়ের ১০টি তথ্যপুস্তক ও ইন্সট্রাক্টরদের জন্য ১০টি নির্দেশিকা ছাড়াও শিক্ষাক্রম, মূল্যায়ন নির্দেশিকা, পিটিআই শিক্ষার্থী এবং প্রশিক্ষণ বিদ্যালয়ের জন্য ৩টি নির্দেশিকাসহ মোট ২৯টি ডিপিএড সামগ্রী প্রণয়ন করা হয়। পরীক্ষামূলকভাবে ২০১২ সালের জুলাই মাস থেকে ৭টি পিটিআইতে ডিপিএড কোর্সটি চালু করা হয়। সরকার ডিপিএড কোর্সের চাহিদা মোতাবেক জনবল ও ভৌত সুবিধা সৃষ্টি করার প্রয়োজনে পিটিআইসমূহে পর্যায়ক্রমে এই কোর্স চালু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। পরীক্ষামূলকভাবে চালুকৃত কোর্সটি সফলভাবে বাস্তবায়নের ফলে ২০১৩ সালের জুলাই মাস থেকে ২৯টি, ২০১৫ সালের জানুয়ারি মাস থেকে ৩৬টি, ২০১৬ সালের জানুয়ারি মাস থেকে ৫০টি, ২০১৭ সালের জানুয়ারি মাস থেকে ৬০টি এবং ২০১৮ সালের জানুয়ারি মাস হতে ৬৬টি পিটিআইতে তা সম্প্রসারিত হয়। এভাবে পর্যায়ক্রমে সম্প্রসারণের পর ২০১৯ সালে ৬৭টি পিটিআইতে ডিপিএড কোর্স চালু করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রচলিত সার্টিফিকেট ইন এডুকেশন (সি-ইন-এড) থেকে ডিপিএড কোর্সটির ধ্যান ধারণাসহ বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া আমাদের দেশে সম্পূর্ণ নতুন। কোর্সটিকে মানসম্পন্ন করার লক্ষ্যে কোর্স সামগ্রী ও নির্দেশিকা সামগ্রীগুলোতে পিটিআই এর প্রয়োজনে পরিমার্জন প্রয়োজন হয়। সে অনুসারে ২০১৪ সালে পুস্তকগুলোতে মুদ্রণভ্রান্তিসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে সুপারিশকৃত কিছু পরিবর্তন নিয়ে আসা হয়।

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী (নেপ) ডিপিএড কোর্সের গুণগত মান নিশ্চিতকরণের জন্য প্রতিবছর পিটিআইসমূহ মনিটরিং করে। নেপ ডিসেম্বর ২০১৪ পর্যন্ত ১০টি মনিটরিং প্রতিবেদন প্রণয়ন করে। উক্ত মনিটরিং প্রতিবেদন, পিটিআই ইন্সট্রাক্টরগণের বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ এবং সুপারিনটেনডেন্টগণের সুপারিশের আলোকে ২০১৫ সালে কোর্স সামগ্রী এবং নির্দেশিকা বইগুলোতে কিছু নতুন বিষয় সংযোজন এবং উপস্থাপনের ক্ষেত্রে কিছু পরিবর্তনসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তু এবং নির্দেশনা বাস্তব ও মানসম্পন্ন করে পরিমার্জন

করা হয়েছে। এই কোর্সটির টিম লিডার এবং গ্রুপ লিডারগণ মনিটরিং রিপোর্টের তথ্য ও সুপারিশ বিশ্লেষণ করে উল্লিখিত ডিপিএড সামগ্রীগুলোতে প্রয়োজনীয় পরিমার্জন, সংযোজন ও বিয়োজন করেছেন। সফলভাবে পরিমার্জনের কাজটি সম্পন্ন করার জন্য প্রাক্তন মহাপরিচালক জনাব মোঃ নাজমুল হাসান খান, মরহুম মোঃ ফজলুর রহমান, টিম লিডার প্রফেসর শামিম আহমেদসহ গ্রুপ লিডার, লেখক এবং সম্পাদকবৃন্দকে আমি জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ। এই পরিমার্জন কাজে নেপ অনুষদ সদস্যবৃন্দ বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেছেন। সুষ্ঠুভাবে দায়িত্ব পালনের জন্য আমি তাঁদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

ডিপিএড কোর্সের গুণগতমান উন্নয়নের জন্য ৩১ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, আই.ই.আর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা (নেপ) এর মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষরিত হয়। সেপ্রেক্ষিতে আই.ই.আর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ২০১৮ সালে ১০টি ডিপিএড কোর্স সামগ্রী-তথ্যপুস্তক এবং পিটিআই ইন্সট্রাক্টরগণের জন্য ১০টি নির্দেশিকা পরিমার্জন করে। এক্ষেত্রে এনসিটিবি এর প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রমের সাথে ডিপিএড এর বিষয়বস্তুর সমন্বয় সাধন করা হয়েছে। তাছাড়া এনসিটিবি কর্তৃক প্রণীত শিক্ষক সংস্করণের শিখন-শেখানো কার্যক্রমের সাথে মিল রেখে ডিপিএড এর পাঠ-পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে আই.ই.আর কর্তৃক নির্বাচিত লেখকবৃন্দ, রিভিউয়ারগণ এবং ডিপিএড টিম যথেষ্ট সহযোগিতা করেছেন। এজন্য আমি তাঁদেরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। আই.ই.আর এর পরিচালক অধ্যাপক সৈয়দা তাহমিনা আখতার এবং ডিপিএড কো-অর্ডিনেটর অধ্যাপক ড. শারমীন হক বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন, সেজন্য আমি পরিচালক মহোদয়, কোর্ডিনেটর ও ডিপিএড টিম এর নিকট আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রশিক্ষণ) আমাদেরকে অনেক সহযোগিতা করেছেন। সেজন্য আমি পরিচালক মহোদয় ও তাঁর সহকর্মীদের ধন্যবাদ জানাই। অনুরূপভাবে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এবং অতিরিক্ত মহাপরিচালক মহোদয় বিভিন্নভাবে সহায়তা ও পরামর্শ দিয়েছেন, সেজন্য আমি তাঁদেরকে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা জানাই। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়, অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), যুগ্মসচিব (উন্নয়ন) মহোদয়সহ অন্যান্য কর্মকর্তাদের সুচিন্তিত নির্দেশনায় এই পুস্তকগুলোর কাঙ্ক্ষিত মান অর্জন সম্ভব হয়েছে। সেজন্য আমি তাঁদেরকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

পরিশেষে আমি মনে করি এই পরিমার্জিত পুস্তকগুলো পিটিআই ইন্সট্রাক্টর ও শিক্ষার্থীসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সহায়তা দিয়ে কোর্সটির কাঙ্ক্ষিত উন্নয়নের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার সামগ্রিক মান অর্জনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

মোঃ শাহ আলম
মহাপরিচালক
জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ)
ময়মনসিংহ।

পরিমার্জিত সংস্করণ ২০১৯

ডিপ্লোমা ইন প্রাইমারি এডুকেশন (ডিপিএড) কার্যক্রম বাংলাদেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের পেশাগত উন্নয়নে একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। এ কার্যক্রম সম্পন্ন করার ফলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ তাঁদের পেশাগত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনে প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা ও মূল্যবোধ অর্জন করবেন বলে আশা করা যায়। ৩১ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর (ডিপিই), জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী (নেপ) এবং শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইআর), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের মধ্য দিয়ে আইইআর এ কার্যক্রমের সাথে আনুষ্ঠানিকভাবে যুক্ত হয়। সমঝোতা স্মারক অনুযায়ী আইইআর ডিপিএড কার্যক্রম সফলভাবে সম্পন্নকারী শিক্ষার্থীবৃন্দের সনদ প্রদান করার পাশাপাশি এ কার্যক্রমের মানোন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পাদন করছে। সম্পাদিত বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্যে ডিপিএড শিক্ষাক্রম, তথ্যপুস্তক ও ইনস্ট্রাক্টর নির্দেশিকা পরিমার্জন অন্যতম।

শিক্ষাক্রম, তথ্যপুস্তক ও ইনস্ট্রাক্টর নির্দেশিকা পরিমার্জনের কাজ একটি সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়া অনুসরণ করে সম্পাদন করা হয়েছে। এ পরিমার্জনের একটি অন্যতম ভিত্তি ছিল ডিপিএড মানোন্নয়নের ক্ষেত্র শনাক্তকরণের লক্ষ্যে পরিচালিত চাহিদা নিরূপণ (Need assessment)। পরিমার্জনের প্রথম ধাপটি ছিল বর্তমানে প্রচলিত ডিপিএড শিক্ষাক্রম, তথ্যপুস্তক ও ইনস্ট্রাক্টর নির্দেশিকা পর্যালোচনা। চাহিদা নিরূপণ থেকে ডিপিএড কার্যক্রমের বিভিন্ন দিকের ওপর প্রাপ্ত ফলাফল এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক শিক্ষাক্রম ও পুস্তক মূল্যায়ন নীতিমালা অনুসরণ করে পর্যালোচনার বিষয়ভিত্তিক সূচক নির্ধারণ করা হয়। জাতীয় পর্যায়ের অভিজ্ঞ পর্যালোচকগণ নির্ধারিত সূচকসমূহের আলোকে শিক্ষাক্রম, তথ্যপুস্তক ও ইনস্ট্রাক্টর নির্দেশিকা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যালোচনা করে প্রতিবেদন তৈরি করেন।

ডিপিএড-এর প্রতি বিষয়ের শিক্ষাক্রম, তথ্যপুস্তক ও ইনস্ট্রাক্টর নির্দেশিকা পরিমার্জনের জন্য বিশেষজ্ঞ দল গঠন করা হয়। বিশেষজ্ঞ দলে আইইআর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-এর শিক্ষকবৃন্দের নেতৃত্বে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও টিচার্স ট্রেনিং কলেজের শিক্ষক, নেপ এর অনুষদ সদস্যবৃন্দ, পিটিআই এর সুপারিনটেনডেন্ট, সহকারী সুপারিনটেনডেন্ট ও ইনস্ট্রাক্টর এবং ডিপিই এর কর্মকর্তাগণ কাজ করেছেন। স্ব স্ব বিষয়ের পর্যালোচনা প্রতিবেদন, চাহিদা নিরূপণ গবেষণার ফলাফল এবং পরিমার্জিত শিক্ষাক্রম অনুযায়ী একটি নির্দেশনা প্রস্তুতপূর্বক বিশেষজ্ঞ দলের নিকট সরবরাহ করা হয়। প্রদত্ত নির্দেশনা অনুযায়ী বিষয়ভিত্তিক বিশেষজ্ঞগণ তাঁদের ওপর অর্পিত পরিমার্জনের প্রাথমিক খসড়া প্রস্তুত করেন যা পরবর্তি কালে বিভিন্ন স্তরে পরিমার্জন ও সম্পাদনার মাধ্যমে চূড়ান্ত করা হয়।

এই পরিমার্জিত সংস্করণে এক্সপ্রেসিভ আর্ট বিষয়ে যে পরিবর্তনগুলো স্থান পেয়েছে তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য ক্ষেত্রগুলো হলো-

চারু ও কারুকলা বিষয়ে ত্বাত্তিক ও ব্যবহারিক ক্লাসের উপর ভিত্তি করে প্রত্যেকটি অধ্যায় বিভাজন করা হয়েছে। প্রতিটি অধ্যায়ের জন্য নতুন নতুন ছবি সংযোজন করা এবং সমৃদ্ধ তথ্য দিয়ে সাজানো হয়েছে। মূল্যায়নের জন্য রুব্রিক দেওয়া হয়েছে। এছাড়া নমুনা পাঠ পরিকল্পনা সহ নতুন একটি অধ্যায় সংযোজন করা হয়েছে।

সংগীত বিষয়ে শিশুদের জন্য সংগীত শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা এবং সংগীত শিক্ষায় শিক্ষকের করণীয় বিষয়টি সংযোজন করা হয়েছে। স্বরের শ্রেণিবিন্যাস পরিষ্কার করে তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়াও নমুনা পাঠ পরিকল্পনা সংযোজিত হয়েছে। সংগীতে ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রকার বাদ্য যন্ত্রের ছবি এবং সহায়ক পাঠ্যপুস্তকের নাম দেওয়া হয়েছে।

শারীরিক শিক্ষা বিষয়ে বিশ্ববরেণ্য খেলোয়াড়দের পরিচিতি এবং কলসিন্দুরের মেয়েদের কীর্তিগাথা বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আঞ্চলিক খেলার গুরুত্ব প্রাঞ্জলভাবে উপস্থাপনের নিমিত্তে নতুন ছবি সংযোজন করা হয়েছে। নমুনা পাঠ পরিকল্পনা একটির পরিবর্তে দু'টি করা হয়েছে।

'পরিমার্জিত সংস্করণ ২০১৯'-এ যে সকল সংযোজন-বিয়োজন সম্পাদিত হয়েছে তা ডিপিএড কার্যক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে অত্যন্ত ইতিবাচক ভূমিকা পালন করবে বলে আমার বিশ্বাস। পরিমার্জনের কাজ সফলভাবে সম্পন্ন করার জন্য বিভিন্ন বিষয় সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ, লেখক, সম্পাদক ও সমন্বয়কবৃন্দকে জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ। এই পরিমার্জন কাজে আইইআর ডিপিএড টিমের সম্মানিত সদস্যগণ বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেছেন। কাজটি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনে তাঁদের ভূমিকা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি।

শিক্ষাক্রম, তথ্যপুস্তক ও ইনস্ট্রাক্টর নির্দেশিকাসহ ডিপিএড মানোন্নয়ন কর্মকাণ্ডে আইইআর ডিপিএড টিমকে সর্বাত্মক সহায়তা ও সমর্থন প্রদানের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবং আইইআর-এর পরিচালক ও শিক্ষকবৃন্দকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এর সচিব, অতিরিক্ত সচিববৃন্দ এবং অন্যান্য কর্মকর্তাদের প্রতি যারা ডিপিএড কার্যক্রমের মানোন্নয়নে আইইআর এর গৃহীত কর্মকাণ্ডে সমর্থন দিয়ে আসছেন। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এর মহাপরিচালক, অতিরিক্ত মহাপরিচালক, পরিচালক (প্রশিক্ষণ) ও পরিচালক (অর্থ ও সংগ্রহ) অন্যান্য কর্মকর্তাদের প্রতি জানাচ্ছি অশেষ কৃতজ্ঞতা যারা বিভিন্ন সময়ে আইইআর কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমে দিক নির্দেশনা ও সহযোগিতা প্রদান করেছেন।

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী (নেপ) এর বর্তমান ও প্রাক্তন মহাপরিচালকবৃন্দ, পরিচালক, উর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞবৃন্দ ও অন্যান্য কর্মকর্তাগণ যারা এ পরিমার্জন কাজে সক্রিয়ভাবে সহায়তা করেছেন তাঁদেরকে জানাচ্ছি আন্তরিক ধন্যবাদ।

পরিশেষে,'পরিমার্জিত সংস্করণ ২০১৯' ডিপিএড কোর্সের মানোন্নয়ন তথা প্রাথমিক শিক্ষকগণের প্রত্যাশিত শিক্ষকমান অর্জনের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে বাংলাদেশে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রযাত্রাকে ত্বরান্বিত করবে বলে আশা করছি।

অধ্যাপক সৈয়দা তাহমিনা আখতার
পরিচালক
শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

অধ্যাপক ড. শারমিন হক
কো-অর্ডিনেটর (জুন ২০১৮ পর্যন্ত)
ডিপিএড মান উন্নয়ন কর্মসূচি
শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

অধ্যাপক ড. মো: আব্দুল মালেক
কো-অর্ডিনেটর
ডিপিএড মান উন্নয়ন কর্মসূচি
শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

সূচিপত্র

চারু ও কারুকলা

বিষয়	পৃষ্ঠা
অধ্যায় - এক	
এক্সপ্রেসিভ আর্ট এবং শিশু বিকাশে এর গুরুত্ব	
চারু ও কারুকলার পরিধি, প্রয়োজনীয়তা এবং পার্থক্য	
চারু ও কারুকলার ব্যবহারিক দিক	
ছবি আঁকার উপকরণ	
চারু ও কারুকলার সঙ্গে অন্যান্য পাঠ্য বিষয়ের সম্পর্ক	
অধ্যায় - দুই	
প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক পর্যায়ে খেয়াল খুশিমত ছবি আঁকার গুরুত্ব ও শিখন শেখানোর কৌশল	
পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ছবি আঁকা	
জাতীয় ফুল, ফল, মাছ, পাখি, জাতীয় পতাকা, স্মৃতিসৌধ ও শহিদ মিনার অঙ্কন	
রং ও এর ভাবার্থ	
ড্রইং, রেখাচিত্র, স্কেচ, প্রাকৃতিক দৃশ্য, জলরং ও পেস্টেল এ ছবি আঁক	
অধ্যায় - তিন	
রঙ্গিন ও সাদা কাগজ কেটে নকশা ও কাগজের মন্ড দিয়ে মডেল / সৃজনশীল শিল্পকর্ম তৈরি করা	
মাটি ও পাট দিয়ে বিভিন্ন মডেল তৈরি	
খেজুরপাতা, নারিকেল পাতা ও ডিমের খোসা দিয়ে শিল্পদ্রব্য তৈরি	
অধ্যায় - চার	
আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে ছবি আঁকা	
চারুও কারুকলা বিষয়ে শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	
পাঠ পরিকল্পনা	
সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি	

সংগীত		
ক্রম নং	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা নং
১	সংগীত	
২	ছড়া গান: প্রিয় ফুল শাপলা ফুল	
৩	ছড়া গান: প্রজাপতি! প্রজাপতি!	
৪	ছড়া গান: আমরা সবাই রাজা	
৫	বিশ্বসংগীত: আমরা করব জয়	
৬	একুশে ফেব্রুয়ারির গান	
৭	জাতীয় সংগীত	
৮	দেশাত্মবোধক গান: ধন ধান্য পুষ্প ভরা	
৯	উদ্দীপনামূলক গান: চল্ চল্ চল্	
১০	হামদ: এই সুন্দর ফুল	
১১	লোক সংগীত: আল্লা মেঘ দে	
১২	শ্রমের মর্যাদা সম্পর্কিত গান: নিজের হাতে কাজ কর	
১৩	প্রার্থনা সংগীত: আনন্দলোকে, মঙ্গলালোকে	
১৪	মুক্তিযুদ্ধের গান: রক্ত দিয়ে নাম লিখেছি	
১৫	পাঠ পরিকল্পনা	
১৬	বিভিন্ন প্রকার বাদ্যযন্ত্রের ছবি	
১৭	বিস্তৃত শিক্ষাক্রম	
১৮	সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী	

শারীরিক শিক্ষা

বিষয় পৃষ্ঠা

প্রথম অধ্যায়ঃ সর্বাঙ্গীন বিকাশে শারীরিক শিক্ষা

- শারীরিক শিক্ষার পটভূমি, সংজ্ঞা
- শারীরিক শিক্ষার শ্রেণিবিভাগ
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শারীরিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ খেলাধুলার নিয়ম কানুন ও কৌশল

- প্রধান খেলা (মেজর গেমস্) – ফুটবল, ক্রিকেট, ভলিবল, ব্যাডমিন্টন ও হ্যান্ডবল
- স্বল্প পরিসর খেলা (মাইনর গেমস) – কাবাডি, দাড়িয়াবাঁধা, গোল্লাছুট
- এ্যাথলেটিকস – দৌড়, লাফ ও নিক্ষেপ
- সাঁতার – মুক্ত সাঁতার, চিৎ সাঁতার, বুক সাঁতার, প্রজাপতি সাঁতার
- মাইনর গেমস (মজার খেলা)

তৃতীয় অধ্যায়ঃ খেলাধুলার সংগঠন

- খেলাধুলা পরিচালনা পদ্ধতি
- বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা
- প্রাত্যহিক সমাবেশ

চতুর্থ অধ্যায়ঃ ব্যায়াম ও প্রাথমিক প্রতিবিধান

- মুক্তহস্ত ব্যায়াম
- বাঁশ বা বেতের সাহায্যে ব্যায়াম
- প্রাথমিক প্রতিবিধান

পঞ্চম অধ্যায়ঃ স্কাউট

- কাব-স্কাউটিং:- স্কাউট আন্দোলনের জনক ও স্কাউটিংয়ের পটভূমি
- ইউনিট লিডার
- ক্রমোন্নতিশীল প্রশিক্ষণ পদ্ধতি (ব্যাজ পদ্ধতি) ও কাব প্রোগ্রাম (Progressive training)

ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ বিশ্ববরেণ্য খেলোয়াড়দের পরিচিতি

- কলসিন্দুরের মেয়েদের কীর্তিগাথা

সপ্তম অধ্যায়ঃ পাঠ পরিকল্পনা, শিখনক্রম

- নমুনা পাঠ পরিকল্পনা
- সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

চারু ও কারুকলা

অধ্যায় - এক

- এক্সপ্রেসিভ আর্ট এবং শিশু বিকাশে এর গুরুত্ব
- চারু ও কারুকলার পরিধি, প্রয়োজনীয়তা এবং পার্থক্য
- চারু ও কারুকলার ব্যবহারিক দিক
- ছবি আঁকার উপকরণ
- চারুও কারুকলার সঙ্গে অন্যান্য পাঠ্য বিষয়ের সম্পর্ক

এক্সপ্রেসিভ আর্ট এবং শিশু বিকাশে এর গুরুত্ব

এক্সপ্রেসিভ আর্ট

এক্সপ্রেসিভ আর্ট নান্দনিক বোধ ও সৃজনশীলতা বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শিল্পের বিভিন্ন মাধ্যম; যেমন– চারু ও কারুকলা, সংগীত, নৃত্য, অভিনয়, খেলাধুলা, সাহিত্য, ভাস্কর্য ইত্যাদি সবই হলো প্রকাশধর্মী কলা। এই মাধ্যমগুলো ব্যবহারে বিভিন্ন ধরনের দক্ষতা–বুদ্ধিগত, শারীরিক, সামাজিক, মানসিক–বৃদ্ধির সুযোগ তৈরি হয়। প্রাক-

প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে প্রকাশধর্মী কলাবিদ্যা ব্যবহার করে একক ও দলীয়ভাবে কাজের মাধ্যমে শিশুদের সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশ ঘটে এবং তাদের আবেগ ও মনন শক্তি সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়। সর্বোপরি নিজেকে, অন্যকে এবং পারিপার্শ্বিককে বোঝার মধ্য দিয়ে শিশুর মূল্যবোধের যে বিকাশ ঘটে, তা তাকে আত্মপ্রত্যয়ী করে গড়ে তোলে।

প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাকে বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে ডিপিএড প্রোগ্রামে এক্সপ্রেসিভ আর্ট অন্যতম একটি বিষয় হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ বিষয়টিতে চারু ও কারুকলা, সংগীত এবং শারীরিক শিক্ষা বিষয়গুলোকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। খুব সহজ বিচরণের মধ্য দিয়ে এই বিষয়গুলোর সঙ্গে শিশুর পরিচয় ও আত্মপ্রকাশের সুযোগ ঘটে। তাই প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে পাঠদানের ক্ষেত্রে প্রকাশমূলক শিল্পকলার গুরুত্ব অনেক বেশি। ডিপ্লোমা কোর্সটিতে তিনটি বিষয় নিয়ে এক্সপ্রেসিভ আর্টের ধারণাটি আলোচনা করা হয়েছে। এগুলো হলো–

✓ চারু ও কারুকলা

মানুষ আপন মনে নিজের অনুভুতিকে প্রকাশ করার জন্য দেয়ালে, মেঝেতে, মাটিতে, কাগজে ও বালিতে আঙ্গুল, কাঠ-কয়লা, চক, পেন্সিল ইত্যাদি দিয়ে ছবি আঁকা শুরু করে। এর মাধ্যমে তার সৃজনীশক্তি, কল্পনা শক্তি, নান্দনিকবোধ ইত্যাদির বিকাশ ঘটে।

✓ সংগীত

স্বাভাবিকভাবেইবেশির ভাগ মানুষ গান পছন্দ করে এবং শৈশব থেকে অনেকেই গান গাইতে চেষ্টা করে। তাই গানের মাধ্যমে শিশু শ্রেণিতে পাঠদান ফলপ্রসূ হয়। এতে, একদিকে শিশু গান গাইতে শেখে অন্যদিকে তার সুকুমার বৃত্তির বিকাশ ঘটে। এভাবে পাঠদানকালে সংগীত ব্যবহার করে বিভিন্ন বিষয় প্রাণবন্তভাবে উপস্থাপন করা যায়।

✓ শারীরিক শিক্ষা

শিশু স্বভাবতই খেলাধুলা পছন্দ করে। নিয়মমাফিক শরীরচর্চা ও খেলাধুলার মাধ্যমে শিশুর যে শৃঙ্খলাবোধ তৈরি হয়, তা তাকে জীবনের সর্বক্ষেত্রেই দায়িত্বশীল করে গড়ে তোলে। সৃজনীশক্তি বিকাশে এই দায়িত্ববোধ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

শিশু বিকাশে এক্সপ্রেসিভ আর্ট

প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষার সার্বিক পাঠদানের ক্ষেত্রে এ বিষয়টির গুরুত্ব অপরিসীম। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম যা শিশুর ব্যক্তিত্বপূর্ণ বিকাশ ও আজীবন শিখনের ভিত্তি তৈরি এবং আনুষ্ঠানিক শিক্ষার প্রথম সোপান ও প্রস্তুতি হিসেবে কাজ করে। যদিও আনুষ্ঠানিক শিক্ষা শুরুর পূর্ববর্তী এক বছর প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার জন্য নির্ধারিত, এর ব্যাপ্তি ও পরিধি শুধু এই সময়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। শিশু জন্মের পর প্রতিনিয়ত যে অভিজ্ঞতা, অনানুষ্ঠানিক শিখন ও পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বড় হতে থাকে, তা তার বৃদ্ধি ও বিকাশের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পরিবর্তনের প্রতিটি ধাপের অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতার উপর ভিত্তি করেই শিশু পরবর্তী ধাপে পৌঁছায়। প্রারম্ভিক শৈশবে শিশুর এ পরিবর্তনের হার অন্যান্য সময়ের তুলনায় দ্রুত ও ব্যাপক বলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভর্তির পূর্ব সময় পর্যন্ত শিশু অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ ধাপ অতিক্রম করে। এ সময় শিশুর যথাযথ বেড়ে ওঠা ও শিখনই হচ্ছে তার প্রাথমিক শিক্ষা শুরুর ভিত্তি। বিশেষ করে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ্য বিষয়গুলোর পাঠদানে এক্সপ্রেসিভ আর্ট একটি মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। এ বিষয়টির মাধ্যমে শ্রেণিকক্ষের কার্যাবলি সক্রিয় ও প্রাণবন্ত হয় এবং শিক্ষার্থীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে পাঠে অংশ গ্রহণ করে। চারু ও কারুকলা, সংগীত এবং শরীর চর্চার মাধ্যমে নির্ধারিত বিষয় সুন্দর ও সহজভাবে শেখানো যায়। পাঠে শিশুদের অংশগ্রহণ হয় অনেক বেশি প্রাণবন্ত।

এক্সপ্রেসিভ আর্ট এর বৈশিষ্ট্য

চারু ও কারুকলা, সংগীত এবং শারীরিক শিক্ষা–এই তিনের সমন্বয়ে শিশুদের বিষয় ভিত্তিক পাঠদান করলে একসাথে বিভিন্ন ধরনের দক্ষতা বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি হয়। তাছাড়া শিখন প্রক্রিয়া আনন্দদায়ক হয় বলে শিশুরা উক্ত বিষয় শিখনে মনোযোগী হয় এবং সৃজনীশক্তিকে কাজে লাগাতে চেষ্টা করে, যেমন-

- যে কোনো বিষয় সহজভাবে জানার ক্ষেত্রে শিশুকে আগ্রহী করে তোলা
- বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতাকে শিল্পকলার মাধ্যমে কাজে লাগাতে সাহায্য করা
- বিভিন্ন বিষয় ভিত্তিক জ্ঞানের পরিধি বিস্তারে সহায়ক ভূমিকা রাখা এবং শিখনকে দীর্ঘস্থায়ী করতে সাহায্য করা
- সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিকাশের ক্ষেত্রে চলার পথ সুগম করা
- চিন্তাশক্তি, দৈহিক ও মানসিক দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে শিশুকে আত্মপ্রত্যয়ী করে গড়ে তোলা
- শিশুর সৃজনী শক্তি, কল্পনাশক্তি ও আত্মপ্রকাশের দক্ষতা বৃদ্ধি করা
- নান্দনিক, মানবিক ও সামাজিক মূল্যবোধ গড়ে তুলতে সাহায্য করা
- বিভিন্ন বয়সের ও বিভিন্ন ধরনের শিক্ষার্থীর শিক্ষার জন্য আনন্দদায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করা

গুরুত্ব

শিক্ষায় এক্সপ্রেসিভ আর্টের গুরুত্ব অপরিসীম। এক্সপ্রেসিভ আর্ট মূলত মূর্ত থেকে বিমূর্ততাকে ধারণ করার জন্য যে কল্পনা তথা চিন্তাশক্তি প্রয়োজন তা বিকাশের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এ চিন্তাশক্তি তার জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত মূখ্য ভূমিকা পালন করে। এক্সপ্রেসিভ আর্টের মাধ্যমে যে কোন বিষয় ভিত্তিক পাঠদান আনন্দদায়ক করা যায়। তাছাড়া এক্সপ্রেসিভ আর্ট শিখনে বিরাট ভূমিকা পালন করে। শিশুরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে শিখন কাজে আগ্রহী হয়ে মনোযোগের সাথে ছবি আঁকে, গান গায় এবং দেহের অঙ্গভঙ্গির সমন্বয়ে খেলাধুলা করে। এর মাধ্যমে শিশুদের সৃজনী শক্তির বিকাশ ঘটে, উদ্ভাবনী ও কল্পনা শক্তির প্রসার ঘটে।

চারু ও কারুকলার পরিধি, প্রয়োজনীয়তা ও পার্থক্য

শিল্প কাকে বলে? শিল্পকলাকে কোন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে পরীক্ষা করব-এ সমস্ত প্রশ্ন দীর্ঘদিনের এবং মানুষ নানাভাবে এর উত্তর দেবারও চেষ্টা করছে। আমরা শিল্পকে সংক্ষেপে একথা বলে চিহ্নিত করতে পারি যে- শিল্প হচ্ছে সময়, স্থান এবং অনন্তবোধের পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের দৃষ্টিগ্রাহ্যতার একটি প্রতীক।

চারুকলা

চারুকলা শিল্পকলার একটা অংশ যা সবার নিকট সমাদৃত। চারুকলা বিষয়টি সরাসরিভাবে মন ও অনুভূতির সাথে সম্পর্কযুক্ত। চারুকলা মানুষের সৌন্দর্য ক্ষুধা নির্বৃত্ত করে মনে আনন্দদান করে।

শ্রীশচন্দ্র দাসের ভাষায়– ‘‘যে সৃষ্টির মধ্যে মানুষের প্রয়োজন সাধন অপেক্ষা অহেতুক আনন্দ বেশি, যাহাতে মানুষের জৈব অপেক্ষা আত্মিক ও মানসিক আনন্দ বেশি তাহাকে আমরা চারুকলা বা ললিতকলা বলিয়া আখ্যায়িত করিতে পারি।” আবার খ্যাতনামা লেখক ও দার্শনিক টলস্টয় বলেছেন যে, আর্ট বা চারুকলা দ্বারা একজন ব্যাক্তি সচেতনভাবে কতিপয় বাহ্যিক প্রক্রিয়া দ্বারা নিজের মনের অনুভূতি বা কোন ভাবকে এমনভাবে অপরের নিকট পৌঁছে দেয় যে অপরের মন সংক্রমিত হয়ে সেই ভাব বা অনুভূতিকে একইভাবে উপলব্ধি করতে পারে। আবার কোন কোন মনীষীর মতে, যা এক জনের মনের সৌন্দর্যকে (এটি কি বোধ? ভাব? ভাবনা) অপরের নিকট উপভোগ্য করে প্রকাশ করে তাই চারুকলা। যেমন, চিত্রকলা চারুকলার একটি ধরণ। একজন চিত্রশিল্পী ছবি এঁকে তার অনভূতি দর্শকের কাছে পৌছে দেন। শিল্পীর আঁকা ছবিটি দেখে একজন দর্শক শিল্পীর মনের ভাব অনুভূব করে আনন্দ লাভ করেন। এ ধরণের আনন্দ কোন বৈষয়িক আনন্দ নয়। নান্দনিক মূল্যবোধের বিকাশে চারু ও কারুকলার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

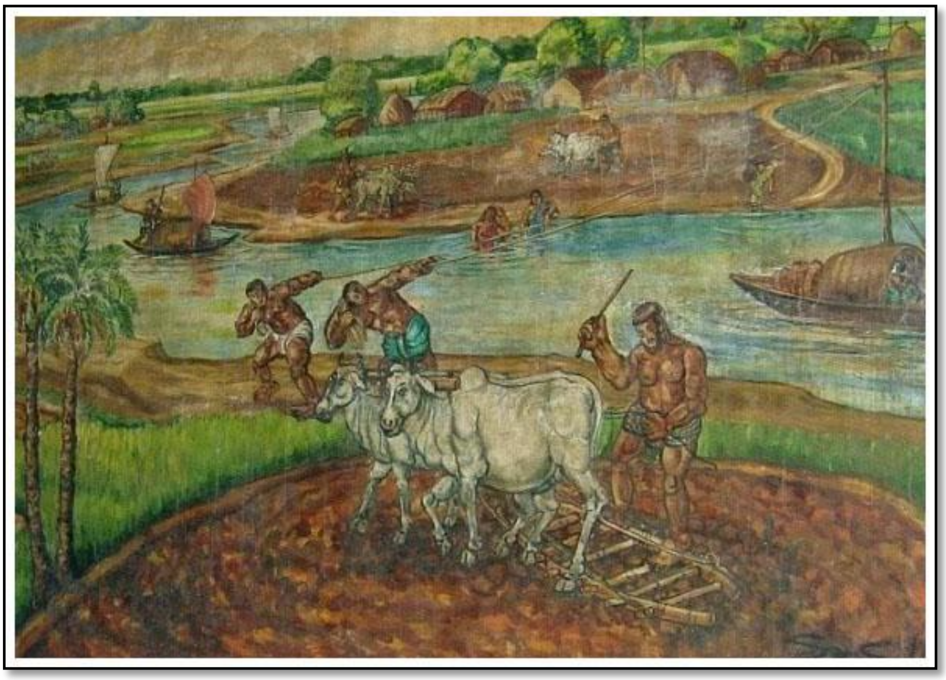

শিল্পী:এস এম সুলতান (তেল রং)

চারুকলার বিভিন্ন শাখা

চারুকলার মধ্যে বিভিন্ন শাখা রয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

১. **চিত্রকলা** ২. সংগীত ৩. নৃত্য ৪. প্রিন্টমেকিং বা ছাপচিত্র ৫. ভাস্কর্য ৬. স্থাপত্য ৭. সাহিত্য ৮. নাট্যকলা ৯. ফটোগ্রাফি বা স্থিরচিত্র ১০. চলচিত্র ইত্যাদি

কারুকলা

কারুকলা শিল্পকলারই একটা অংশ যার দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহারিক মূল্য রয়েছে। কারুকলা থেকে প্রাপ্ত শিল্পদ্রব্য কারুপন্য হিসেবে পরিচিত। কারুপন্য আমাদের প্রাত্যহিক প্রয়োজন মেটায়, এগুলো বিক্রি করে অর্থ উপার্জন করা যায়, একইসাথে এগুলোর সৌন্দর্য উপভোগ করা যায়। যেমন-একজন মৃৎশিল্পী যখন একটি নতুন মাটির পটারি (যে কোন কিছু) তৈরী করে তখন এর শিল্পগুন সমৃদ্ধ থাকে পাশাপাশি বিক্রি করে অর্থ উপার্জন করা যায়। তাই বলা যায়, যে শিল্প প্রধানত মানবিক ও ব্যবহারিক চাহিদা মিটানের সাথে আনন্দদান কওে তাকে কারুকলা বলে।

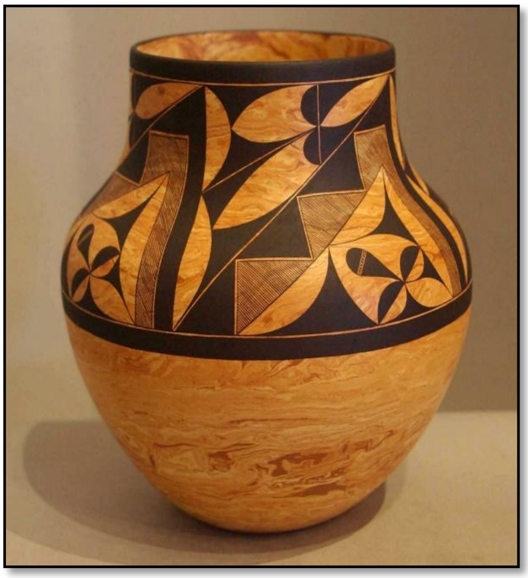

মৃৎশিল্প

দারুশিল্প (কাঠের কাজ)

কারুকলার বিভিন্ন শাখা

১. মৃৎশিল্প ২. দারুশিল্প ৩. গীবনশিল্প ৪. ধাতবশিল্প ৫. কাগজশিল্প ৬.চর্মশিল্প ৭.বাঁশ ও বেতশিল্প ৮. কাতাইশিল্প ৯. রেশমশিল্প ১০. বয়নশিল্প ইত্যাদি

চারুকলা জানা ও চর্চার প্রয়োজনীয়তা

- পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার বিকাশ লাভ হয়
- সৌন্দর্য জ্ঞান বৃদ্ধি পায়
- চক্ষু, মস্তিষ্ক ও হস্তের পেশীসমূহ নিয়ন্ত্রণ ও সমন্বয় সাধন হয়
- মনোযোগ বৃদ্ধি পায়
- নির্মল আনন্দ উপভোগ হয়
- স্মৃতি ও কল্পনার শক্তির বিকাশ সাধন হয়
- রুচিবোধের বিকাশে মূল্যায়নের মাপকাঠি সম্পর্কে ধারণা হয়
- ধৈর্য শক্তির বিকাশ ঘটে
- অর্থোপার্জনে সহায়তা করে
- শিখন শেখানো কাজে সহায়তাদান করে
- মনোযোগ ও একাগ্রতা বৃদ্ধি করে
- সভ্যতা, কৃষ্টি ও সংস্কৃতির উন্নতি সাধন হয়
- কোন কোন ধরনের চারুশিল্প দলগত মনোভাব বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। যেমন–দলীয় নৃত্য, নাটক ও দলীয় সংগীত
- মানসিক তৃপ্তি মেটায়।

কারুকলার জানা ও চর্চার প্রয়োজনীয়তা

- হাত ও চোখের ব্যবহারের দক্ষতা লাভ হয়
- স্মৃতি ও কল্পনা শক্তির বিকাশ লাভ হয়
- চঞ্চলতা হ্রাস পায়
- নির্মল আনন্দ লাভ করা যায়
- আত্মপ্রত্যয় গড়ে ওঠে
- বাস্তব জ্ঞান লাভ হয়
- বেকার সমস্যা সমাধানে সহায়ক হয়
- সামাজিকতা বোধের বিকাশ ঘটে
- শিখন শেখানোর একঘেয়েমি দূরীকরণে সহায়তা করে
- অনুপাত ও সৌন্দর্য জ্ঞান বৃদ্ধি পায়।

১. পর্যবেক্ষণমূলক অঙ্কন (Observational Drawing): শিক্ষার্থীদের পারিপার্শ্বিক এলাকা পরিদর্শনের লক্ষে স্বল্প সময়ের জন্য পায়ে হেঁটে ভ্রমণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। শ্রেণিকক্ষে ফিরে এসে স্মৃতিশক্তি থেকে মনে করে এলাকাটির বিভিন্ন স্থানের মানচিত্র অঙ্কন করতে দেয়া যেতে পারে।

২. অঙ্কনের পূর্বে বস্তু পর্যবেক্ষণকরণ: কোন বস্তু অঙ্কনের পূর্বে সেটাকে ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। এ সময় প্রশিক্ষক কিছু সহায়ক প্রশ্ন করতে পারেন। যেমন–বস্তুটির আকৃতি কী? এটি অনুভব করে এর নক্‌শা সম্পর্কে কি বলতে পার?–এর কোন শব্দ বা গন্ধ আছে কি? এটি কী দিয়ে তৈরি? এটি কিসের জন্য ব্যবহার করা হয়?

৩. শিল্পকর্ম বা ছবির ভাষা পড়া এবং বোঝা-একটি ছবি/শিল্পকর্মকে সূক্ষ্মভাবে পর্যবেক্ষণ করার জন্য প্রশিক্ষক কিছু প্রশ্ন করতে পারেন, যা শিক্ষার্থীদের ছবিটি সম্পর্কে ভাবতে ও চিন্তা করতে শেখাবে যেমন–ছবিতে কী কী জিনিস দেখা যাচ্ছে? এটা কি কাল্পনিক, বাস্তবভিত্তিক না কি একটি গল্পের প্রতিচ্ছবি? এখানে কী কী রঙের ব্যবহার করা হয়েছে? কোন রং সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করা হয়েছে এবং কেন? এটি দেখে মনে কী ধরনের আবেগ তৈরি হচ্ছে? এখানে কী কী আকৃতি বা নক্‌শা ব্যবহার করা হয়েছে? উপরোক্ত প্রশ্নগুলো শিক্ষার্থাদের বয়স উপযোগী হতে হবে।

চারু ও কারুকলার পার্থক্য

চারুকলা	কারুকলা
অধিকতর সৃষ্টিমূলক	অধিকতর অনুকরণমূলক
মূলত মানব মনের সংবেদনশীল, আবেগ,অনুভূতি এবং ভাবকল্পনার উৎস হতে সৃষ্ট।	অনেক ক্ষেত্রেই মানব জীবনের দৈনন্দিন প্রয়োজনে চিন্তারউৎস হতে সৃষ্ট।
সৃজনশীল ও মননশীলতার প্রাধান্য বেশি।	সৃজনশীলতার সাথে ব্যবহারিক সুবিধার প্রাধান্য বেশি।
বাস্তবতাকে অতিক্রম করে যেতে পারে।	বাস্তবতাকে অতিক্রম করা বিষয়টি তুলনামূলকভাবে কম।
সূক্ষ্ম মাংসপেশি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।	বৃহৎ মাংসপেশি ব্যবহারে অভ্যস্ত।
স্থিতি রয়েছে। সে 'ক্ষণ-সৌন্দর্য'কে চিরত্ব দান করে।	সাময়িক প্রয়োজনে পরিতৃপ্তির পর বিনষ্ট হতে পারে।

চারু ও কারুকলার ব্যবহারিক দিক

চারু ও কারুকলার ব্যবহারিক উপাদানগুলো হচ্ছে অঙ্কনের মূল বিষয়। ব্যবহারিক বিষয়গুলোর কোন একটির অনুপস্থিতি ছবিকে অসম্পূর্ণ করে রাখে। ভাল একটি ছবি আঁকতে এর কোনটিকে বাদ দেয়ার সুযোগ নেই। অঙ্কন শেখার পূর্বে এই ব্যবহারিক দিক সম্পর্কে ধারণা থাকা একজন শিল্পীর জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রশিক্ষক এবং শিক্ষককে অবশ্যই মনে রাখতে হবে এ নিয়ম কেবল বড়দের জন্য, শিশুদের জন্য নয়।

অনুপাত (Proportion)

অঙ্কনের জন্য অনুপাত একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয়। একই দৃশ্যপটে তুলনামূলকভাবে দেখা একটি জিনিস থেকে আর একটা জিনিস কত বড় বা কত ছোট হবে, তাই অনুপাত। অনুপাতের সঠিক ব্যবহার ছাড়া কোন ছবিই সফল হতে পারে না।যেমন- (একটি দৃশ্যপটে যদি একটি জগ এবং একটি গ্লাস আঁকা হয়, তাহলে জগ গ্লাসেরচেয়ে তুলনামূলকভাবে কত বড় হবে অথবা গ্লাস তুলনামুলকভাবে কত ছোট হবে সেটা অনুপাতের মাধ্যমে ঠিক করা হয়।

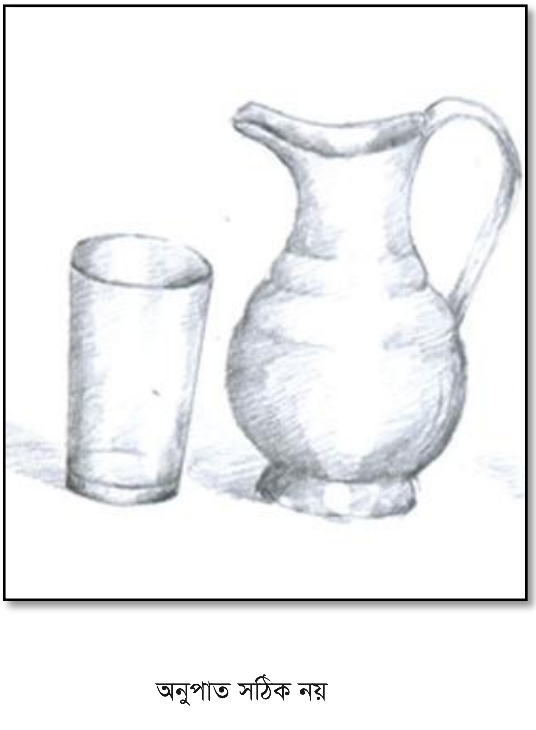

অনুপাত সঠিক নয়

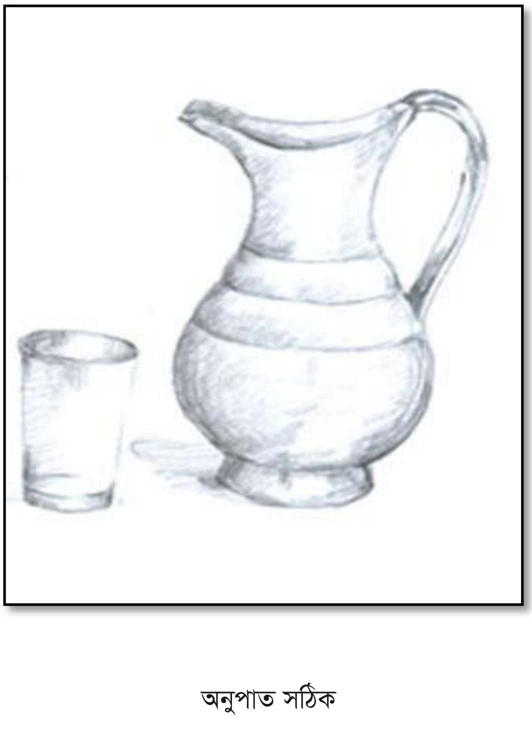

অনুপাত সঠিক

সমতা (Symmetry)

কোন জিনিসের মাঝামাঝি স্থান দিয়ে লম্বের মত একটি রেখা টানলে লম্বের দু'পাশের অংশ দু'টির আকার ও আকৃতিতে অবিকল একরকম থাকাকে সমতা বলে। উদাহরণ হিসেবে মানুষের মুখ, প্রজাপতি ইত্যাদি দিয়ে সমতা দেখানো হলো। বাস্তবধর্মী ছবি আঁকতে সমতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

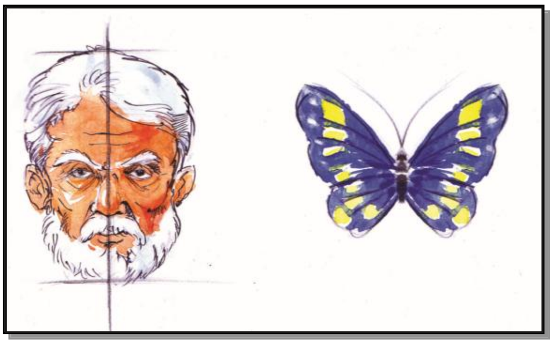

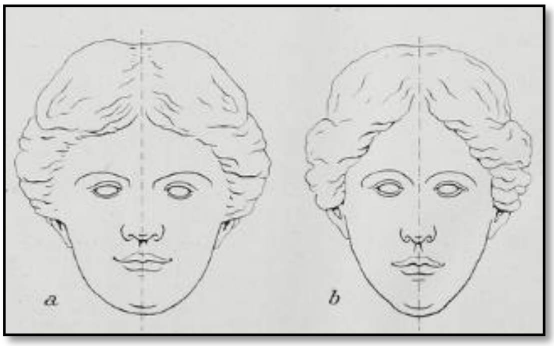

পরিপ্রেক্ষিত (Perspective)

একটি ছবিতে কোন বস্তুর দুরত্ব দেখাতে গেলে কাছের বস্তুটির আকার অপেক্ষকৃত বড় আর দুরের বস্তুটি অপেক্ষকৃত ছোট হয়ে যাবে এটাই মূলত পরিপ্রেক্ষিত। যেমন- দূরে গ্রামের দিকে লক্ষ করলে দেখা যায় কাছের গ্রামের চেয়ে দূরের গ্রামগুলো ছোট। আবার রেল লাইনের মাঝে দাঁড়ালে দেখা যায় রেললাইনের পাত দুটি দূরে এক বিন্দুতে মিশে আছে। এটা যখন ছোট একটা কাগজে অঙ্কন করা হয় তখন বিশাল একটা জিনিস ছোট একটা কাগজের মধ্যে আনা যায়। তেমনি বড় একটা দালান অঙ্কনের বেলায় সামনেরঅংশ বড় আর দূরের অংশ ছোট অঙ্কন করা হয়। তেমনি কালার পরিপ্রেক্ষিতের বেলায়ও কাছের রং স্পষ্ট এবং যতই দূরে যায় ততই রং হালকা হয়ে অস্পষ্ট হতে দেখা যায়।

আলোছায়া (Light and shade)

আলোছায়ার সঠিক প্রয়োগের উপর বাস্তবধর্মী ছবির রূপ নির্ভর করে। সীমারেখা অঙ্কন দ্বারা ছবির রূপায়ণ সম্ভব হলেও তাকে প্রকৃত বাস্তবধর্মী ছবি বলা যায় না যতক্ষন পর্যন্ত আলোছায়ার সঠিক প্রয়োগ না হয়। আলোছায়ার দ্বারা কোন একটি জিনিসের অবস্তান কাছে- দূরে, উপর-নিচ, বাম ও ডান সঠিকভাবে দেখানো যেতে পারা যায়। যেমন- বস্তুর যে অংশে আলো বেশি পড়ে সে অংশ বেশি আলোকিত ও স্পষ্ট দেখা যায়,আর যে অংশে মাঝারি আলো বা কম আলো পড়ে সে অংশ কম আলোকিত ও অস্পষ্ট দেখা যায়। অর্থাৎ ছবি অঙ্কনের ভাষায় যদি কোন বস্তুতে তিন রকমের আলো বা টোন ব্যবহার করা হয় তবে তাকে বাস্তবধর্মী চিত্র অঙ্কন বলে। যেমন, লাইট টোন, মিডল টোন, ডার্ক টোন–তিন রকম টোনের ব্যবহার একটা বাস্তবধর্মী চিত্রের রূপলাভ করে।

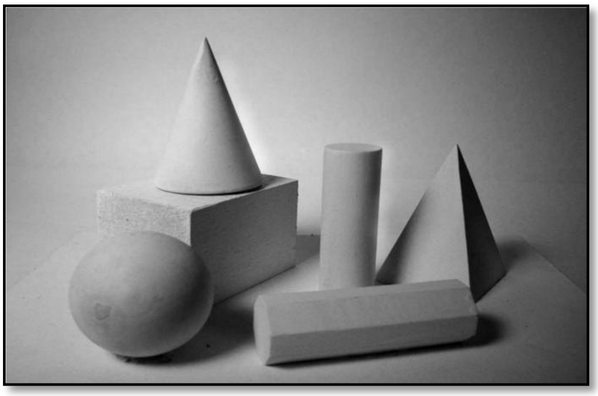

ভারসাম্য (Balance)

ছবির বিভিন্ন অংশের মধ্যে রেখা, রং ও বিষয়বস্তুর অবস্থান মোটামুটি মিল থাকাকে ভারসাম্য বলে। এর প্রধান কথা হল রেখা ও রং এর মাত্রা যেন সমপর্যায়ে থাকে। কোথাও যেন কোন বস্তু পরিমাণে বেশিও না হয় আবার কমও না হয়ে পড়ে। এখানে শিল্পীর স্বাধীনতা অনেক বেশি। ছবিকে সুন্দর ও আকর্ষণীয় করার জন্য রং, রেখা, বিষয়বস্তু যেন সমভাবে ব্যবহার করা হয় বা অঙ্কন করা হয়। তবেই ছবি ভাল লাগবে। তা না হলে ক্যানভাসে কোথাও ফাঁকা দেখা যাবে আবার কোথাও ভরা দেখা যাবে। কাজেই একটা সার্থক ছবির রূপদানে Balance অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটি বিষয়।

কেন্দ্রীয় আকর্ষণ (Central lnterse)

কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু একটি ভাল ছবির মূল আকর্ষণ। মূল বিষয়বস্তুকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দেয়ার জন্য ছবির মধ্যে আরও কিছু ছোটখাটো বিষয়কে ব্যবহার করা হয়। প্রধান একটি বিষয়বস্তু না থাকলে কোন ছবিই পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না, ছবির অন্যান্য বিষয়ের গঠন এমন হবে যাতে দর্শকের দৃষ্টি মূল বিষয়বস্তুর উপর পড়ে।

গঠন বা রচনা শৈলী (Composition)

যে কোন শিল্পকর্ম তৈরী করার পূর্বে শিল্পী একটি খসড়া তৈরি করে নেন। খসড়া করার সময় অনেকটা জড়ঁমযজিনিস থাকে বা কাটাকাটি করা হয়। শিল্পীও তেমনি যে বিষয়বস্তু নিয়ে ছবি আঁকবেন তার খণ্ড চিত্র খসড়া এঁকে নেন যাকে গঠন শৈলী বলা হয়। খণ্ড চিত্রগুলো সাজিয়ে গুছিয়ে তাঁর ছবিতে সংযোজন করে পরিপাটিভাবে চিত্রের রূপ দিয়ে থাকেন। গঠনরীতি যত ভাল ও পরিপাটি হবে ছবি তত নান্দনিক হবে।

ছবি আঁকার উপকরণ

পেন্সিল

সাধারণ লেখা এবং ড্রইং করার জন্য আমরা সচরাচর এক ধরনের পেন্সিল ব্যবহার করে থাকি। এ পেন্সিলের গায়ে লেখা থাকে **HB**, এসব পেন্সিলের শীষ তুলনামূলক একটু শক্ত এবং দাগ টানলে গাঢ় হয় না। ড্রইং করার জন্য নরম এবং শীষ মোটা পেন্সিল যেমন-**2B, 3B, 4B** এবং **6B** প্রয়োজন হয়। **2B, 3B, 4B** ও **6B**, এ চার মাত্রার যে কোন পেন্সিল দিয়ে পেন্সিল স্কেচ করা যায়।

কাগজ

কাগজহলো ছবি আঁকার অন্যতম একটি মাধ্যম বা উপকরণ।ছবি আঁকার জন্য আমরা যে কোন কাগজ ব্যবহার করতে পারি। তবে মোটা সামান্য খসখসে কাগজ ছবি আঁকার জন্য উপযোগী। ছবি আঁকার মাধ্যম কালি, কলম, পেন্সিল, জল রং অথবা প্যাস্টেল রং এর উপর নির্ভর করে কাগজ বাছাই করে নিতে হয়। কালি কলমে আঁকার জন্য তুলনামূলকভাবে মসৃণ ও একটু মোটা কাগজ ভাল। পেন্সিল দিয়ে ছবি আঁকতে একটু মোটা সামান্য খসখসে কাগজ ব্যবহার করা হয় এবং একই ধরনের কাগজে জল রং ও প্যাস্টেল ব্যবহার করা যায়। তবে জল রং দিয়ে ছবি আঁকার জন্য হ্যান্ডমেড পেপার খুবই উপযোগী। ছবি আঁকার জন্য সাধারণ মানের একটি কাগজ পাওয়া যায় তা হলো **কার্টিজ পেপার**। এ ধরনের পেপারে প্রায় সব মাধ্যমে কাজ করা যায়। এছাড়া আমাদের দেশে বিভিন্ন ধরনের কাগজ পাওয়া যায় যেমন–আর্ট পেপার, আর্ট কার্ড, অফসেট পেপার, বক্সবোর্ড, পিসবোর্ড, নানা প্রকার পাতলা আর্ট কার্ড, বিভিন্ন রং এর পোস্টার পেপার, নিউজ প্রিন্ট ইত্যাদি। বক্স বোর্ডের এক পিঠ মসৃণ এবং এক পিঠ খসখসে ছাই বা বাদামী রং এর হয়। পিসবোর্ড শক্ত এবং মোটা। পিসবোর্ডে প্যাস্টেল রং দিয়ে ছবি আঁকা যায়। বক্সবোর্ড ছবি আঁকা ছাড়াও ছবি মাউন্ট করার বা বাঁধাই–এর কাজে ব্যবহার করা হয়।

কালি কলম

আমরা সাধারণত লেখার কাজে কলম ব্যবহার করি। কলম দিয়ে ছবিও আঁকা যায়। ঝরণা কলম দিয়েও ছবি আঁকা যায়। কোন কোন সময় রঙিন কালি ব্যবহার করে বেশ মজার ছবি আঁকা যায়। সাধারণত **চাইনিজ ইঙ্ক** ব্যবহার করে ছবি আঁকলে ভাল হয়। বর্তমানে মার্কার পেন বা সিগনেচার পেন দিয়েও সাদা কালো ও রঙিন ছবি আঁকা হয়ে থাকে। বাঁশের কঞ্চি এবং খাগের কঞ্চি দিয়ে কলম তৈরি করে (মোটা বা চিকন) ছবি আঁকা যায়।

রং ও তুলি

রং হলো ছবি আঁকার অন্যতম একটি উপকরণ। রং বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। যেমন–জল রং, পোস্টার রং, এক্রেলিক রং, ফেব্রিক রং, পেন্সিল রং, তেল রং ,প্যাস্টেল রং ইত্যাদি। রং এর মাধ্যম ভিন্ন ভিন্ন হওয়ায় তুলিও ভিন্ন ভিন্ন মাধ্যমের হয়ে থাকে। কালি ও জল রং এ ছবি আঁকার জন্য নরম পশম দিয়ে তৈরি করা তুলি ব্যবহার করা হয়। তেল রং এ ছবি আঁকার জন্য শক্ত পশম এর তৈরি তুলি ব্যবহার করে থাকে। এটি সাধারণত শিল্পী কী ধরনের ছবি আঁকবে তার উপর নির্ভর করে। সরু থেকে ধীরে ধীরে মোটার দিকে আঁকার জন্য বিভিন্ন নম্বরের তুলি ব্যবহার করা হয়। ০ থেকে শুরু করে ২০বা তদুর্ধ্ব নম্বরের তুলি থাকে। প্রাথমিক পর্যায়ের শিশুরা ১ থেকে ১২ নং পর্যন্ত তুলি ব্যবহার করে থাকে।

বোর্ড ও ক্লীপ

বোর্ড ও ক্লীপ ছবি আঁকার জন্য খুবই প্রয়োজনীয়। বোর্ডে কাগজ রেখে ক্লিপ দিয়ে আটকিয়ে ছবি আঁকলে সুবিধা হয়। বোর্ড মেঝেতে রেখে, কোলের উপর রেখে বা ইজেলে রেখে ছবি আঁকা যায়। বোর্ডের ব্যবহার নির্ভর করে আঁকিয়ের/ শিল্পীর বসার অবস্থানের উপর।

ছবি আঁকার উপকরণ

ওয়াটার কালার (জল রং)

রং পেন্সিল

প্যাস্টেল রং

ব্রাশ (তুলি)

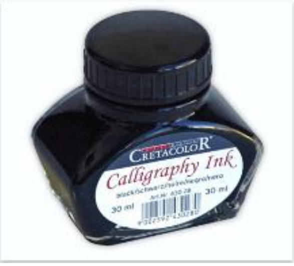

চাইনিজ ইন্‌ক

পোস্টার কালার

সিগনেচার পেন

পেন্সিল

বোর্ড ও ক্লীপ, ইজেল, কাগজ, ব্রাশ, রং

চারু ও কারুকলার সঙ্গে অন্যান্য পাঠ্য বিষয়ের সম্পর্ক

শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হলো মানব জীবনের সর্বাঙ্গীন বিকাশ সাধন। এই শিক্ষাকে সার্থক, সুন্দর, সৃষ্টিশীল ও ব্যবহার উপযোগী করে তোলা এবং শিক্ষার বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন করায় চারু ও কারুকলার ভূমিকা অনস্বীকার্য। প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক পর্যায়ের বিষয় ভিত্তিক জ্ঞান অর্জনে চারু ও কারুকলার ব্যবহার দুটি বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন করে। প্রথমত, এর ব্যবহার শিখন পদ্ধতিকে প্রাণবন্ত করে তোলে; দ্বিতীয়ত, সক্রিয় অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর বিষয় ভিত্তিক দক্ষতাজ্ঞান গভীর এবং দীর্ঘস্থায়ী হয়।

বাংলা

বাংলা ভাষা বিকাশে, বাচন ভঙ্গীতে, লেখায়, কবিতায়, কাব্যে, গল্পে, নাটকে ও উপন্যাসে চারুকলা প্রচ্ছন্নভাবে সহায়তা দান করে। বাংলা পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে চারুকলা অনন্য ভূমিকা পালন করে। বিষয়বস্তু উপস্থাপনে বিভিন্ন ছবির ব্যবহার পাঠকে আকর্ষণীয় ও প্রাণবন্ত করে। বাংলা লেখা শেখাতে চারুশিল্পের দক্ষতা বিভিন্ন কাজে লাগে। আবার শিক্ষা পদ্ধতিতে শিক্ষা উপকরণের ব্যবহারের একটি গুরুত্ব রয়েছে যা প্রায়শই, চারু বা কারু শিল্পের মাধ্যমে তৈরি করা হয়। একসাথে একাধিক ইন্দ্রিয় এর ব্যবহার করে পাঠদান করতে পারলে শিক্ষা স্থায়ী ও আকর্ষণীয় হয়। এক্ষেত্রে বাংলা পাঠদানে চারুও কারুকলা একটি বিশেষ মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। যেমন তৃতীয় শ্রেণির বাংলা পাঠ্যপুস্তকের একটি গদ্য ‘‘কানা মাছি ভোঁ ভোঁ’’ ছবির মাধ্যমেও উপস্থাপন করা যায়। এতে ভাষা শিক্ষায় আবৃত্তি ভূমিকার পাশাপাশি, ছবির বর্ণনার মধ্যে দিয়ে শিক্ষার্থী ভাষা ব্যবহারের সুযোগ পায় এবং তা তাকে কবিতার ভাববস্তু বুঝতে সাহায্য করে। একইভাবে গানের মাধ্যমেও কবিতাটির ভাববস্তু তুলে ধরা যায়।

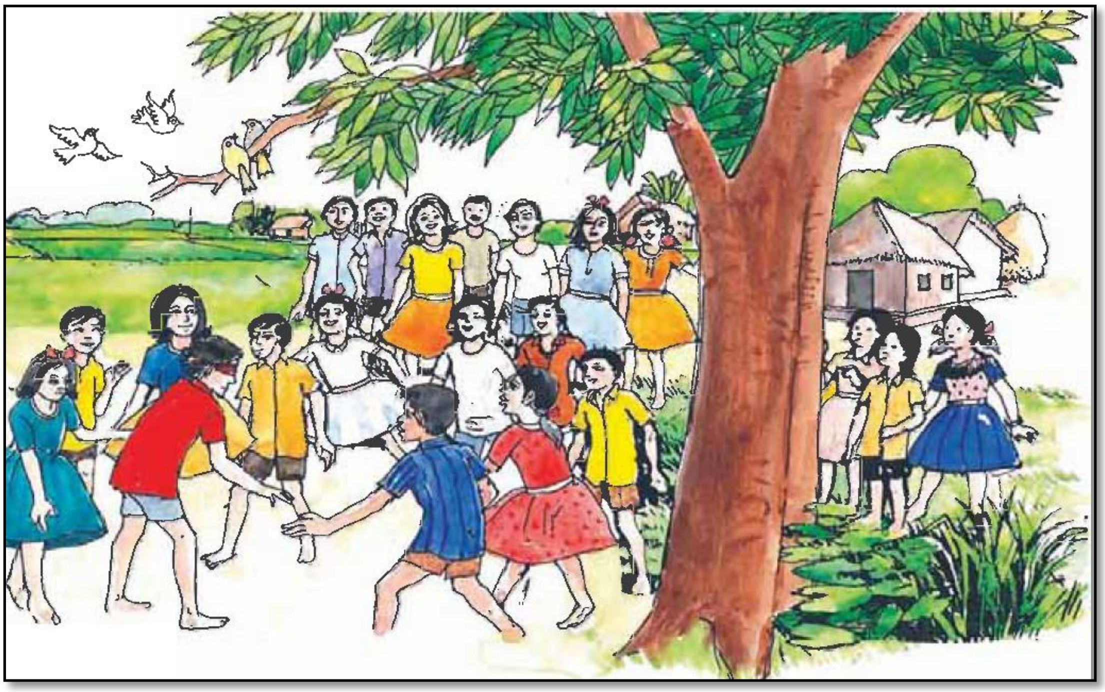

ইংরেজি

শিশুকে বর্ণমালা শেখাতে বাংলার মত ইংরেজিতেও ছবির ব্যবহার খুবই প্রয়োজন। ছবির সাথে শিশু প্রথম পরিচিতি লাভ করে তারপর বর্ণ সম্পর্কে জানে। যেমন–**A** তে **Apple**, **B** তে **Ball** ইত্যাদি। আবার ছবির সাহায্যে শিশুটি শিক্ষার্থীদের ইংরেজি শব্দ বা বাক্য শিখন অনেক সহজ হয়।

ইংরেজি একটি বিদেশী ভাষা এবং এটি আয়ত্ত করা অনেক সময় কঠিন কাজ বলে মনে হয়। বর্ণনামূলক পাঠদান করলে শিশুরা কখনই অনুপ্রাণিত হয় না এবং পাঠে শিখনফলও দীর্ঘস্থায়ী হয় না। তাই অন্য সকল বিষয়ের মত চার্ট, মডেল ও ছবির সাহায্যে ইংরেজি পাঠদান করলে বিষয়বস্তু সহজ ও বোধগম্য হয়। এতে আনন্দের মধ্য দিয়ে ইংরেজি শেখা যায়। একটি নতুন ভাষা শেখার জন্য শিক্ষা পদ্ধতিকে অর্থপূর্ণ করতে চারুও কারুকলার ভূমিকা অপরিসীম।

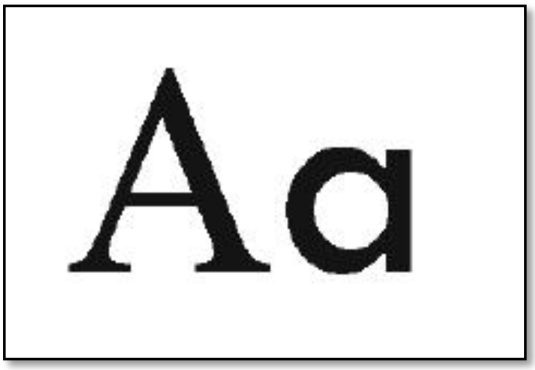

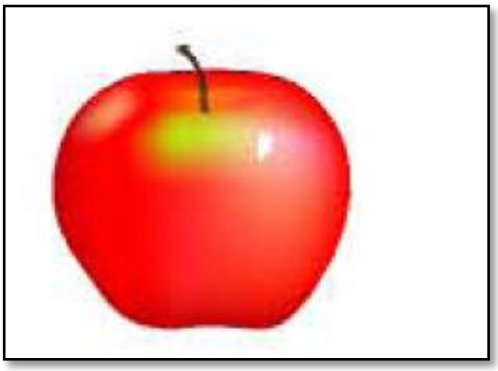

গণিত

প্রাথমিক শিক্ষায় গণিত শিক্ষাদানের সাথে চারু ও কারুকলার ঘনিষ্ট সম্পর্ক রয়েছে। চারু ও কারুকলায় এমন সব বিষয় রয়েছে যা গণিত শিক্ষাদানে বেশ গুরুত্বপূর্ণ। চিত্রের সাহায্যে গণিতে নতুন ধ্যান-ধারণার সঞ্চার করলে শিশুরা সহজেই বিষয়বস্তু আয়ত্ত করতে পারে। যেমন ছবির সাহায্যে যোগ বিয়োগ শেখানো যেতে পারে আবার অঙ্কনেরও এমন অনেক স্তর আছে যেখানে গণিতের জ্ঞানের সহায়তা অপরিহার্য। গণিতে পাঠদানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শিল্পকর্মের মাধ্যমে শিশুর মধ্যে শিল্প প্রতিভার আবিষ্কার এবং বিকাশের উপায় খুঁজে বের করতে পারে। গণিতের পরিমাপ সংক্রান্ত নিখুঁত জ্ঞানের জন্য চারু ও কারুকলার রং তুলি ব্যবহারের প্রয়োজন হয়। তখন চারু ও কারুকলার সঠিক দক্ষতা অর্জনের জন্য গণিতের সংশ্লিষ্ট ধারণা লাভ করে।

তাতে চারু ও কারুকলার দক্ষতাই শুধু বৃদ্ধি পায় না বরং গণিতের ধারণাও তার কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। শিশুর নিজ পরিবেশে যে সব বস্তু রয়েছে তার সবকিছু শ্রেণিকক্ষে আনা সম্ভব হয় না তাই ছবির সাহায্য গণিতের শিক্ষাদান সহজ

হয়। শিশু সংখ্যার সাথে প্রথমে পরিচিত হয় না। তাই সংখ্যার সাথে ছবি থাকলে সংখ্যার ধারণাসহজে বোধগম্য হয়।তাছাড়া জ্যামিতিক শাস্ত্র পুরোটাই চারু ও কারুকলার উপর নির্ভরশীল। সুতরাং গণিত বিষয়ে চারু ও কারুকলার ব্যবহার একান্তই অপরিহার্য।

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়

শিশু শিক্ষায় বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ বিষয়ে পাঠদান করতে শিক্ষার্থীকে সরাসরি তার নিকট পরিবেশের সাথে পরিচয় ঘটাতে হয়। পরিবেশ দুধরনের: প্রাকৃতিক পরিবেশ ও সামাজিক পরিবেশ। গাছপালা, পশুপাখি, পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা, সমুদ্র, আকাশ-বাতাস, ভূমি, চন্দ্র-সূর্য প্রাকৃতিক পরিবেশ যা মানুষ তৈরি করতে পারে না। যা মানুষের তৈরি যেমন–ঘর-বাড়ি, রাস্তা-ঘাট, যানবাহন, মানুষের আচার-অনুষ্ঠান, শিল্প-সাহিত্য ইত্যাদি সামাজিক পরিবেশ।

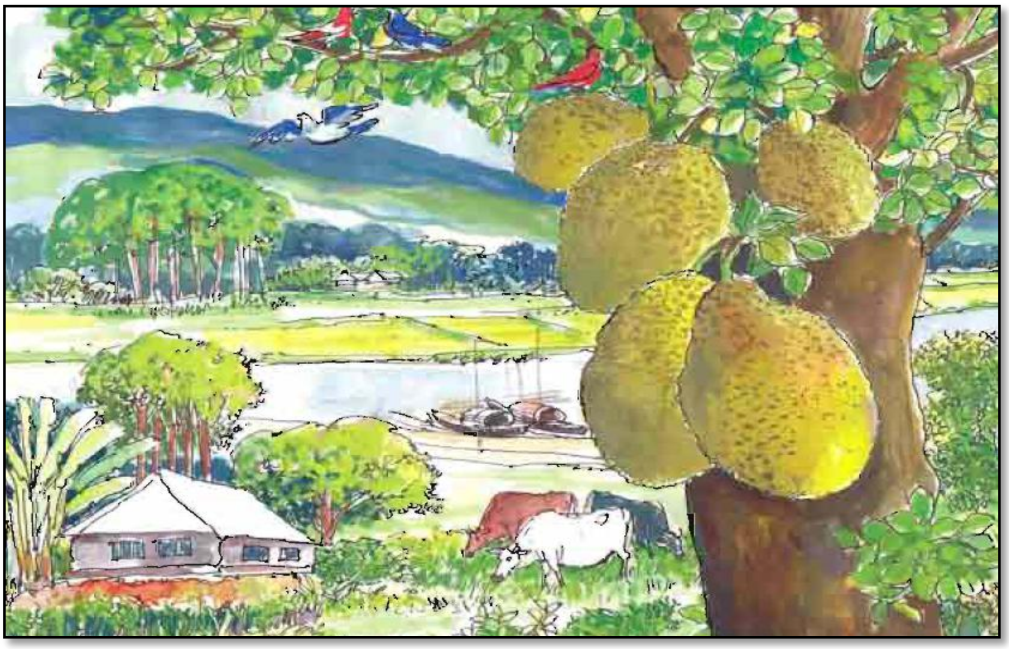

সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্যের প্রতি সচেতন ও গণতান্ত্রিক পদ্ধতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া। বর্ণনামূলক পাঠদানের মাধ্যমে সে উদ্দেশ্য সাধন করা সম্ভব নয়। শিশুকে প্রত্যক্ষভাবে উপাদানগুলোর সংগে পরিচিতি ঘটাতে হবে। প্রত্যক্ষভাকে স্বাদ, গন্ধ, স্পর্শের সাহায্যে বাস্তব উপস্থাপন করা সম্ভব হয় না তখন সাহায্য নিতে হয় চারু ও কারুকলার উপর। ছবি বা মডেলের উপর ভিত্তি করে পাঠদানে একই সাথে একাধিক ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার করা সম্ভব হয়। এতে পাঠ দীর্ঘস্থায়ী ও বাস্তবভিত্তিক করা যায়। বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় পাঠে শিক্ষক বাস্তব উপাদান প্রদর্শনের মাধ্যমে পাঠদান করবেন। কিন্তু আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় যেখানে সুযোগ কম সেখানে এ বিষয়ের উপর পাঠদান করতে গিয়ে শিক্ষককে অবশ্যই চিত্রের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট পারিপার্শ্বিকতা শিক্ষার্থীদের কাছে তুলে ধরতে হবে।

একইভাবে কোন ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব, জাতি, বর্ণ, সম্প্রদায় সম্পর্কে ধারণা দিতে ছবি বা মডেল ব্যবহার খুবই প্রয়োজন। অনুরূপভাবে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গ্রাম ও শহর, হাট-বাজার, আচার-অনুষ্ঠান, জেলা, উপজেলা, বিভাগ ও দেশের সম্পর্কে ধারণা চিত্রের মাধ্যমে দিলে শিক্ষার্থীরা অনুপ্রেরণা পায়।

পরিবেশ পরিচিতি (বিজ্ঞান)

পাঠকে সার্থক, সজীব, চিত্তাকর্ষক, যুক্তিযুক্ত, সুষ্ঠু ও সহজবোধ্য করার জন্য বিভিন্ন ধরনের চিত্র, ডায়াগ্রাম, রেখাচিত্র, নক্শা প্রয়োজন হয় যা কেবলমাত্র শিশু শিক্ষায় নয় সকল শিক্ষা ব্যবস্থায় ব্যবহার করা প্রয়োজন। যেমন–ঋতু পরিবর্তন, সৌরজগৎ, চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণ,

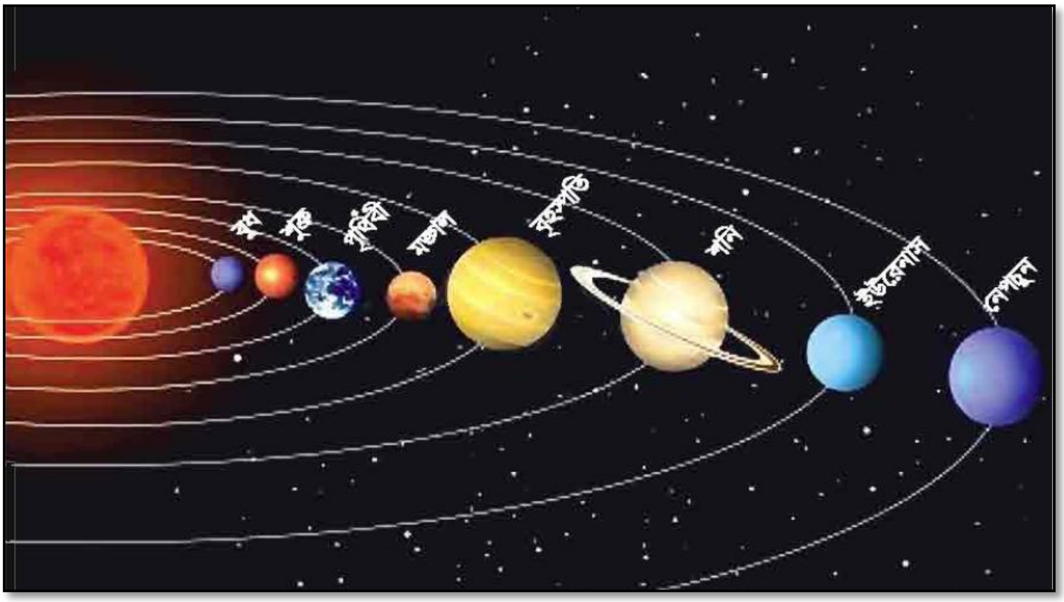

চিত্রঃ সৌরজগৎ

জোয়ার-ভাটা ইত্যাদি বিষয়ে ধারণা দিতে মডেল, চার্ট বা ছবির প্রয়োজন হয়। এছাড়া জীববিদ্যায়, পদার্থ বিদ্যাসহ বিভিন্ন পশু-পাখি পরিচিতি সম্পর্কে চার্ট ব্যবহার করে পাঠদান করলে শিক্ষার্থীর কাছে পাঠ প্রাণবন্ত হয়। একইভাবে কৃষি বিজ্ঞান, স্বাস্থ্য বিজ্ঞান বিষয়ে পাঠদান করতে এবং বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করতে চারু ও কারুকলার প্রয়োজন হয়। শিশুর কর্মস্পৃহা এবং প্রাণচাঞ্চল্যকে সুষ্ঠু সুন্দর ও সঠিকভাবে পরিচালনা করতে হলে পাঠের প্রতি তার আগ্রহ সৃষ্টি করতে হয়। এতে শিক্ষাদান পদ্ধতি আনন্দদায়ক হয়ে ওঠে এবং শিশু সেই আনন্দের মাধ্যমে শিক্ষার অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে।

অধ্যায়-দুই

- প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক পর্যায়ে খেয়াল খুশিমত ছবি আঁকার গুরুত্ব ও শিখন শেখানোর কৌশল
- পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ছবি আঁকা
- জাতীয় ফুল, ফল, মাছ, পাখি, জাতীয় পতাকা, স্মৃতিসৌধ ও শহিদ মিনার অঙ্কন
- রং ও এর ভাবার্থ
- ড্রইং, রেখাচিত্র, স্কেচ, প্রাকৃতিক দৃশ্য , জলরং ও পেস্টেল এ ছবি আঁকা

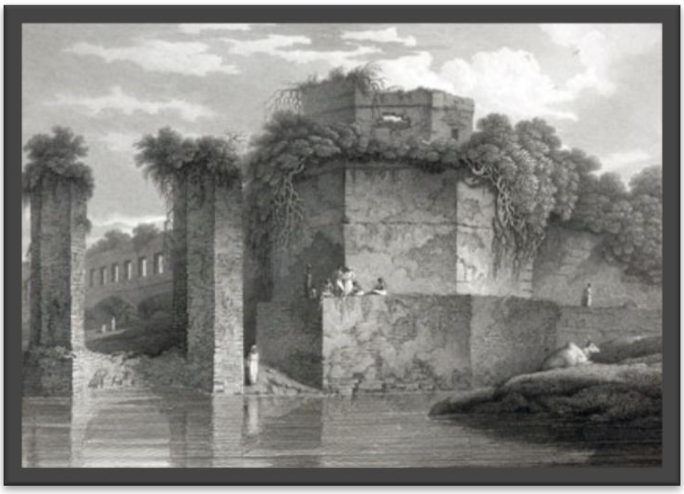

প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক পর্যায়ে খেয়াল খুশি মত ছবি আঁকার গুরুত্ব ও শিখন-শেখানো কৌশল

শিশু মাত্রেই কম বেশি উদ্ভাবনী ক্ষমতার অধিকারী। সে কারণেই শিশু তার অনুভূতি ও আবেগ প্রকাশ করার জন্য তার চিন্তা, কল্পনা ও বিচার বুদ্ধি খাটিয়ে বিভিন্ন ধরনের রেখার মাধ্যমে চিত্ররূপ দেয়। তার সৃজনমূলক কাজের মধ্য দিয়ে মনের আবেগ প্রকাশ পায়। প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক পর্যায়ে শিশুরা বেশির ভাগ আত্মপ্রকাশের মাধ্যম হিসেবে ছবি বেশি ব্যবহার করে। তাদের চিন্তা ভাবনা, সুখ-দুঃখ, আশা, বেদনা ইত্যাদি সব কিছুর প্রতিফলন ঘটে তাদের অঙ্কনের মাধ্যমে। বড়দের মত করে সে কথা রপ্ত করতে বা গুছিয়ে বলতে পারে না। তাই ছবির মাধ্যমে সে নিজের মনের কথা বা অনুভূতি প্রকাশ করে। সামাজিক একটা ধরাবাঁধা গন্ডির মধ্যে থেকেও সে মুক্ত ও স্বাধীন। অঙ্কনের মধ্যে আছে তার স্বাধীনতা। শিখন-শেখানোর কাজে তার মনে রয়েছে ভিতি ও অনাগ্রহ। তাই এ পর্যায়ের শিশুদের পড়তে দেয়ার সাথে সাথে অঙ্কনের প্রয়োজনীয় উপকরণ পাশে রাখলে পড়া লেখা রেখে অঙ্কনের প্রতি সে বেশি আগ্রহী হয়।

৪/৫ বছর বয়সের আঁকা ছবি থেকে ৯/১০ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদের আঁকা ছবিগুলো দেখলে বোঝা যায় পর্যায়ক্রমে তাদের আঁকা ছবি বাস্তবতায় ফিরে আসছে। ছবি আঁকার শুরু থেকে ধরাবাঁধা নিয়মের মধ্যে ফেলে আঁকতে দেয়া ঠিক নয়। ধরাবাঁধা নিয়মের মধ্যে আঁকতে দিলে শিশুর সৃজনী শক্তি ব্যাহত হয়। নিজের উদ্ভাবনী চিন্তা অঙ্কনে প্রকাশ করতে না পারলে মুক্ত বিকাশ ব্যাহত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। যেহেতু শিশুর ভাষা জ্ঞান সীমিত, শব্দ ভাণ্ডারও সীমিত, যার জন্য মুখের ভাষা দ্বারা সবকিছু প্রকাশ করার ক্ষমতা কম, ফলে ছবি আঁকা তাদের আত্মপ্রকাশের একটি মুখ্য বিষয়।

বয়সের তারতম্য অনুসারে শিশু অঙ্কনকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন-

- হিজিবিজি স্তর (Scribbling stage)
- সাংকেতিক স্তর (Symbolic stage)
- অর্ধবাস্তব স্তর (Pseudo-realistic stage)
- বাস্তবতার স্তর (Realistic stage)

হিজিবিজি স্তর (Scribbling stage)

শিশু অঙ্কনের ক্ষেত্রে এটি মজার স্তর। শিশুরা আঁকতে গিয়ে এলোমেলো আঁকিঝুকির মাধ্যমে তার কল্পনার বিষয়কে প্রকাশ করতে চায়। শৃঙ্খলাবিহীনভাবে নানান ধরনের রেখার সাহায্যে ছবি আঁকে বলে এ স্তরকে হিজিবিজি স্তর বলে। প্রাক-প্রাথমিক অবস্থায় শিশুরা এ ছবিগুলো এঁকে থাকে।

সাংকেতিক স্তর (Symbolic Stage)

শিশুরা তাদের মনের ভাব প্রকাশের জন্য ভাষা ছাড়া সাংকেতিক অংকনের এর মাধ্যমেও প্রকাশ করে থাকে। বিশেষ করে ৬ থেকে ৮ বছর বয়সী শিশুরা সাধারণত সাংকেতিক অংকনের মাধ্যমে ছবি অংকন করে থাকে। তাই শিশু অঙ্কনের এই স্তরকে সাংকেতিক স্তর বলা হয়। যদি কোন শিশুকে মোরগ এর ছবি আঁকতে বলা হয়, তবে একটি শূন্য দিয়ে একটি পেট এঁকে তার উপর আরেকটি ছোট শূন্য দিয়ে মাথা এঁকে বড় শূন্যটির নিচে দুটি সরল রেখা দিয়ে পা এঁকে ফেলবে।

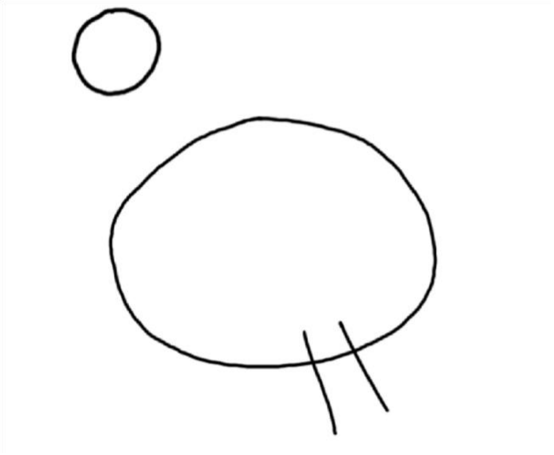

অর্ধবাস্তব স্তর (Pseudo-realistic stage)

৯ থেকে ১১ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুরা অর্ধবাস্তবতার উপর ভিত্তি করে ছবি এঁকে থাকে। এই বয়সের শিশুদের অঙ্কিত ছবিতে বাস্তবতা বুঝায় না তবু মনে হয় ছবির মধ্যে কিছু বাস্তবতা আছে। তাই এই স্তরকে অর্ধবাস্তবতার স্তর বলা হয়।

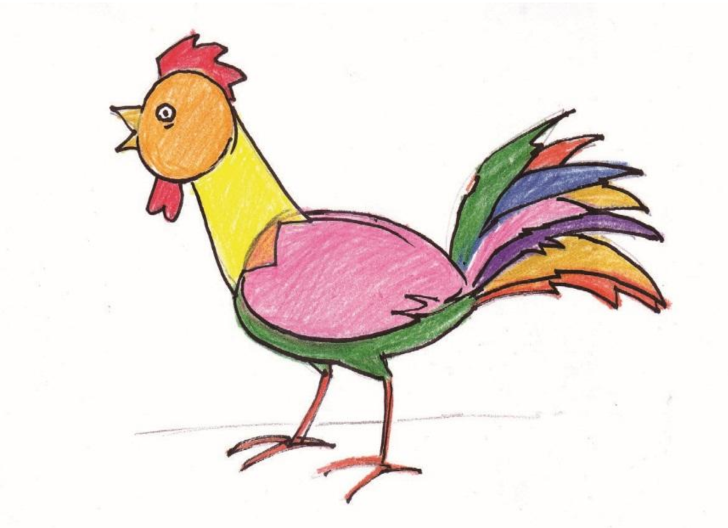

বাস্তব স্তর (Realistic stage)

বাস্তবতার স্তর সাধারণত ৫ম শ্রেণির শেষ থেকে শুরু হয়। এ স্তর থেকে শিশুদের অঙ্কনে বাস্তবতার একটা প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। বাস্তবের সাথে খাপ খাইয়ে এ বয়সের শিশুরা তাদের ছবিগুলো এঁকে থাকে।

অংকনের প্রকারভেদ

অঙ্কনের মূলসূত্র এবং অঙ্কনের পদ্ধতির উপর নির্ভর করে অঙ্কনের প্রকারভেদ চিহ্নিত করা হয়েছে। অঙ্কনের সূত্র ধরে বলতে পারা যায় কোনটি কোন ধরনের অঙ্কন–কোন সূত্র ধরে আঁকা হয়েছে এবং কীভাবে আঁকা হয়েছে।

অংকনের প্রকারভেদ অনুযায়ী অংকনকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

- ঘর্ষিত চিত্রাঙ্কন (Mass Drawing)
- সীমারেখা চিত্রাঙ্কন (Outline Drawing)
- মুক্তহস্তে চিত্রাঙ্কন (Freehand Drawing)
- যন্ত্রের সাহায্যে চিত্রাঙ্কন (Instrument Drawing)
- আদর্শ দেখে চিত্রাঙ্কন (Model Drawing)
- স্মৃতির সাহায্যে চিত্রাঙ্কন (Memory Drawing)
- কাল্পনিক চিত্রাঙ্কন (Imaginery Drawing)
- বর্ণনামূলক চিত্রাঙ্কন (Descriptive Drawing)
- সৃজনাত্মক চিত্রাঙ্কন (Creative Draw)

ঘর্ষিত ড্রইং (Mass Drawing) সাধারণত চক, কয়লা, প্যাস্টেল, পোড়ামাটি বা অনুরূপ কোন জিনিস দিয়ে ঘষে ঘষে অঙ্কন করা হয়ে থাকে সে জন্য এ জাতীয় অঙ্কনকে ঘর্ষিত চিত্রাঙ্কন বা Mass Drawing বলা হয়। এ জাতীয় অঙ্কনের সময় প্রথমে কোন সীমারেখা টানা হয় না। কোন একটা বিন্দু থেকে মাধ্যমটি দিয়ে ঘষে ঘষে পরিকল্পিত রূপ দেয়া হয়। রেখার সাহায্যে চিত্ররূপ দেয়া কঠিন তাই প্রাথমিক অবস্থায় শিশুদের এভাবে ছবি অঙ্কনের সুযোগ দেয়া উচিত।

সীমারেখা ড্রইং (Outline Drawing) ঘর্ষণের ঠিক বিপরীত হলো সীমারেখা চিত্রাঙ্কন। ঘর্ষণাঙ্কনের ক্ষেত্রে কোন বিন্দু থেকে আরম্ভ করতে হয়। পক্ষান্তরে সীমারেখা চিত্রাঙ্কনের ক্ষেত্রে শুধু বাহিরের রেখা দ্বারাই অঙ্কন করতে হয়। এতে চিত্রের ভেতর ফাঁকা থাকে। বাংলা ও ইংরেজি বর্ণ শিখতে এই পদ্ধতিটি বিশেষ ভাবে সাহায্য করে।

মুক্ত হস্তে চিত্রাঙ্কন (Free hand Drawing) চিত্রের অবস্থান এবং অনুপাত ঠিক রাখার জন্য কোন কিছুর সাহায্য ছাড়াই খালি হাতে অঙ্কন করাকে মুক্তহস্ত চিত্রাঙ্কন বা Freehand Drawing বলা হয়। অঙ্কনের প্রাথমিক অবস্থায় শিশুদের খালি হাতে অঙ্কন করতে উৎসাহিত করা উচিত।

যন্ত্রের সাহায্যে চিত্রাঙ্কন (Instrument Drawing) অনুপাত, ভারসাম্য কিংবা রেখা, বৃত্ত, ত্রিভুজ, চতুর্ভূর্জ ইত্যাদি অঙ্কনের জন্য যখন কোন যন্ত্রের সাহায্য নেয়া হয় তখন তাকে যন্ত্রের সাহায্যে চিত্রাঙ্কন বা Instrument Drawing বলা হয়। গণিতে কিছু ধারণার ক্ষেত্রে এই দক্ষতাটি ব্যবহার করা হয়।

আদর্শ দেখে চিত্রাঙ্কন (Model Drawing) কোন বস্তুর প্রতিকৃতি দেখে অঙ্কন করাকে আদর্শ চিত্রাঙ্কন বা Model Drawing বলে। মন থেকে অঙ্কন করার চেয়ে প্রথমে বস্তুর মূল কাঠামো দেখে অঙ্কন অনেক ভাল। শিশুদের প্রথমে মডেল দেখে আঁকা শেখালে শিশুরা বস্তু সম্পর্কে বাস্তব ধারণা লাভ করতে পারে। বিজ্ঞান বিষয়টি পাঠদানে এই দক্ষতাটি কাজে লাগে।

স্মৃতির সাহায্যে চিত্রাঙ্কন (Memory Drawing) কোন কিছুর আদর্শ বা মডেল না দেখে মন থেকে অঙ্কন করাকে স্মৃতির সাহায্যে চিত্রাঙ্কন বা Memory Drawing বলা হয়। বস্তু সম্পর্কে যে মানসিক চিত্রটি মানসপটে অঙ্কিত হয় রং তুলি বা পেন্সিলের সাহায্যে তা'ই চিত্রিত করা হয়। স্মৃতির সাহায্যেই শিশুরা প্রথমে অঙ্কন করে থাকে এবং তাতেই তারা খুব আনন্দ পায়। স্থানীয় এলাকার মানচিত্র অংকনে এই দক্ষতাটি কাজে লাগে (পরিবেশ পরিচিতি এর সাথে যুক্ত)।

কাল্পনিক চিত্রাঙ্কন (Imaginery Drawing) কোন বস্তু, আদর্শ বা চিত্রের অনুকরণ না করে শিল্পী নিজের কল্পনা থেকে যখন নতুন কিছু অঙ্কন করে তখন তাকে কাল্পনিক চিত্রাঙ্কন বা Imaginery Drawing বলে।

বর্ণনামূলক চিত্রাঙ্কন (Descriptive Drawing) শিল্পী যখন কোন ঘটনা বা কোন দৃশ্যের বর্ণনা শুনে বা পাঠ করে তার উপর ভিত্তি করে চিত্র অঙ্কন করে তখন তাকে বর্ণনামূলক চিত্রাঙ্কন বা Descriptive Drawing বলে।

সৃজনাত্মক চিত্রাঙ্কন (Descriptive Drawing) অঙ্কনের সময় শিল্পী তার সৃজনী প্রতিভার পরিচয় দিয়ে নতুন নতুন ভাবধারার মাধ্যমে যে দৃশ্যের অবতারণা করেন তখন তাকে সৃজনাত্মক চিত্রাঙ্কন বা Creative Drawing বলে। সৃজনাত্মক চিত্রাঙ্কন বলতে মূলত শিশু চিত্রকলাকেই বুঝায়। কাল্পনিক বর্ণনামূলক এবং সৃজনাত্মক চিত্রাংকনে বিভিন্নভাবে বাংলা ও ইংরেজি ভাষা আয়ত্ত করতে গল্প ও কবিতা বুঝতে সাহায্য করতে পারে

পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে ছবি আঁকা

শিশু অঙ্কনে বাস্তবতা আনার জন্য নিজ পরিবেশে সচরাচর যেসব জিনিস দেখতে পায় সেগুলো প্রথমে দেখে পরে স্মৃতি থেকে আঁকতে চেষ্টা করে। স্মৃতিশক্তি ও মেধাকে কার্যকর করার জন্য এ পন্থা খুবই প্রয়োজন। প্রাথমিক পর্যায়ে অঙ্কনের বাস্তবতা আনার জন্য পর্যবেক্ষণের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। পর্যবেক্ষণ করে ছবি অঙ্কন করার সঙ্গে মডেলের একটা নিবিড় সম্পর্ক আছে এ জন্য মডেল কাকে বলে তা শিশুদের জানা দরকার। যা দেখে ছবি আঁকে তাকে মডেল বলে। কোন কোন সময় বাস্তব জিনিসের অনুরূপ মাটি বা অন্য যে কোন পদার্থ দ্বারা তৈরি জিনিসকেও মডেল বলা হয়। শিশুর প্রকৃতি স্বাভাবিক কল্পনাপ্রবণ। সে যা জানে তাই আঁকে যা দেখে তা আঁকে না। এটি শিশুর বেলায় বাস্তব সত্য। ছবি অঙ্কনের মাধ্যমে শিশু এ স্বভাব থেকে ধীরে ধীরে বাস্তবতায় ফিরে আসে। তাই সবকিছু ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। প্রতিটি জিনিসের গঠন ও আকৃতিগত প্রকৃতি বোঝার জন্য পর্যবেক্ষণ করে আঁকতে বলতে হবে এবং সেভাবে চর্চা করলে কল্পনাপ্রবণতা থেকে বাস্তবতায় ফিরে আসবে। শিশুদের পর্যবেক্ষণ করে ছবি আঁকার ধারণা প্রদান ও সহায়তা করার জন্য শিক্ষকের বিষয়ভিত্তিক ধারণা থাকা দরকার।

নিজ পরিবেশে প্রাপ্ত জিনিসপত্র, গাছ-পালা, ঘর-বাড়ি, মাছ, পশু-পাখি ইত্যাদির সাথে ভালভাবে পরিচিতি লাভের জন্য এবং দেশীয় জিনিসের প্রতি অনুরাগ ও ভালবাসা বৃদ্ধির জন্য পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে ছবি অঙ্কনের গুরুত্ব অপরিসীম। যে কোন বাস্তব জিনিস তিন মাত্রায় (দৈর্ঘ, প্রস্থ, উচ্চতা) দেখা যায়, কিন্তু অঙ্কনের সময় শুধু দুই মাত্রায় (দৈর্ঘ, প্রস্থ) অঙ্কন করতে হয়। তাই প্রাথমিক পর্যায়ে অঙ্কনে শুধু বস্তুটির সীমারেখা আঁকতে হয়। সীমারেখা বা বর্ডার লাইন আঁকতে পারলেই ধরে নেয়া হয় বস্তুটির অঙ্কন যথাযথ হয়েছে। এ ভাবে নিম্নের স্তরভিত্তিক বিভিন্ন জিনিসের ছবি অঙ্কন করে দেখানো হলো যা প্রশিক্ষক শিক্ষার্থীদের এঁকে দেখাবেন এবং শিক্ষার্থীরা আঁকবেন।

অনুশীলন চিত্র

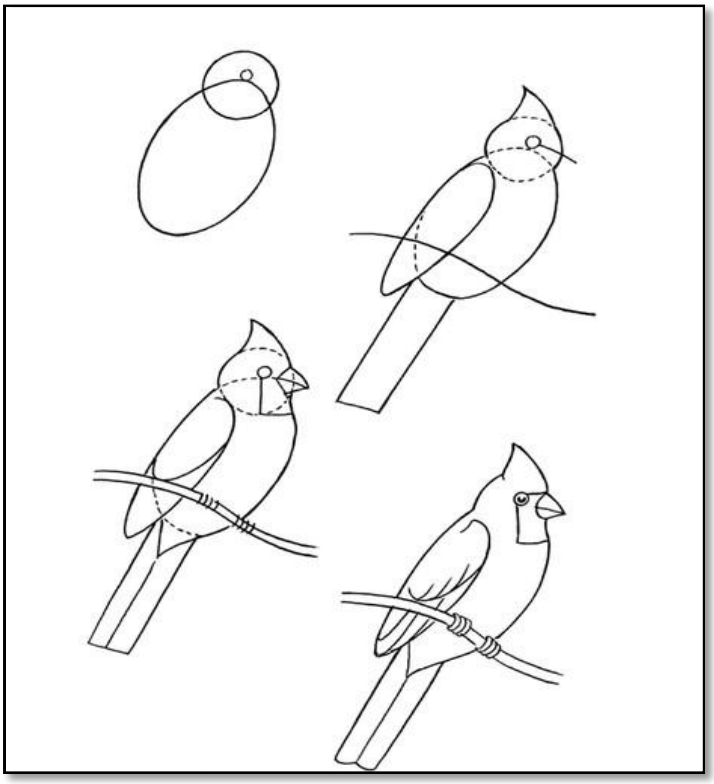

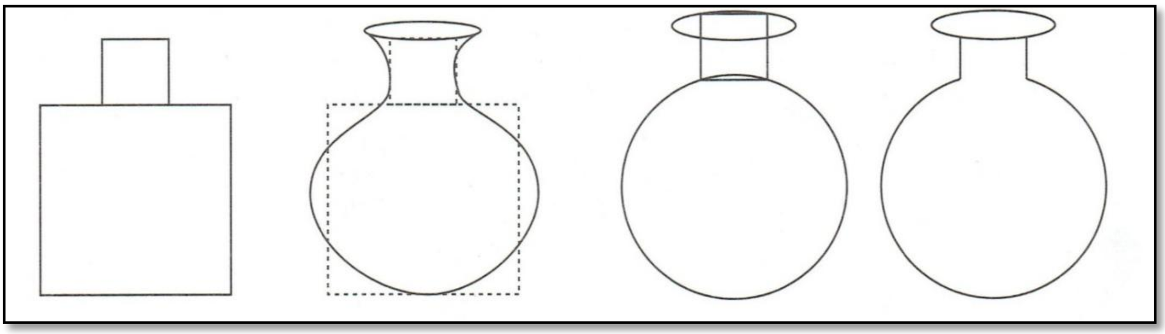

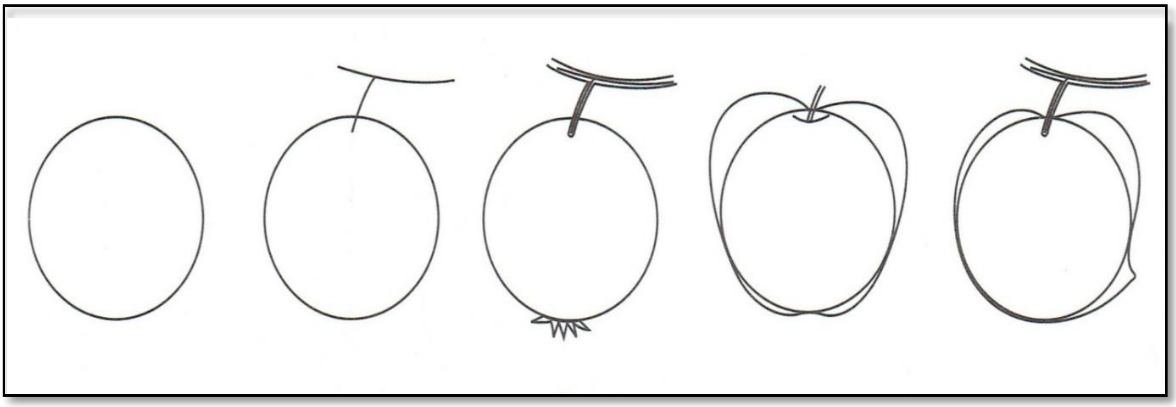

অঙ্কন দক্ষ করার জন্য ফরম ভেদে বিভিন্ন ছবি অঙ্কন পদ্ধতি

অনুশীলন চিত্র

প্রথম স্তর	দ্বিতীয় স্তর	তৃতীয় স্তর
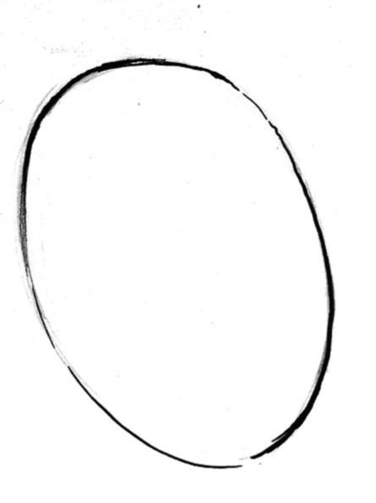	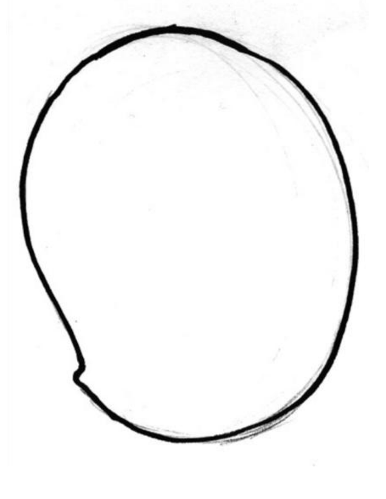	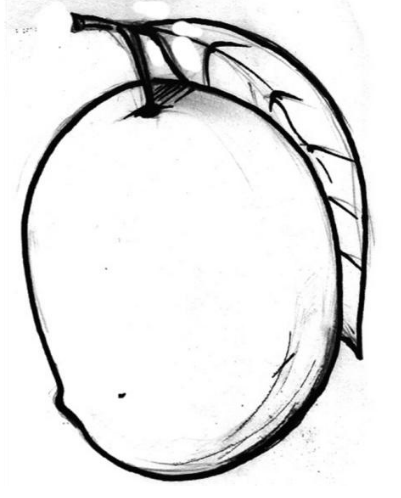
	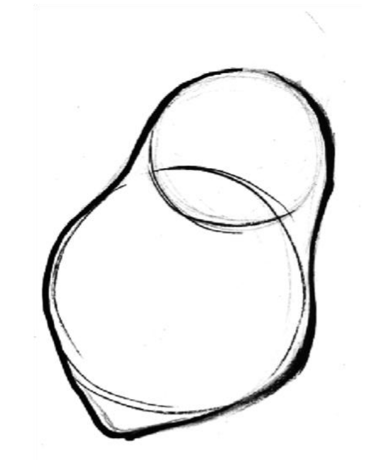	
	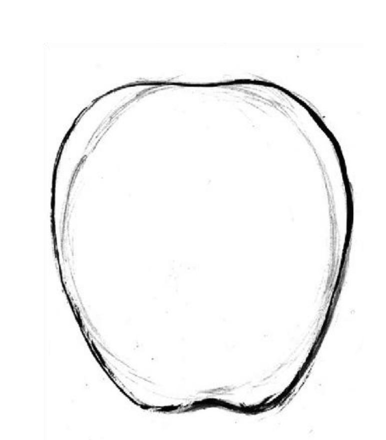	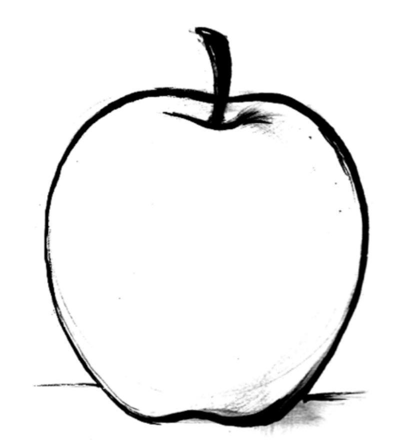

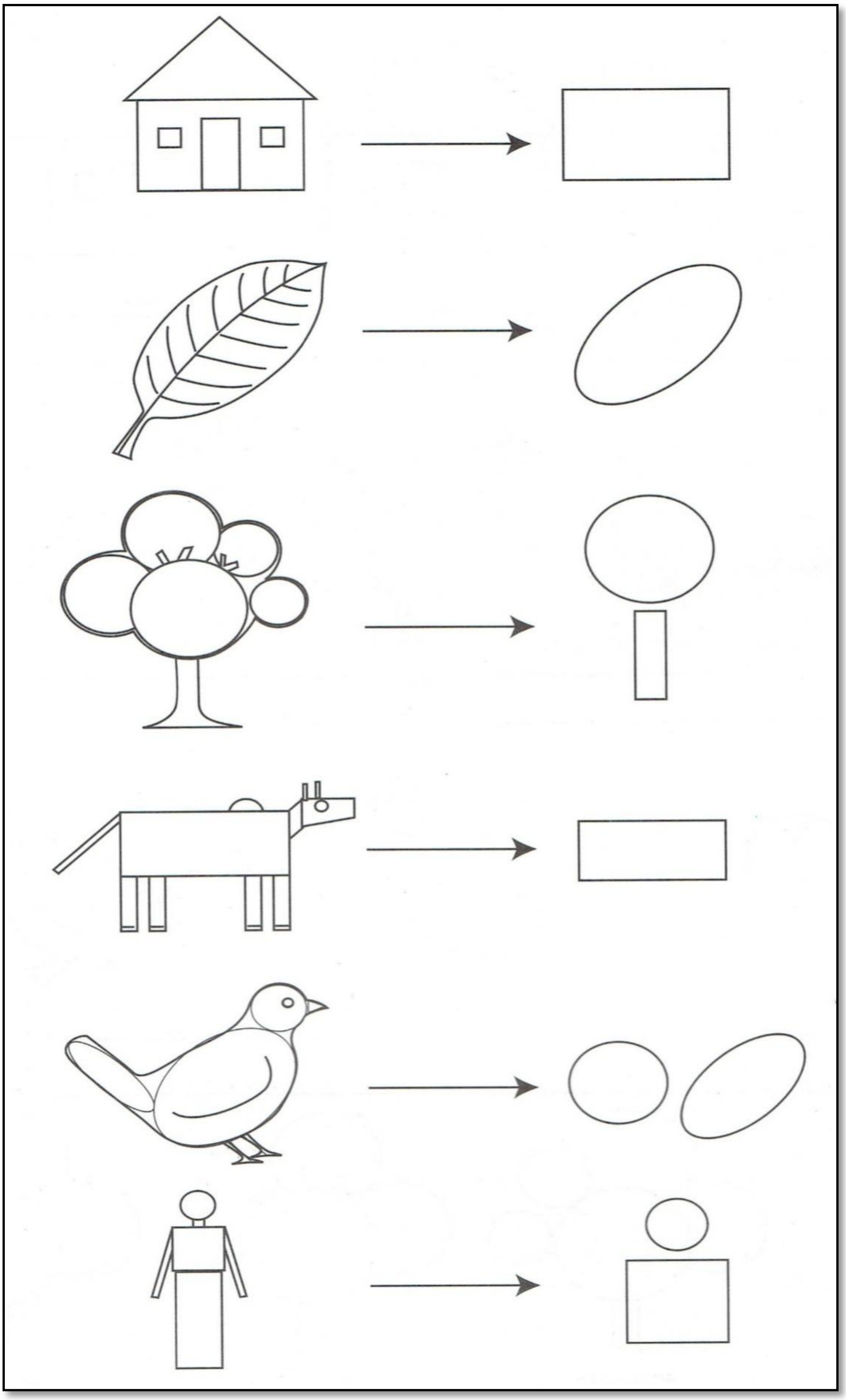

প্রথম স্তর	দ্বিতীয় স্তর	তৃতীয় স্তর
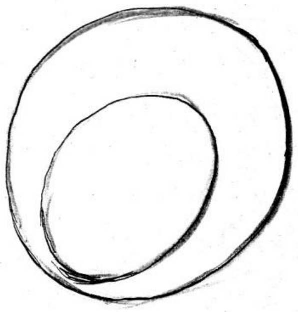		
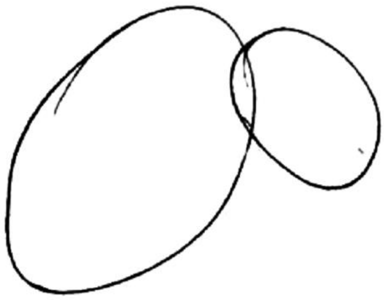	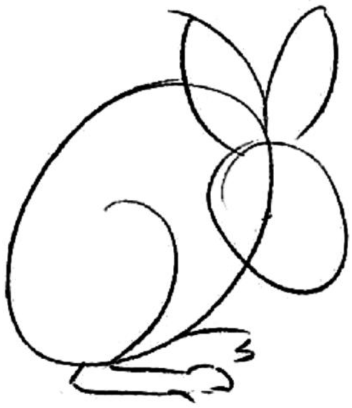	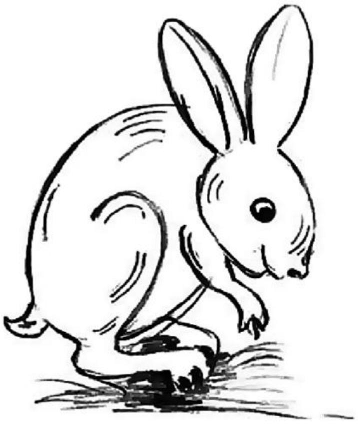
	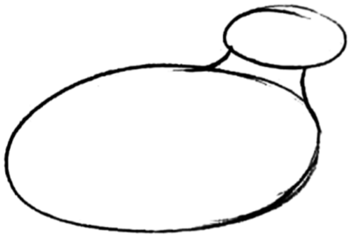	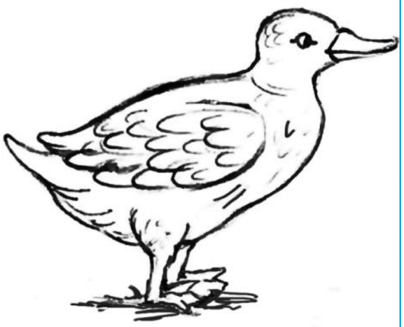

প্রথম স্তর	দ্বিতীয় স্তর	তৃতীয় স্তর
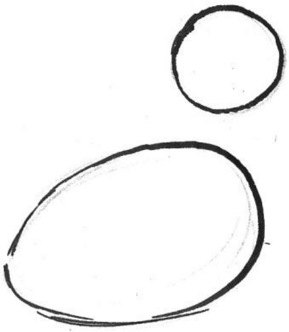	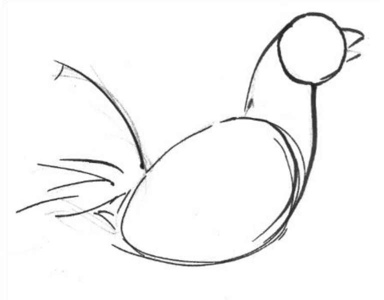	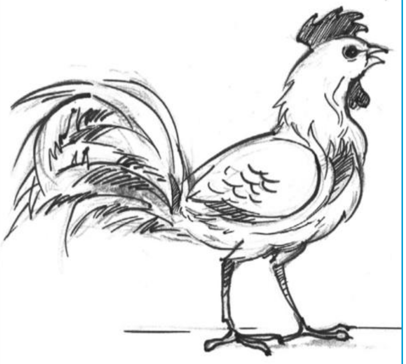
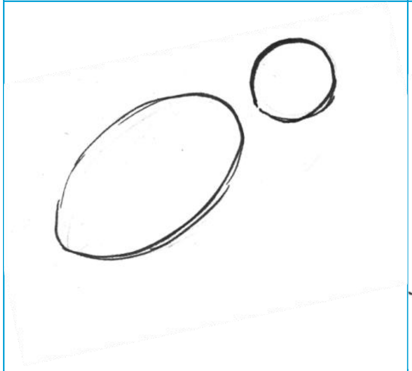	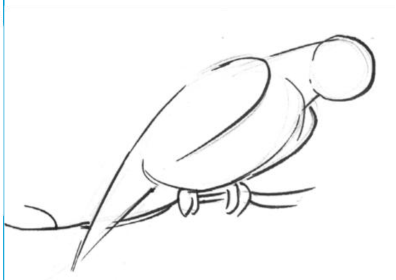	

প্রথম স্তর	দ্বিতীয় স্তর	তৃতীয় স্তর
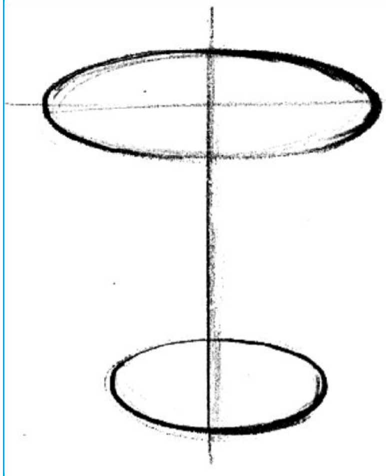	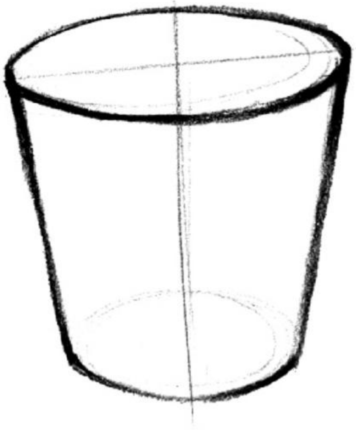	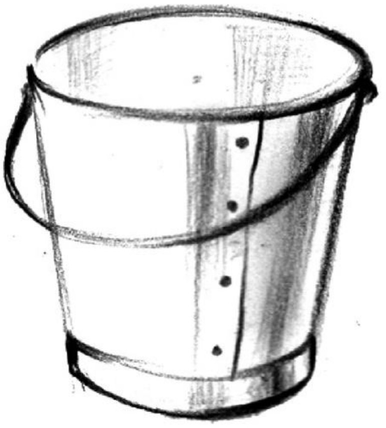
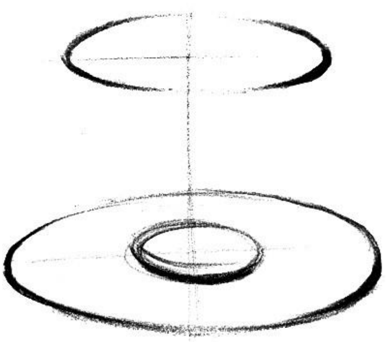	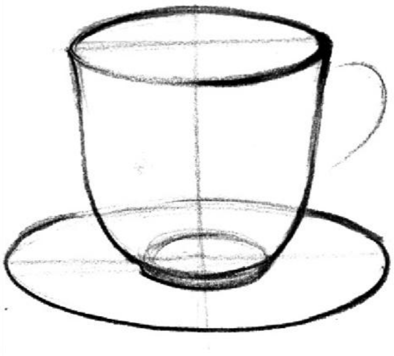	

প্রথম স্তর	দ্বিতীয় স্তর	তৃতীয় স্তর
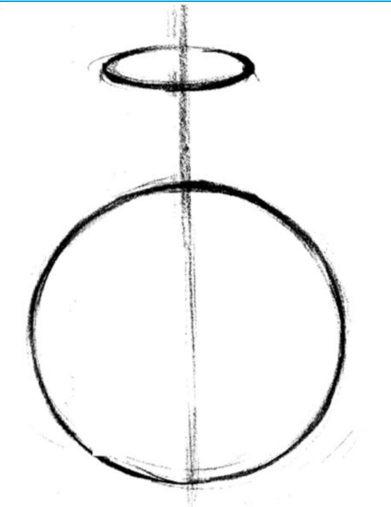	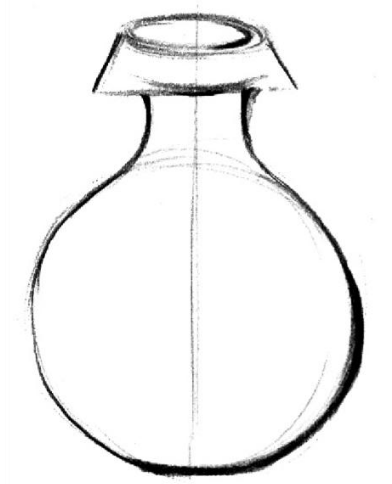	
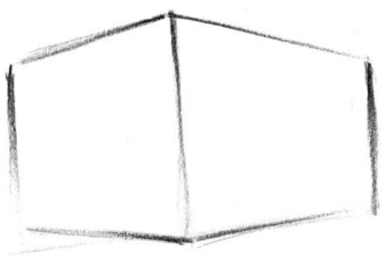	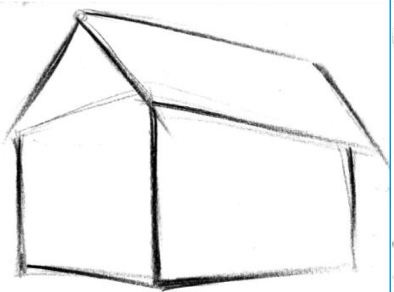	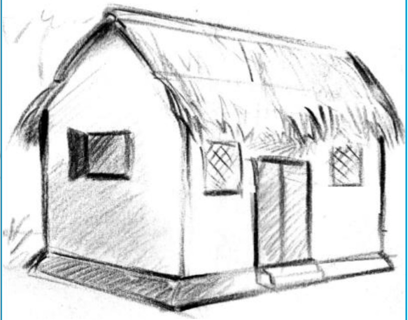

প্রথম স্তর	দ্বিতীয় স্তর	তৃতীয় স্তর
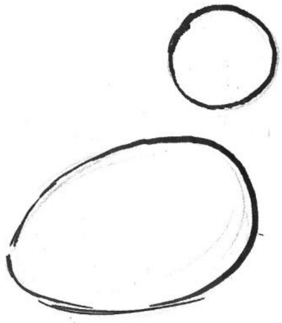		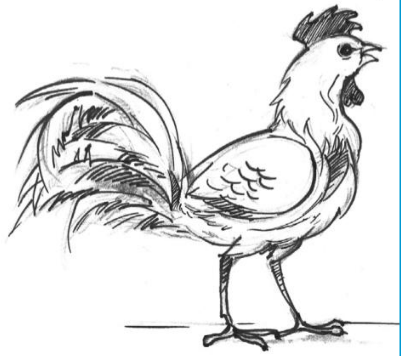
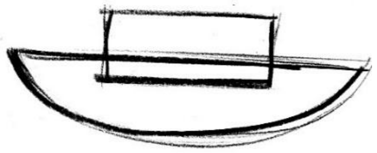	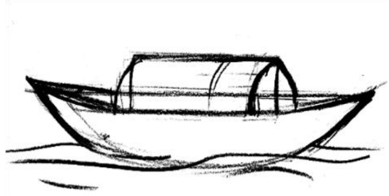	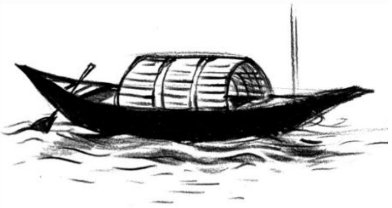
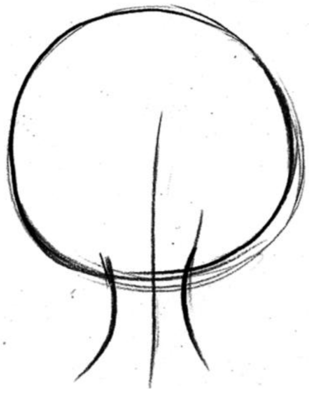		

প্রথম স্তর	দ্বিতীয় স্তর	তৃতীয় স্তর
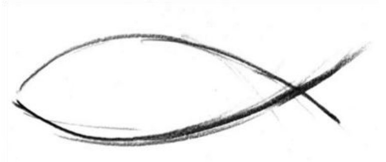		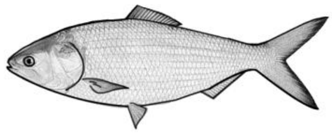
	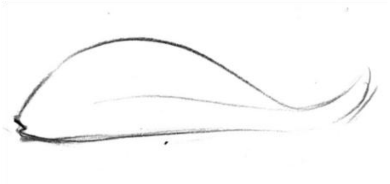	
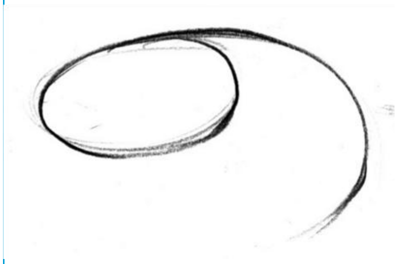		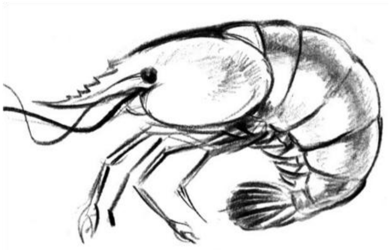

প্রথম স্তর	দ্বিতীয় স্তর	তৃতীয় স্তর
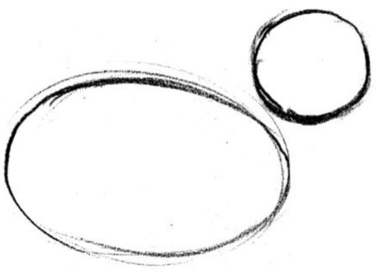	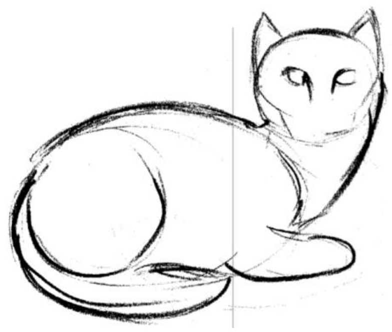	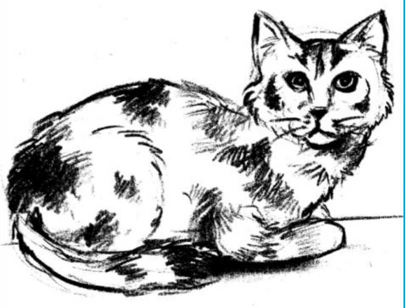
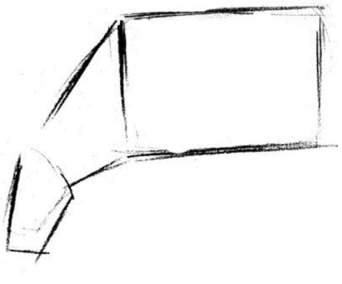	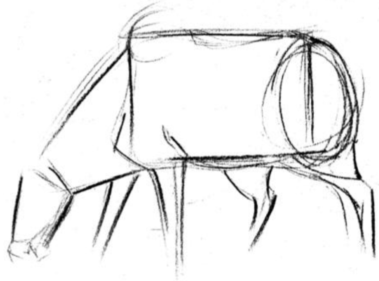	
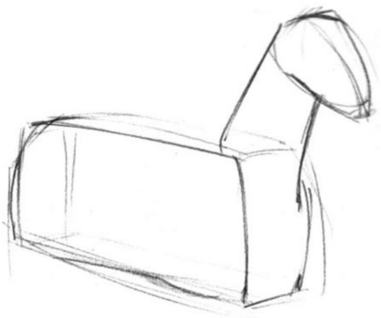		

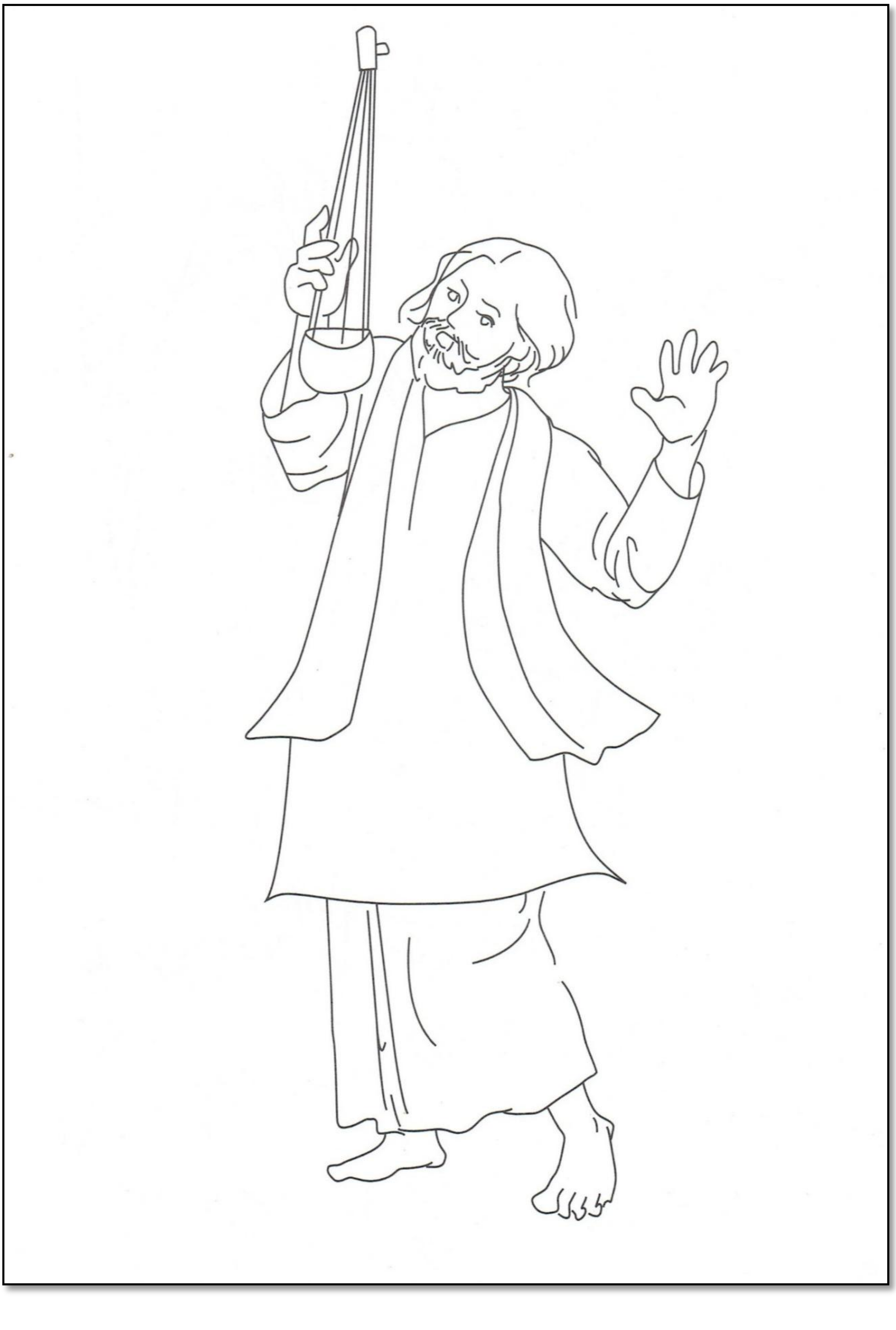

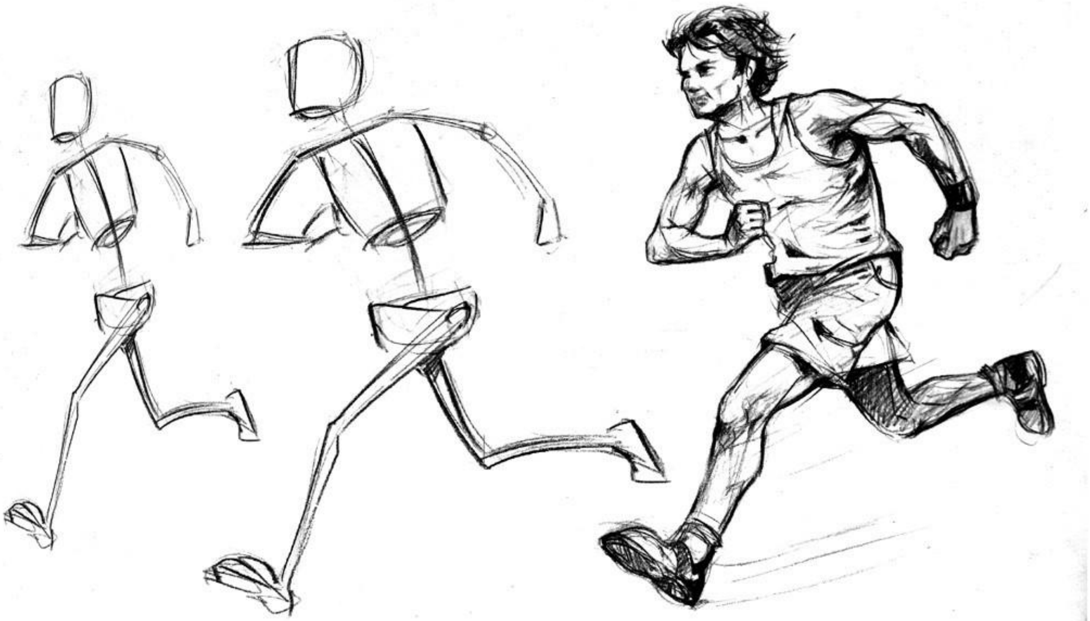

জাতীয় ফুল, ফল, মাছ, পাখি, পতাকা, স্মৃতিসৌধ, শহীদ মিনার ও বাঘ এর ছবি অঙ্কন

জাতীয় প্রতীকগুলো সম্পর্কে আমাদের প্রত্যেকের ধারণা থাকা প্রয়োজন। এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের এই বিষয়গুলো সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞান অর্জনের লক্ষ্যে ডিপিএড প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য প্রতীকগুলো অঙ্কনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

১. শাপলা ফুল এর ছবি অঙ্কন পদ্ধতি

শাপলা আমাদের জাতীয় ফুল। গ্রাম বাংলার আনাচে-কানাচে, ডোবায়, বিলে-ঝিলে এ ফুলের বিচিত্র সমারোহ দেখা যায়। পল্লী বাংলার খাল-বিল, দিঘি আর সরোবরে শাপলা ফুল তার পবিত্র রূপ নিয়ে ফুটে ওঠে। শাপলা যদিও গন্ধহীন তবুও এর সৌন্দর্যের তুলনা নেই।

তিনটি স্তরের উপর ভিত্তি করে শাপলা ফুল অঙ্কন

প্রথম স্তর: একটি বৃত্ত অঙ্কন করুন।

দ্বিতীয় স্তর: বৃত্তের মাঝামাঝি স্থান থেকে শুরু করে কয়টি প্রধান পাপড়ি অঙ্কন করুন।

তৃতীয় স্তর: দ্বিতীয় স্তরে অঙ্কিত ফুলের প্রধান পাপড়ির উভয় পাশে সমান মাপের আরো পাপড়ি অঙ্কন করুন। প্রধান পাপড়ির নিচে দুটি রেখা টেনে শাপলা অঙ্কন করে বৃত্তের দাগ রাবার দিয়ে মুছে ফেলুন।

২. **কাঁঠাল এর ছবি অঙ্কন পদ্ধতি:** কাঁঠালকে বাংলাদেশের জাতীয় ফল হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। কাঁঠাল বাংলাদেশের সর্বত্রই কমবেশি পাওয়া যায়। এই ফল রসালো ও সুস্বাদু। এই ফলে বাংলাদেশের অন্যান্য ফলের চেয়ে প্রোটিন বেশি। তিনটি স্তরের উপর ভিত্তি করে কাঁঠাল অঙ্কন করা হয়েছে।

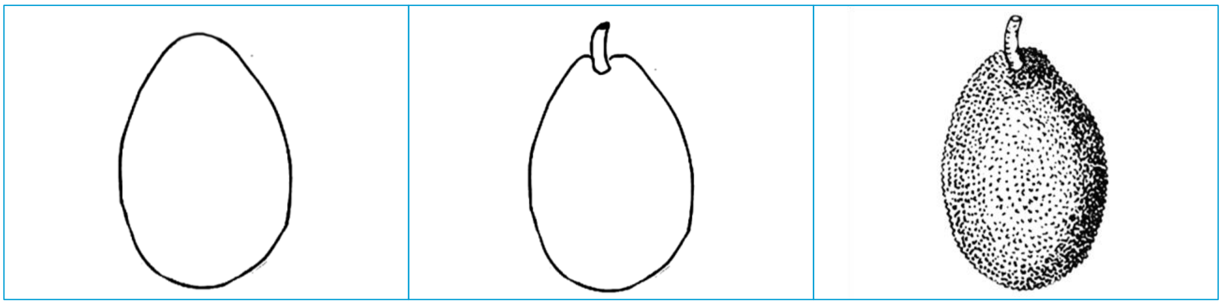

প্রথম স্তরঃ একটি ডিমের মত গোলাকৃতি অঙ্কন করুন।

দ্বিতীয় স্তরঃ ডিম্বাকৃতির উপরের অংশে ছোট দুটি রেখা বাঁকা করে টেনে একটি বোটা অঙ্কন করুন।

তৃতীয় স্তরঃ ডিম্বাকৃতির চারিপাশে ছোট ছোট (<<<) রেখা টেনে কাঁঠালের গায়ে কাঁটা এঁকে দিন। পরে অপ্রয়োজনীয় দাগগুলো মুছে ফেলুন।

৩. জাতীয় মাছ এর ছবি অংকন পদ্ধতি

দেশে বিভিন্ন ধরনের মাছ পাওয়া যায়। তার মধ্যে ইলিশ অত্যন্ত সুস্বাদু ও তৈলাক্ত মাছ। বাংলাদেশ ছাড়া পৃথিবীর আর কোথাও এত সুস্বাদু ইলিশ মাছ পাওয়া যায় না। তিনটি স্তরের উপর ভিত্তি করে জাতীয় মাছ (ইলিশ) অঙ্কন করা হয়েছে।

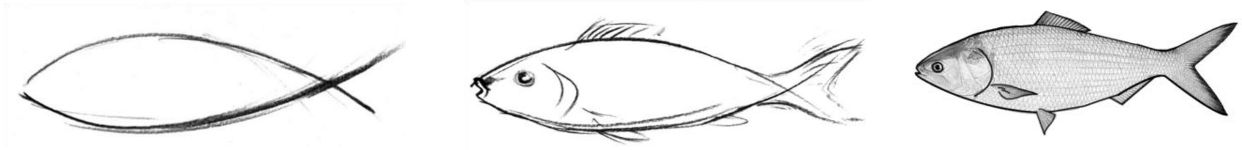

প্রথম স্তরঃ পাতা অঙ্কনের মত বাঁকা দুটি রেখা সামনা সামনি অঙ্কন করুন।

দ্বিতীয় স্তরঃ বাঁকা রেখাগুলোতে পেছনে লেজ, সামনের দিকে মাথা, মুখ এবং পাখা অঙ্কন করুন।

তৃতীয় স্তরঃ মাছের আঁইশ ও খোল অঙ্কন করার পর অপ্রয়োজনীয় লাইনগুলো মুছে ফেলুন।

৪. দোয়েল পাখির ছবি অংকন পদ্ধতি

বাংলাদেশে অনেক প্রকারের পাখি আছে। তার মধ্যে দোয়েল পাখিকে জাতীয় পাখি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। দোয়েল আকারে ছোট হলেও রং ও আকৃতি খুবই আকর্ষণীয়। এদের দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায় এবং এর সুমধুর সুর আমাদেরকে আকৃষ্ট করে।

তিনটি স্তরের উপর ভিত্তি করে দোয়েল পাখিরছবি অঙ্কন করা হয়েছে।

প্রথম স্তরঃ ডিম্বাকৃতি অঙ্কন করে উপরে আর একটি ছোট ডিম অঙ্কন করুন।

দ্বিতীয় স্তরঃ নমুনা অনুযায়ী দু'টি সরল রেখা দ্বারা লেজ ও ঠোঁট অঙ্কন করুন এবং ডিমের নিচে দু'টি সরল রেখাদ্বারা পা

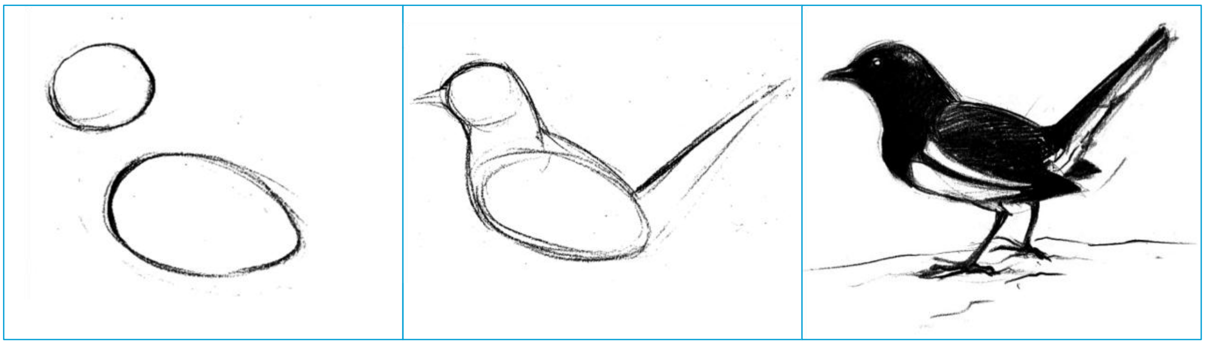

অঙ্কন করুন।

তৃতীয় স্তরঃ কালো রং দিয়ে নমুনা অনুযায়ী রং করুন।

৫. জাতীয় পতাকা এর ছবি অঙ্কন পদ্ধতি

লাল সবুজে আঁকা পতাকা আমাদের গৌরবের প্রতীক। লাখো শহীদের রক্তের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি এই পতাকা। সবুজের মধ্যে লাল বৃত্ত উদীয়মান সূর্যের প্রতীক। বৃত্তের চারপাশে গাঢ় সবুজ চির তারুণ্যের প্রতীক।

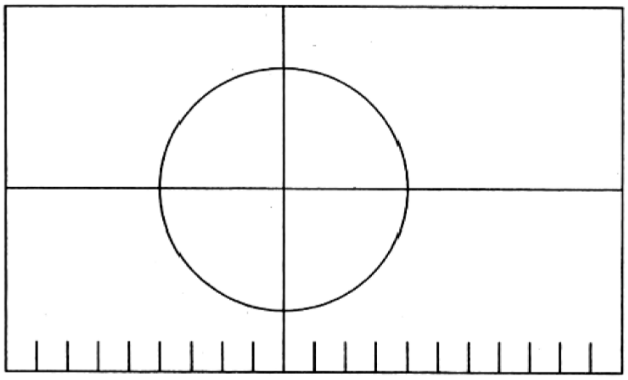

বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার নির্দিষ্ট একটি মাপ আছে। তা হলো দৈর্ঘ ও প্রস্থের অনুপাত ১০: ৬। অর্থাৎ দৈর্ঘ যদি ৩০৫ সেমি. (১০ ফুট) হয় তবে প্রস্থ ১৮০ সেমি. (৬ ফুট) হবে। লাল বৃত্তটি পতাকার দৈর্ঘের ৫ ভাগের এক ভাগ। পতাকার দৈর্ঘের ২০ ভাগের ৯ ভাগে একটি লম্ব টেনে পরে প্রস্থের ঠিক মাঝখানে দৈর্ঘের সাথে সমান্তরাল করে একটি রেখা টানুন। এ রেখাটির ছেদ বিন্দুকে কেন্দ্র করে একটি বৃত্ত আঁকুন। বৃত্তটি আঁকার পর অপ্রয়োজনীয় দাগগুলো মুছে ফেলুন। পটুয়া কামরুল হাসান জাতীয় পতাকার নকশা অংকন করেন।

৬. স্মৃতিসৌধের ছবি অংকন পদ্ধতি

লাখো শহীদের রক্তের বিনিময় আমরা পেয়েছি স্বাধীন সার্বভৌম এ দেশ। শহীদ হয়েছে ছাত্র, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী, কৃষক, শ্রমিক, ব্যবসায়ী, তরুণ-তরুণীসহ নাম না জানা অনেক লোক। তাদের আত্মত্যাগের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে নির্মিত হয়েছে স্মৃতিসৌধ। যার নক্শা অঙ্কন করেছেন প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক স্থপতি **সৈয়দ মইনুল হোসেন**। তিনটি স্তরের উপর ভিত্তি করে জাতীয় স্মৃতিসৌধের ছবি অঙ্কন করা হয়েছে।

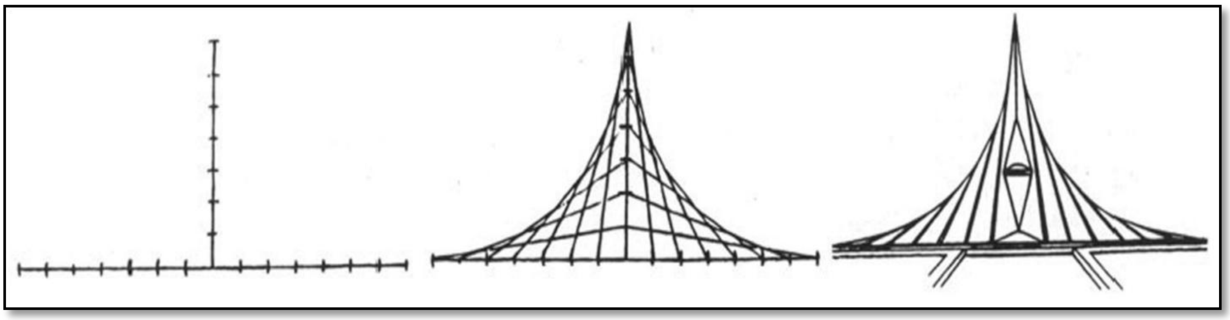

অংকন পদ্ধতি: প্রথমে ১৪ ইঞ্চি লম্বা একটি ভূমি রেখা অঙ্কন করুন। ভূমি রেখার মাঝখানে সাড়ে ১০ ইঞ্চি মাপের একটি লম্ব টানুন। ভূমি রেখাকে ১ ইঞ্চি করে ভাগ করে ১৪ ভাগ এবং লম্ব রেখাকে সমান ৭ ভাগে ভাগ করুন। অতঃপর লম্ব রেখার উভয় পার্শ্বেই প্রথমে দাগের সাথে লম্ব রেখার উপরি ভাগ থেকে মিল করুন এবং অতিরিক্ত দাগগুলো মুছে ফেলুন।স্মৃতিসৌধের প্রকৃত মাপ ভূমি রেখা ১৮৪ ফিট এবং উচ্চতা ১৫৪ ফিট।

৭. শহীদ মিনার এর ছবি অংকন পদ্ধতি

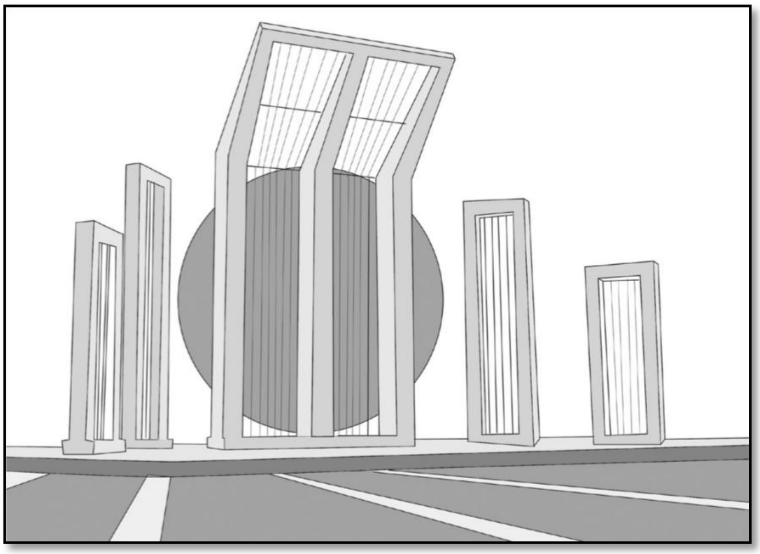

ভাষা আন্দোলনের দাবিতে ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি যাঁরা শহীদ হয়েছিলেন তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন ও স্মৃতি রক্ষার্থে শহীদ মিনার তৈরি করা হয়। প্রখ্যাত শিল্পী হামিদুর রহমান শহীদ মিনারের নক্‌শা অঙ্কন করেন। সহজে অনুসরণীয় কোন বাঁধা ধরা পদ্ধতি বা নিয়ম নাই যা অনুসরণ করে শহীদ মিনার অঙ্কন করা যায়। যিনি আঁকবেন তাঁর আগ্রহ বা ইচ্ছা অনুযায়ী যে কোন ছক বা পদ্ধতি অবলম্বন করে তিনি আঁকতে পারেন। তবে শহীদ মিনারের মাঝখানে তিনটি স্তম্ভ একটু বড় এবং সামনের দিকে একটু বাঁকা/ঝোঁকানো থাকবে। দু'পাশে দু'টি স্তম্ভ একটু ছোট হবে। মাঝের স্তম্ভকে মায়ের এবং ছোট স্তম্ভ দু'টি সন্তানের প্রতীক হিসেবে আমরা ব্যবহার করি। শহীদ মিনারের অন্যতম রূপকার নভেরা আহমেদ।

রং ও এর ভাবার্থ

বিশ্ব প্রকৃতি রং-এর মেলা। দৃশ্যমান জগতে আমরা যা কিছুই দেখতে পাই তা কোন না কোন রং দ্বারা আবৃত। আমরা যে দিকে দৃষ্টি দেই সর্বত্রই বিচিত্র রং-এর বিপুল সমারোহ। উজ্জ্বল রং ও বর্ণময় প্রাকৃতিক পরিবেশ শিশু মনে অপার আনন্দ দেয়। সেহেতু রং এর প্রাথমিক ধারণা, শ্রেণি বিভাগ ও সঠিক ব্যবহার একজন শিক্ষকের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন। সূর্যের আলো কোন ত্রিকোণাকার কাঁচের (প্রিজম) মধ্য দিয়ে প্রতিসরিত হলে আমরা সাতটি রং দেখতে পাই। রং সাতটি হলো– বেগুনি, নীল, আসমানি, সবুজ, হলুদ, কমলা ও লাল। সংক্ষেপে এ রংগুলোকে বেনীআসহকলা বলা হয়। তরঙ্গের তারতম্যের উপর ভিত্তি করে রংকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা–

প্রথম স্তরের রং বা মৌলিক রং (primary colours): যে রং অন্য কোন দুই বা অধিক রং এর মিশ্রণে তৈরী হয় না তাকে মৌলিক রং (primary colours) বলা হয়।
মৌলিক রং (primary colours) তিন প্রকার, যথা - লাল, হলুদ, নীল

প্রথম স্তরের রং বা মৌলিক রং

PRIMARY COLORS

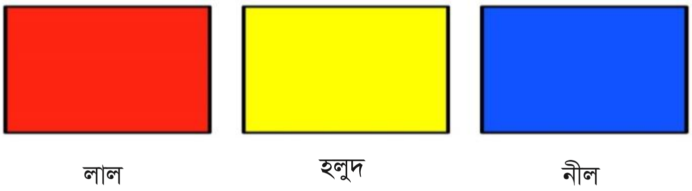

দ্বিতীয় স্তরের রং বা মাধ্যমিক রং (secondary colour): মৌলিক যে কোন দুইটি রংয়ের মিশ্রণে যে রং তৈরী হয় তাকে দ্বিতীয় স্তরের রং বা মাধ্যমিক রং (secondary colour) বলা হয়।
মাধ্যমিক রং (secondary colour) তিন প্রকার, যথা- বেগুনী , সবুজ , কমলা

মাধ্যমিক রং (secondary colour)

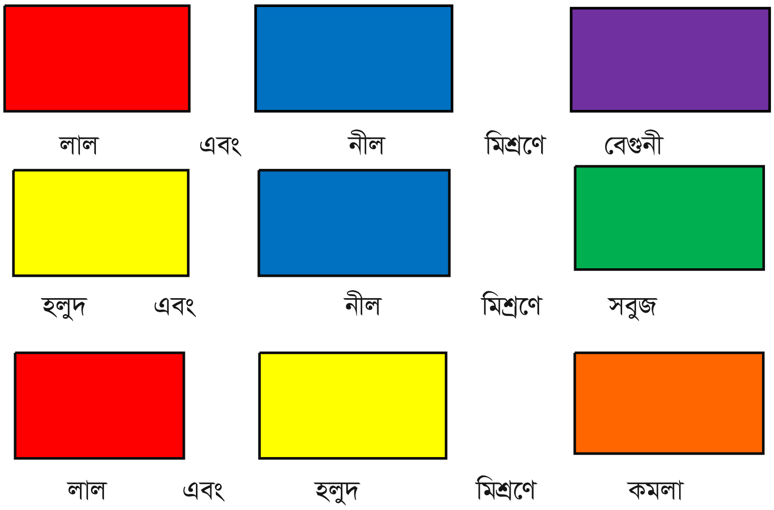

তৃতীয় স্তরের রং বা মিশ্র রং (Tertiary colours)

একটি প্রথম স্তরের রং বা মৌলিক রং (primary colours) এবং একটি দ্বিতীয় স্তরের রংবা মাধ্যমিক রং (secondary colour) এর সংমিশ্রণে যে রং তৈরি হয় তাকে তৃতীয় স্তরের রং বা মিশ্র রং (tertiary coloures) বলা হয়। যেমন- হলুদ+কমলা= খাঁটি সোনার রং বা কনক, লাল+ কমলা= ইট রং, লাল+বেগুনী=আলতা রং, নীল+বেগুনী=ধুসর রং, নীল+ সবুজ মরকত রং, হলুদ+ সবুজ= জরদ রং।

প্রথম স্তরের রং বা মৌলিক রং (primary colours) এবং দ্বিতীয় স্তরের রং বা মাধ্যমিক রং (secondary colour) ছাড়া বাকী সব রং তৃতীয় স্তরের রং বা মিশ্র রং (tertiary colours) বলা যায়।

তৃতীয় স্তরের রং বামিশ্র রং (tertiary colours)

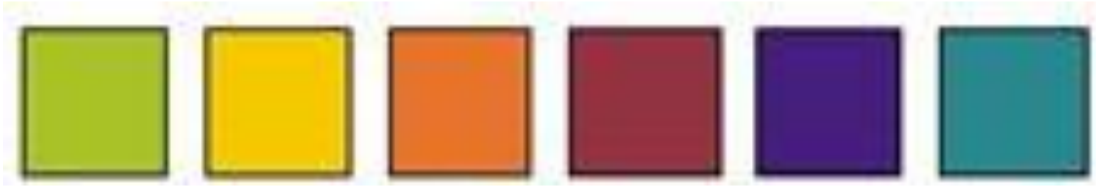

সাদা রং:

যখন সবগুলো আলোক তরঙ্গ সমান উজ্জ্বলতা এবং উচ্চতায় চোখের সামনে প্রতিভাত হয় তখন সাদা রং দৃষ্টিগোচর হয়। সাদা রং হলো সবগুলো রং এর সমষ্টি। অর্থাৎ সাদা রং এর মধ্যে সকল রং এর অবস্থান বিদ্যমান।

কালো রং:

যখন আলোক তরঙ্গের ক্ষেত্রে যখন কোন রং এর উপস্থিতি থাকে না। অর্থাৎ রং এর ক্ষেত্রে যখন সম্পূর্ণ শূন্যতার সৃষ্টি হয় তখন সে অবস্থাকে আমরা বলি কালো রং। কালো রং হলো রং এর অনুপস্থিতি।

নিরপেক্ষ রং:

এ রং এর অর্থ হলো বিশেষ কোন রং এর পক্ষে নয়। অর্থাৎ সকল পক্ষের উপরেই তার একটা প্রভাব থাকবে। সাদা কালো এবং সকল প্রকার ধূসর রং নিরপেক্ষ রং এর শ্রেণিভুক্ত। সাদা এবং কালো সম্পূর্ণ এবং ধূসর রংগুলো আংশিকভাবে নিরপেক্ষ।

রং এর বৈশিষ্ট্য বা গুণ:

- প্রত্যেকটি রং এর মধ্যে তিনটি বৈশিষ্ট্য বা গুণ বিদ্যমান। যথা–বর্ণ (Hue), গাঢ়তা ও লঘুতা (Value), বর্ণের উজ্জ্বলতা ও অনুজ্জ্বলতা (Intensity)|
- বর্ণ: বর্ণের অর্থ হচ্ছে বিশেষ কোন রং এর সমাবেশ, যেমন–লাল, নীল ও হলুদ। রং এর এই গুণের ফলে এক জিনিস থেকে অন্য জিনিসকে বা একটি রংকে অন্যান্য রং থেকে পৃথক করে দেখা সম্ভব।

- রং এর গাঢ়তা ও লঘুতা: ছবি আঁকার সময় কোন কোন সময় রং এর গাঢ়তা অথবা লঘুতা দেখানোর প্রয়োজন হয় এবং সে অনুযায়ী গাঢ় কিংবা হালকা রং এর ব্যবহার করা হয়ে থাকে।
- রং এর উজ্জ্বলতা এবং অনুজ্জ্বলতা: প্রয়োজন অনুযায়ী কোন কোন সময় রং এর উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি এবং কমানো সম্ভব।

রং এর মনস্তাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়া:

রংএর সাথে মানুষের একটা নিবিড় সম্পর্ক আছে। বিভিন্ন রং মানুষের মনে ভাবাবেগের সৃষ্টি করে। শিল্পী তাঁর মনের যে ভাবটি সঠিকভাবে ব্যক্ত করার জন্য সঠিক রংটি নির্বাচন করে নেন দর্শকের মনেও বিভিন্ন রং দেখে বিভিন্ন ভাব সঞ্চারীত হয়ে থাকে। যে রং এর সাথে যে মনস্তাত্ত্বিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার ব্যাপারটি সংশ্লিষ্ট তা হলো–

- লাল: লাল রং মানব মনে উত্তেজনার সৃষ্টি করে। লাল রংটি হলো রক্তের রং তা রক্তপাত, বিপদজনক এবং উত্তেজনার বা অত্যন্ত আকর্ষণীয় কোন পরিস্থিতির ইঙ্গিত বহন করে।
- নীল: নীল রং এর সাথে মানব মনের একটা প্রশান্ত অবস্থার সম্পর্ক জড়িয়ে আছে। গাঢ় নীল গভীরতার আভাস দেয়। সম্ভবত আকাশের রং এর সাথে এই মনের ভাবের কোন সম্পর্ক আছে।
- হলুদ: হলুদ রং মানব মনের আনন্দ উলাসের প্রতীক। বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠানে এ রং ব্যবহার হয়ে থাকে। এটা মানুষের মনস্তাত্ত্বিক অভিব্যক্তিও বটে।
- সাদা: সাদা রং হলো পূর্ণতা, পবিত্রতা এবং শান্তির প্রতীক।
- কালো: কালো রং শোক-তাপ, দুঃখ-বিষাদ এর ইঙ্গিত বহন করে।
- সবুজ: প্রকৃতির সাথে মিল রেখে কখনও বৃদ্ধি বা যৌবনের প্রতীক বলে মনে করা হয়।

রং এরং অন্তর্নিহিত অর্থ আছে যা নিম্নে উল্লেখ্য করা হলো

রংয়ের নাম	অর্থপূর্ণ সামঞ্জস্য
লাল (উজ্জ্বল)	উষ্ণতা, দীপ্তি, অগ্নিশিখা, অস্তগামী সূর্য
সাদা	পবিত্রতা, পূণ্যতা, আনন্দ , স্ফুর্তি
কালো	শোক, হতাশা, অনিষ্ট, পাপ
কমলা	হৃদয়াবেগ, কামনা, নৈকট্য, উষ্ণতা, কমলা লেবু
নীল	প্রশান্তি, মোহনীয়তা, শীতলতা,
বেগুনী	মহত্ববোধ, মর্যাদা, ধৈর্য্য
উজ্জ্বল হলুদ	ধর্মীয় আবেগ, ত্যাগ, ধান, সর্ষেফুল
সোনালী হলুদ	ঐশ্বর্য, স্বাস্থ্য, সমৃদ্বি, সোনা, সূর্যমুখী ফুল
সবুজ	প্রাচুর্য, সজীবতা, ঘাস, কচিপাতা
ধুসর-পিঙ্গল	শান্তি , উদাসীনতা , মৃত্তিকা
সবুজ নীল	কোমলতা, আনন্দ, সমুদ্রের ফেনা
হলুদ	বিস্ময়
ধুসর (মলিন)	অকৃতকার্যতা

প্রকৃতি থেকে পাওয়া রং

শ্যামল শোভায় সুশোভিত এ বাংলাদেশের সব জায়গাতেই বিভিন্ন গাছপালা, লতাপাতা, ফল-ফুল ইত্যাদিতে পরিপূর্ণ। এসব গাছ-পালা, লতা-পাতা, ফুল-ফলসহ বিভিন্ন জিনিস থেকে আমরা সহজেই নানা প্রকার রং পেতে পারি যা তৈরি এবং ব্যবহারে কোমলমতি শিশুরা উৎসাহী হয়। যেমন -

বেগুনি রং–পাকা পুঁই শাকের ফল ও ছিটকীর ফল

সবুজ রং – সীম পাতার রস ও গাঁদা ফুলের পাতার রস

হলুদ রং–কাঁচা হলুদ অথবা শুকনো হলুদের রস

কমলা রং–মেহেদি পাতার রস অথবা শিউলী ফুল

কালো রং –কাঠ কয়লা বা রান্নার পাতিলের তলা থেকে, তেলের বাতি থেকে

খয়েরি রং –ডেউয়া গাছের ছাল, কাঁচা গাব ও কচু গাছের রস থেকে এবং খয়ের থেকে।

রেখাচিত্র, প্রাকৃতিক দৃশ্য ও জল রং এ ছবি আঁকা

কোন বিন্দু যখন চলমান হয় তখন রেখা তৈরি হয়। এই রেখা দিয়ে আমরা নানা ধরনের লেখা সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহার করি যা আমাদের জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ছবি আঁকা, নক্‌শা, ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রইং, সাংকেতিক চিহ্ন এমনকি আদিম যুগের আঁকা চিত্রও মূলত রেখা নির্ভর। আদিম যুগে এই রেখাই ছিল মানুষের অন্যতম ভাষা যা সভ্য জগতে এসেও আমরা কাজে কর্মে সাক্ষ্য রাখি। শিশুরা যখন ভাষা শেখে না, কথা বলতে পারে না তখন তারা ছবির মাধ্যমে নিজেদের প্রকাশ করতে চায়। বর্তমানে রেখা চিত্রের বহুল প্রচলন রয়েছে। নানা ধরনের সরল রেখা, বক্র রেখা, ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ, বৃত্ত ইত্যাদি ব্যবহার করে ছবি ও নক্‌শা তৈরি করা হয় যা ব্যবহারিক জীবনে খুবই প্রয়োজন। নক্‌শা হলো বাস্তবধর্মী চিত্রকলার সারাংশ। নক্‌শার ব্যবহারিক উপাদান ৮টি।

যথা–১. **ভিত্তি** (Base) ২. **রেখা** (Line) ৩. **দিক** (Direction) ৪. **আকার** (Size) ৫. **আকৃতি** (Shape) ৬. **বুনট** (Texture) ৭. **মান** (Value) ৮. **রং** (Colour)

নিম্নে বিভিন্ন ধরনের রেখার মাধ্যমে কিছু সহজ অঙ্কন দেখানো হলো।

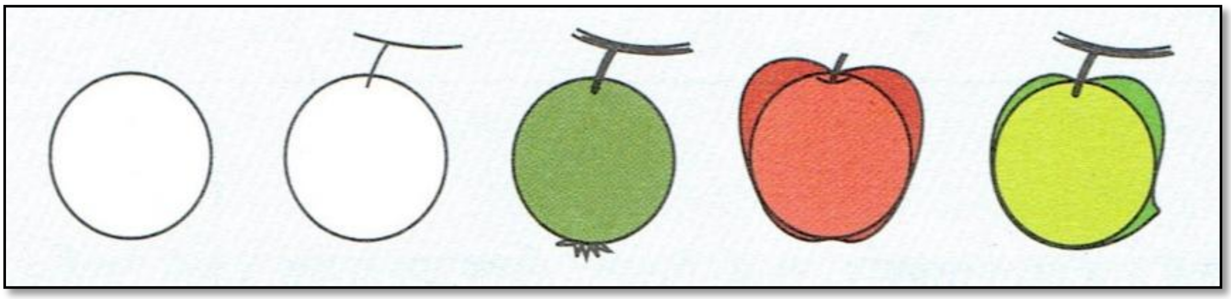

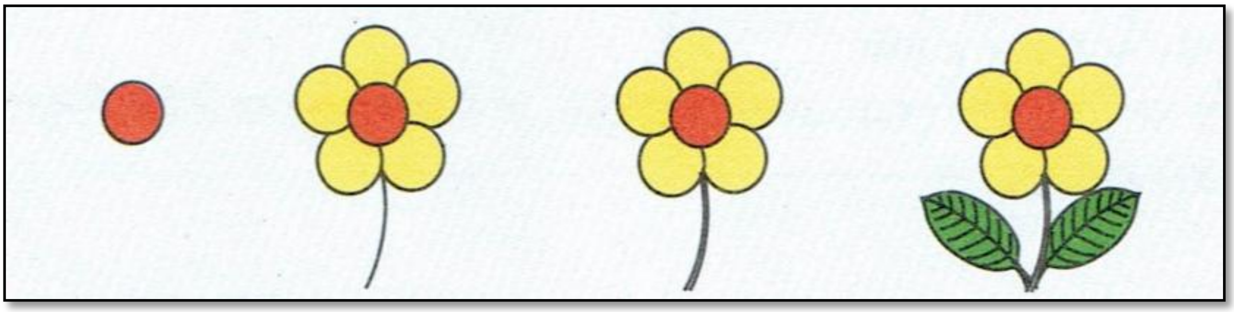

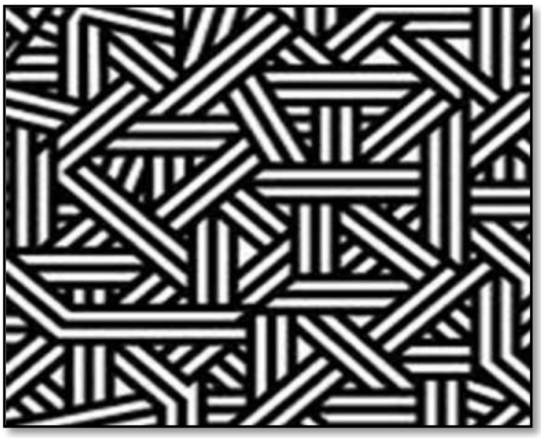

ড্রইং (প্রাকৃতিক দৃশ্য)

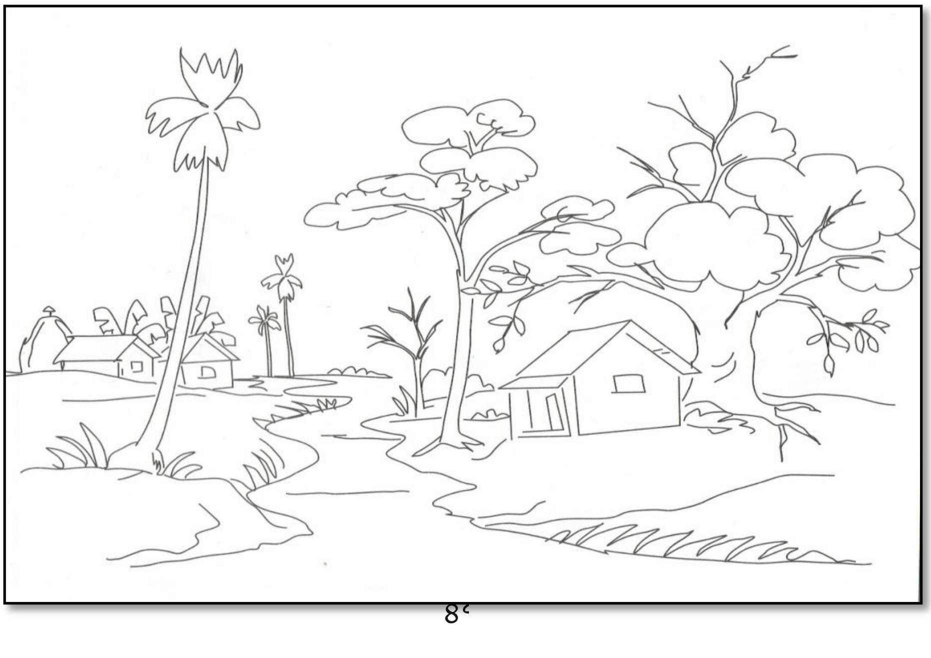

প্রাকৃতিক দৃশ্য আঁকার পদ্ধতি

বিশ্ব প্রকৃতির অপরূপ সমারোহের মধ্যে আমাদের বসবাস। প্রকৃতির প্রতিটি উপাদানের সাথে আমাদের আত্মিক একটা সম্পর্ক আছে। যার একটা প্রভাব ছবি আঁকতে পরিলক্ষিত হয়। প্রকৃতি নির্ভর বিষয়বস্তুকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন–স্থান, কাল ও পরিবেশ। এই স্থান, কাল ও পরিবেশের প্রভাব যত স্বাভাবিক ও বাস্তবধর্মী হবে ছবিটি তত দৃষ্টিনন্দন ও প্রাণবন্ত হবে। বিষয়বস্তু অনুযায়ী চিত্রের চারি পার্শ্বে সীমারেখা চিহ্নিত করে রং, অনুপাত, পরিপ্রেক্ষিত ও ভারসাম্য সঠিক ব্যবহার করে ছবি আঁকতে হবে। অনেক সময় সীমারেখা না টেনেও পুরোটা কাগজে ছবি আঁকা যায়। ছবি আঁকার সময় প্রথমেই একটা বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করে অন্যান্য বিষয়বস্তুর সন্নিবেশ ঘটাতে হবে। যাতে ছবির ভারসাম্য ঠিক থাকে এবং দর্শক দেখে যেন বলে ছবিটি খুব সুন্দর হয়েছে।

জল রং এ ছবি আঁকার পদ্ধতি

জল রং সাধারণত দুধরনের হয়। ১. স্বচ্ছ জল রং ২. অস্বচ্ছ জল রং।

স্বচ্ছ জল রং:

এটা পানি মিশ্রিত রং। ছবি আঁকার জন্য জল রং অন্যতম একটি মাধ্যম। এ রং-এ ছবি আঁকার জন্য কিছুটা অভ্যাস থাকা প্রয়োজন। জল রং ছবি আঁকার সময় ছবির মধ্যে উজ্জ্বলতা এবং রং এর পরিপ্রেক্ষিত এর প্রভাব থাকতে হবে। ছবির মধ্যে এ প্রভাবগুলো রাখার জন্য অভিজ্ঞতা থাকার প্রয়োজন। জল রং এ ছবি আঁকার ক্ষেত্রে ৩টি পর্যায় শেষ করতে হয়। ফাস্ট ওয়াশ, সেকেন্ড ওয়াশ ও থার্ড ওয়াশ। অর্থাৎ প্রথমে বিষয়বস্তুটি পেন্সিল দিয়ে ড্রইং করে এর পর রং ব্যবহার করতে হবে। রং ব্যবহারের সময় ছবির বিষয়বস্তু অনুযায়ী প্রথমে হালকা করে রং দিতে হবে। দ্বিতীয় বার রং ব্যবহারে প্রথম বারে পানিতে রং এর পরিমাণ যতটুকু থাকবে তা থেকে বেশি গাঢ় করে দিতে হবে। তৃতীয় বার বা শেষ বারে দ্বিতীয় বার পানিতে যে পরিমাণ রং থাকবে তা থেকে বেশি গাঢ় করে লাইট এন্ড শেড অনুযায়ী রং ব্যবহার করতে হবে। থার্ড ওয়াশে রং এর পরিমাণ বেশি নিয়ে বিষয়বস্তুর তারতম্য অনুসারে
যথাস্থানে গাঢ় রং ব্যবহার করতে হবে। লাল ও নীল রং এর সাথে বিষয়বস্তুর উপযোগী রং দিয়ে আলোছায়া বোঝাতে হবে এবং এটাই হবে লাস্ট ওয়াশ। জল রং ব্যবহার পদ্ধতিতে মোম রং এবং গ্লিসারিন ব্যবহার করা যায়।

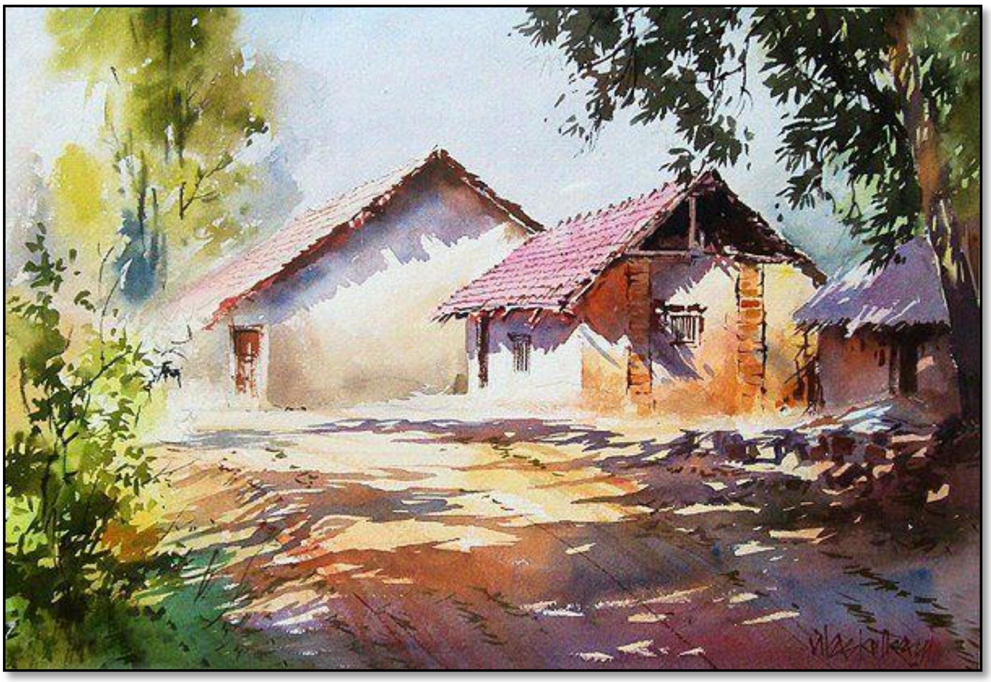

অস্বচ্ছ জল রং:

এ রং সাধারণত অস্বচ্ছ। যেমন- পোষ্টার কালার, এক্রেলিক কালার, পাস্টিক কালার। শিশুরা এ রং-এ ছবি আঁকতে খুবই পছন্দ করে। কারণ থিক কালারে ছবি আঁকলে রং উজ্জ্বল হয়। আবার রং ব্যবহারের পদ্ধতি হলো গাঢ় রং থেকে হালকা। একই পদ্ধতিতে তেল রং এ ছবি আঁকা হয় । শিশু যখন আস্তে আস্তে তার বাস্তবধর্মী ছবিতে ফিরে যায় তখন সে স্বচ্ছ রং এ ছবি আঁকতে পছন্দ করে।

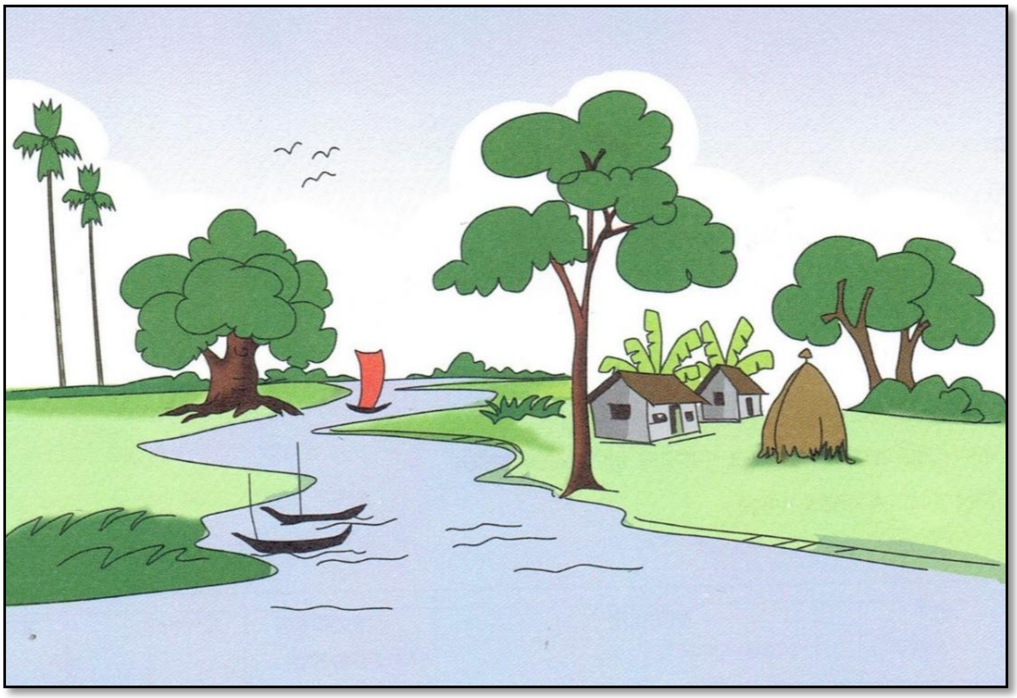

প্যাস্টেল রং আঁকা ছবি

অধ্যায় - তিন

- রঙ্গিন ও সাদা কাগজ কেটে নকশা এবং কাগজের মণ্ড দিয়ে মডেল/সৃজনশীল শিল্পকর্ম তৈরি করা
- মাটি ও পাট দিয়ে বিভিন্ন মডেল তৈরি
- খেজুরপাতা, নারিকেল পাতা ও ডিমের খোসা দিয়ে শিল্পকর্ম তৈরি

রঙিন ও সাদা কাগজ কেটে নকশা এবং কাগজের মণ্ড দিয়ে মডেল/সৃজনশীল শিল্পকর্ম তৈরি

আবহমানকাল ধরে গ্রাম ও শহরে রঙিন কাগজের ব্যবহার হয়ে আসছে। রঙিন কাগজ দিয়ে বিভিন্ন ধরনের নক্শা তৈরিতে শিক্ষিত অশিক্ষিত প্রায় সবাই অভ্যস্ত এবং সকলের কাছে প্রিয়। রঙিন কাগজ দিয়ে আমরা অনেক সুন্দর নকশা, প্যাটার্ন, পশু, পাখি ইত্যাদি তৈরি করে থাকি। রঙিন কাগজ ব্যবহার করে কোন জিনিস তৈরি শিশুর সৃজনশীল প্রতিভা বিকাশের জন্য খুবই সহায়ক। তাছাড়া বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠানে নানাভাবে এ ধরনের কাজের ব্যবহার থাকলে অনুষ্ঠান অত্যন্ত আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে এবং অনুষ্ঠানের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। বিশেষ করে বিভিন্ন রঙের কাগজ দিয়ে ঘরদোর সাজালে অনেক দূর থেকে খুবই সুন্দর দেখা যায়।

নিশান তৈরি

রং-বেরং এর কাগজের নিশান সাজ সজ্জার জন্য খুব সহজ একটি জিনিস। কোন অনুষ্ঠানে যাওয়ার দ্বারপ্রান্তে বা মসজিদ, মন্দিরের সামনে বাঁশ বা কলাগাছ পুঁতে চারকোণা বা তিন কোণার নিশান গেঁথে দেওয়া হয়। শোভাযাত্রা বা উৎসব অনুষ্ঠানে বা মিছিলে সবার হাতে রং-বেরং এর নিশান থাকলে মিছিল খুব আকর্ষণীয় হয়। নিশান দু'ধরনের চারকোণা ও তিনকোণা। নিশান তৈরির জন্য পুরো কাগজটি যাতে কাজে লাগাতে পারেন সেভাবে কাগজটি ভাঁজ দিন। কাগজের সাইজ ৭৫ সেমি. লম্বা ও ৫০ সেমি. চওড়া হলে ভাল হয়। এবার কাগজদুই খন্ড এক সাথে নিয়ে চারভাঁজকরে কাটুন। এবার কিছু কাগজ চারকোণার রেখে বাকি কাগজ তিনকোণাকৃতি কেটে নিশান তৈরি করুন।

কাগজ খন্ড আঠা দিয়ে পাট কাঠি/বাঁশের দড়িতে লাগিয়ে ব্যবহার উপযোগী করুন। কাঠিতে কাগজ লাগানোর সময় মনে রাখতে হবে যে কাগজ যেন উল্টাপাল্টা না হয়।

কাগজ কেটে শিল্পকর্ম

প্রথমে একটি সাদা বা রঙিন কাগজে (লাল কাগজ) বিষয়টিকে ড্রইং করে (যেমন প্রজাপতি, পাখি, হরিণ, ফুল ইত্যাদি) এন্টিকাটার অথবাকাঁচি দিয়ে বিষয়টি ছাড়া বাকি অংশটুকু খুব সাবধানে কেটে ফেলে দিতে হবে। এর পর লাল কাগজে কাটা প্রজাপতিটির উলটো পিটে আঠা লাগিয়ে সাদা অথবা হালকা রং এর কাগজে লাগিয়ে নিতে হবে। এই প্রক্রিয়ায় যে কোন কাগজ কেটে শিল্পকর্ম করা যায়।

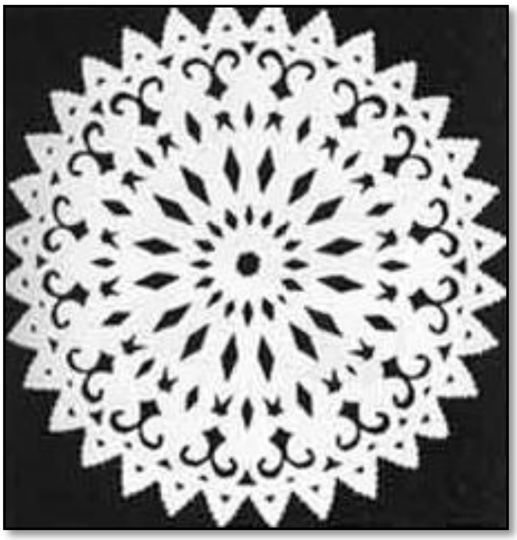

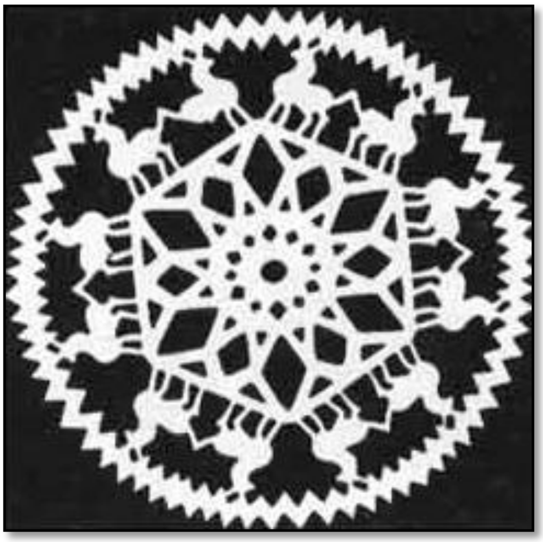

কাগজের মণ্ড দিয়ে মডেল/সৃজনশীল শিল্পকর্ম তৈরি করা

মণ্ড তৈরির পদ্ধতি

প্রথম ধাপ-

ফেলে দেয়া যে কোন নিউজপ্রিন্ট / নিউজ পেপার ছোট ছোট টুকরো করে কোন বালতি/গামলায় ২/৩ দিন পরিস্কার পানিতে ভিজিয়ে রাখতে হবে। পানিতে ভেজার পর নরম হলে পানি বার করে ঝেড়ে তুলে ফেলতে হবে,প্রয়োজনে হাত দিয়ে ছাড়িয়ে নিতে হবে। কাগজ অনেকদিন ভিজলে বা কাগজে ময়লা থাকলে অনেক সময় দুর্গন্ধ হয়ে যেতে পারে। তাই একটু ব্লিচিং পাউডার বা কয়েক ফোঁটা ডেটল দিলে দুর্গন্ধ হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে। এভাবে কাগজের মণ্ড তৈরি করে নিতে হবে। মণ্ডে কোন প্রকার ময়লা পাওয়া গেলে পরিস্কার করে নিতে হবে। ব্লেন্ডারে ব্লেন্ড করে নিলে ভালো হয়।

দ্বিতীয় ধাপ

কাগজের মন্ডর সাথে আনুপাতিকহারে চক পাউডার মিশ্রন করলে মন্ড সাদা দেখায়। মন্ডকে শক্ত করার জন্য মন্ডের সাথে অল্প আঠা বা গাম মিশাতে হবে । যে কোন আঠা বা গামই ব্যবহার করুন না কেন তাতে একটু তুঁতে মিশিয়ে নিতে হবে। পরবর্তী সময় কাগজের মন্ডের তৈরি শিল্পকর্মটি যেন কোন পোকা মাকড় থেকে রক্ষা পায়।

তৃতীয় ধাপ

মন্ড আর গাম এক সাথে আনুপাতিক হারে মিশিয়ে কাজের উপযোগী করে সুন্দর একটি পেষ্ট তৈরি করে নিতে হবে। তৈরি কৃত পেষ্ট দিয়ে চাহিদা মতো শিল্পকর্ম করা যাবে। মনে রাখতে হবে, যতটুকু মন্ডের কাজ করবেন, ততটুকু মন্ডতে গাম মেশাতে হবে। কারণ গাম মেশানো মন্ডবেশিক্ষণ নরম থাকে না । বাতাসে শুকিয়ে শক্ত হবার সম্ভাবনা থাকে। গাম

মিশানো মন্ড সংরক্ষণের প্রয়োজন হলে পলি ব্যাগে ডেকে রাখা যেতে পারে, তবে দুই এক দিনের মধ্যে ব্যবহার করলে ভাল হয়।

কাগজ বা মন্ড দিয়ে শিল্পকর্ম তৈরি করা

- **ছাচ ব্যবহার করে**–প্রথমে নিউজপ্রিন্ট কাগজ লম্বা করে কেটে নিতে হবে। তারপর পানিতে ভিজিয়ে ছাচের উপর পেঁচাতে হবে। প্রথমবার পেঁচানোর পর পরবর্তী কাগজে গাম লাগিয়ে পেঁচাতে হবে। এভাবে পর পর বেশ কয়েক বার পেঁচিয়ে একটা স্বাভাবিক পুরুত্ব এসে গেলে এর উপর মন্ড অল্প অল্প করে লাগিয়ে শিল্পকর্মটির কাজ শেষ করতে হবে। এর পর শুকিয়ে গেলে ছাঁচটি বের করে নিতে হবে। দুই তিন দিন পর প্রথমে এক দুই বার সাদা রং লাগিয়ে এর পর পছন্দ মত রং দিয়ে কাজটি শেষ করতে হবে।

  যেমন- পুতুল, ফুলদানি, মুখোশ।

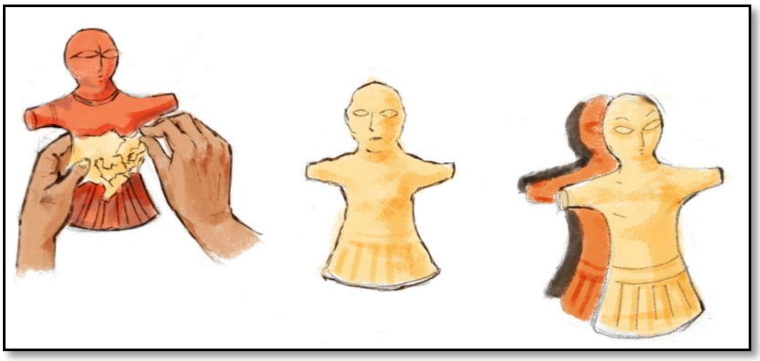

মণ্ড দিয়ে তৈরিকৃত সোপিচ ও মুখোশ

মাটি ও পাট দিয়ে বিভিন্ন মডেল তৈরি

মাটি হলো শিশুর সহজ প্রাপ্য জিনিসের মধ্যে একটি। শিশুরা সহজলভ্য জিনিসপত্র নিয়ে সব সময় নাড়াচাড়া করে। হাতের কাছে প্রাপ্ত সামগ্রী দিয়ে যখন যা খুশি বানাতে চায় এবং সে সব নিয়েই প্রায়শ ব্যস্ত থাকে। সহজ প্রাপ্য সামগ্রীর মধ্যে মাটি একটি বিশেষ উপাদান যা শিশুদের অত্যন্ত প্রিয় বস্তু। সাধারণত এঁটেল মাটি হলো কোন জিনিস তৈরি করার জন্য উপযোগী।

মাটি তৈরীর নিয়ম

মাটি দিয়ে কোন কিছু তৈরির পূর্বে মাটির ধরন এবং ব্যবহার উপযোগী করা সম্পর্কে অবহিত হওয়া প্রয়োজন। সাধারণত এঁটেল মাটি হলো কোন জিনিস তৈরি করার জন্য উপযোগী। শুকনো এঁটেল মাটি গুড়ো করে ছাঁকনি দিয়ে ছেঁকে পরিমাণ মত পানি মিশিয়ে কাজের উপযোগী করে নিতে হয়। সবচেয়ে ভাল হয় প্রকৃতি প্রাপ্ত এঁটেল মাটি পাওয়া গেলে। এঁটেল মাটি যদি বেশি ভেজা হয় তবে শুকনা চট দিয়ে ঢেকে যখন শক্ত কাদাতে পরিণত হয় তখন মাটি কাজের উপযোগী করার জন্য বার বার পিষে নিতে হয়। মাটি পিষে নেয়ার পর মাটি এমন একটা রূপ ধারণ করে যখন মাটিতে হাত দিলে মাটি হাতে লাগে না তখনই বুঝতে হবে মাটি কাজের জন্য উপযোগী হয়েছে। তাছাড়া মাটির সাথে যদি ইটের টুকরা বা শক্ত কোন ধরনের বস্তু বা জিনিস থাকে সেগুলো আলাদা করে নিতে হবে। তা না হলে তৈরিকৃত মডেল বা জিনিস ফেটে যেতে পারে।

মডেল তৈরি

মাটি দিয়ে কাজ করার সময় শিক্ষক মনে রাখবেন শিশু শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণি উপযোগী বিষয়বস্তুই যেন তাদের প্রতিপাদ্য বিষয় হয়। অর্থাৎ নিকট পরিবেশে পাওয়া যায় বা অতিপরিচিত বিষয়বস্তু যেমন–আম, পেঁপে, তাল, বেগুন, কলা, গাস, কাপ-পিরিচ, ফুলদানি, বাটি ইত্যাদি। শিশুর উপযোগী বিষয়বস্তু নিয়ে কাজ করার সময় ঐ বিষয় সম্পর্কে

কতটুকু ধারণা আছে তা জানার জন্য বোর্ডে ড্রইং করে শিক্ষক শিক্ষার্থীর বিষয়ের গঠন সম্পর্কে ধারণা দিতে পারেন। তারপর প্রয়োজনে প্রশিক্ষক স্তরভিত্তিক এঁকে দেখাবেন (প্রয়োজনে মডেল দেখাতে পারেন)। এরপর শিক্ষার্থীরা তৈরি করবেন। মাটি দিয়ে কোন কিছু তৈরি করার সময় মনে রাখতে হবে যে, মাটি

পেস্ট করার সময় অর্থাৎ মাটির উপর মাটি লাগানোর সময় যেন মাটির ভিতর বাতাস না থাকে। মাটির ভিতর বাতাস থাকলে মাটির তৈরি জিনিস ফেটে যেতে পারে। মাটির তৈরি মডেল প্রাথমিক অবস্থায় ছায়াতে শুকিয়ে নিয়ে পরে রোদে শুকালে ফেটে যাওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে। তৈরিকৃত মডেল সাধারণত পোড়ানো হয় না তাই সংরক্ষণের জন্য শুষ্ক জায়গায় রাখাই শ্রেয়।

মাটি দিয়ে তৈরিকৃত বিভিন্ন মডেলের ছবি

মাটির মডেলে রং করার নিয়ম

মাটির তৈরি মডেলে রং করার পূর্বে তৈরিকৃত মডেলগুলো ভালভাবে শুকিয়ে নিতে হয়। শুকানোর পর রং করার পূর্বে সাদা চক পাউডার পানিতে গুলে রং করার পর মডেলের ধরন অনুযায়ী রং করতে হবে। এসব কাজে কম দামি রং ব্যবহার করা যায়। গুঁড়া রং পানিতে ঘন করে গুলে তুলি বা কাপড় দিয়ে রং এর প্রলেপ দিতে হবে। কোন কোন সময় বার্নিশ ব্যবহার করা যায়। তবে বার্নিশ রং ব্যবহারের সময় হাতে লাগার সম্ভাবনা থাকে। তাই কেরোসিন তেল বা তারপিন দিয়ে হাতে লেগে থাকা বার্ণিশ তুলতে হয়। প্রকৃতি থেকে প্রাপ্ত রং মাটির তৈরি জিনিসে লাগানো যায়। যেমন- চুন, হলুদ, মরিচের গুঁড়া, খয়ের, পুঁই এর ফল, সিম পাতার রস, কাঁটা মান্দার ফুল, শিউলী ফুল, পাকা ছিটকীর গোটা ইত্যাদি। এছাড়া কৃত্রিম রংও ব্যবহার করা যেতে পারে।

মাটির কাজের টুল্‌স

পাট দিয়ে পুতুল তৈরি

পাট সোনালি আঁশ হিসেবে পৃথিবীতে পরিচিত। পাট দৈনন্দিন কাজে যেমন ব্যবহার করা হয় তেমন সৌখিন জিনিস, খেলনা, ঘর বাড়ি সাজানোর উপযোগী অনেক কিছুতেও ব্যবহার করা হয়। গ্রামীণ জীবনে শুধু নয় শহর জীবনেও পাটের ব্যবহার যথেষ্ট পরিমাণে। বাংলাদেশের প্রায় সব জেলাতে কম বেশি পাট উৎপাদন হয়। তাই শিশুদেরকে পাটের যথাযথ ব্যবহার কৌশল আয়ত্ত করা প্রয়োজন। পাটের তৈরি পুতুল সকলের কাছে খুবই প্রিয়। শিশুরা পাট দিয়ে পুতুল তৈরি করে অনেক আনন্দ পায়।

পাট দিয়ে পুতুল তৈরি

পুতুল তৈরীর প্রক্রিয়া

প্রথমে ফোলা ফোলা অবস্থায় মোটামুটি ৪ সেমি. ব্যাসের এক গোছা পাট নিন। চিরুনি দিয়ে পাটের গোছাটি আঁচড়িয়ে সমান ও মসৃণ করুন। গোছের সবচেয়ে মসৃণ অংশটুকু বেছে নিয়ে এমনভাবে কাটুন যাতে ৩৮ সেমি. লম্বা থাকে। পাটের আঁশ যাতে এলোমেলো না হয় সেভাবে রাখুন। এবার সামান্য পাট হাতে নিয়ে হাতের তালুর সাহায্যে বলের মত করুন এবং পাটের আঁশ দিয়ে পেঁচিয়ে বলটি শক্ত করে বাঁধুন। বলটির ব্যাস যেন আড়াই সেমিঃ এর মত হয়। আঁচড়ানো পাটের গোছা হাতে নিন এবং ঠিক মাঝখানে সূতা দিয়ে কয়েকটি প্যাঁচ দিয়ে শক্ত করে বাঁধুন। পাটের গোছাটি বাঁধার সময় নিচের অংশ হাতের মুঠোয় ধরে উপরের অংশের আঁশগুলোর চারিদিকে সমানভাবে ছড়িয়ে দিন। ছড়ানো আঁশের ঠিক মাঝখানে পাটের বলটি রেখে আঁশগুলো আবার একত্র করে বলের গা ঘেঁসে বেঁধে দিন। এবার এই অংশ বা হাতের মুঠোয় নিয়ে অপর অংশের আঁশগুলো চারিদিকে ছড়িয়ে দিয়ে বলের উপর নিচের দিকে ঘুরিয়ে আনুন। খেয়াল রাখবেন বলের চারিদিকে পাটের আঁশ যেন সমানভাবে টান ও মসৃণ হয়ে বসে। এবার বলের ঠিক নিচে রঙিন সূতা পেঁচিয়ে দিন। ১ সেমি. মত জায়গা পেঁচানো হলে শক্ত করে বেঁধে দিন।

সূতা বাঁধার পর নিচের খোলা পাটের গোছার দুদিক থেকে কিছু কিছু আঁশ নিয়ে সরু দুটি বেণী পাকিয়ে দিন। এক একটি বেণী ৬ সেমি. করে লম্বা হলে বেণীর নিচে রঙিন সূতা পেঁচিয়ে বাঁধুন। এই বাঁধনের নিচে ১ সেমি. পরিমাণ পাট রেখে বাড়তি অংশ কেটে ফেলুন। এই দুটি বেণী হবে পুতুলের হাত। এখন বাকি পাটের যে মোটা গোছা থাকলো তা নিচের দিকে সমান করে কেটে দিন। দেখবেন পুতুলের আদল এসে গেছে। মাথার উপরের কাজের জন্য আলাদা কিছু পাট নিয়ে বেণী করে মাথার উপর ঠিক মাঝখানটায় সুই-সূতা দিয়ে সেলাই করে আটকিয়ে দিন। বেণী যেন মাথার দুপাশে সমানভাবে ঝুলে থাকে। পুতুলে চোখ ও মুখ রঙিন সুতা দিয়ে সেলাই করে দিন। দেখবেন একটি সুন্দর পুতুল হয়ে গেছে।

পাটের রশি দিয়ে টেবিল ম্যাট তৈরী

আট-দশ হাত লম্বা একগাছি সরু পাটের রশি নিন। রশির ব্যাস মোটামুটিভাবে ৪ মিলিমিটার হলে ভাল হয়। পাটের রশি এক মাথা ধরে ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে ছোট একটি চাকতি করে সুই-সূতা দিয়ে সেলাই করে দিন। এমনভাবে সেলাই করবেন যাতে সূতা চাকতির উপর বা নিচের দিক থেকে দেখা না যায়। এভাবে ক্রমাগত পেঁচিয়ে ও সেলাই করে ১৫

সেমি. পাটের রশি দিয়ে টেবিল ম্যাট তৈরি ব্যাসের একটি চাকতি তৈরি করুন। চাকতির চারপাশে নক্‌শা করার জন্য ক্রমাগত দড়িতে ভাঁজ/ঢেউ তুলে সেলাই করুন। এভাবে চারিপাশে ঢেউ তোলা শেষ হলে দড়ির শেষের মাথাটি এমনভাবে সেলাই করে দিন যাতে পাটের আঁশ বের হতে না পারে।

খেজুর পাতা, নারিকেল পাতা ও ডিমের খোসা দিয়ে শিল্পকর্ম তৈরি

খেজুর পাতা, নারিকেল পাতাও ডিমের খোসা কারুশিল্পে একটি বিশেষ স্থান দখল করে আছে। এ বিষয়গুলো কারুশিল্পেই শুধু নয় সনাতন শিল্পের ঐতিহ্য বহনকারী একটি মাধ্যম। এসব সামগ্রী দিয়ে তৈরিকৃত শিল্পের সাথে আমরা সকলেই পরিচিত। সনাতন শিল্পের ঐতিহ্য টিকিয়ে রাখতে এ সবের গুরুত্ব অপরিসীম।

নারিকেল পাতা দিয়ে খেলনা ঘড়ি ও চশমা তৈরির পদ্ধতি

আমাদের দেশের প্রায় সর্বত্রই নারিকেল গাছের ডগার নিচের দিকের পাতা সাধারণত একটু মোটা ও পুরু থাকে। ঐ পাতা ডগা থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে মাঝখানের শলাটি আলাদা করে পাতাটিকে দুটি ভাগে ভাগ করে নিতে হবে। পরে ঐ পাতার গোড়ার দিকের ও আগার দিকের কিছু অংশ কেটে কাজের সাইজ অনুযায়ী করে নিন। চিত্রের মত পাতার কিছু অংশ কেটে ভাঁজ করে বড় লম্বা অংশের সাথে সংযোগ করে দিন। সংযোগ স্থলে পাতার বড় অংশ ভাঁজ করে দ্বিতীয় অংশের ভিতরে ঢুকিয়ে চাপ দিয়ে ভাঁজ করে দিন। দেখবেন ঘড়ির মত হয়ে গেছে। প্রয়োজন মত পাতা রেখে বাকি অংশ কেটে ফেলুন। সাধারণত তৃতীয় শ্রেণি থেকে শিক্ষার্থীরা এ ধরনের কাজে অভ্যস্ত হয়। নারিকেল পাতা দিয়ে চশমা তৈরিও একটি মজার বিষয়। ঘড়ি তৈরিতে যারা অভ্যস্ত তারা অতি সহজেই চশমা তৈরি করতে পারবে। ঘড়ি তৈরি করে হাতের কব্জিতে লাগানোর জন্য পাতার লম্বা অংশটুকু উল্টা দিকে ঘুরিয়ে দিলে চশমার মত দুটি গোলাকার রূপ নেবে। পরে গোলাকৃতির দু'পাশে দুটি নারিকেল পাতার শলা কাগজে পিন লাগানোর মত ছিদ্র করে ঢুকিয়ে দিলেই চশমা তৈরি হয়ে যাবে।

খেজুর পাতা দিয়ে পাটি তৈরির পদ্ধতি

খেজুর গাছ বাংলাদেশের প্রায় সব জায়গায় পাওয়া যায়। যশোর এবং ফরিদপুর জেলায় খেজুর গাছ বেশি জন্মে। যশোর ও ফরিদপুর জেলার লোকেরা খেজুর পাতা দিয়ে পাটি ও মাদুর তৈরি করে থাকে। এ মাধ্যমে কাজ করলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে কেউ কেউ অর্থ উপার্জন করতে সক্ষম হবে। প্রথমে অল্প কয়টি পাতা দিয়ে নিম্নের পদ্ধতি অনুযায়ী বুনন শুরু করুন। যেহেতু পাতার দৈর্ঘ্য কম সেহেতু এক ধারা পদ্ধতিতে বুনন ভাল। বুনন শুরু করার পর মাঝখানের চিকন ডাঁটাটা ছাড়িয়ে পাতাগুলো দুভাগে ভাগ করে নিন। এবার একটি পাতা উপরে এবং একটি পাতা নীচে দিয়ে পর্যায়ক্রমে পাতা জোড়া দিয়ে বুনতে থাকুন। এভাবে একটি বোনা হলে একটির সাথে আর একটি জোড়া দিয়ে পাটি তৈরি করে ফেলুন।

ডিমের খোসা দিয়ে পুতুল তৈরির পদ্ধতি

একটি ডিম পরিষ্কার করে ধুয়ে নিন। পুতুল বানানোর জন্য হাঁসের ডিম হলে ভাল হয় কারণ হাঁসের ডিমের খোলস তুলনামূলক শক্ত। ডিমের সরু মাথার দিকে খুব সাবধানে একটি ছিদ্র করে ভিতরের কুসুম ও লালা বের করে আনুন। পরে পানি ঢুকিয়ে ভিতরটা ভাল করে ধুয়ে শুকিয়ে নিন। এবার এক খন্ড শক্ত কাগজ দিয়ে ২৫/৩০ সেমি. ব্যাসের বৃত্ত আঁকুন। বৃত্তের রেখা বরাবরে কাঁচি দিয়ে কেটে একটি চাকতি তৈরি করুন। চাকতিটি সমান তিন ভাগে ভাগ করে এক খন্ড কেটে নিয়ে চোখা মাথাটা সামান্য কেটে ফেলে সোজা দুই কিনারা একটির উপর একটি তুলে আঠা দিয়ে জোড়া দিন। কাগজটি একটি চোঙার মত হবে। চোখা মাথাটি ডিমের খোলশের ভিতরে ঢুকিয়ে পাতলা কাগজ দিয়ে চোঙের সাথে ডিমটি আঠা দিয়ে লাগিয়ে দিন। ডিমটি যেন চোঙের মাথায় সোজা বসে থাকে। এবার ডিমের খোলশের উপর পুতুলের চোখ, মুখ, নাক, কান, চুল এঁকে দিন।

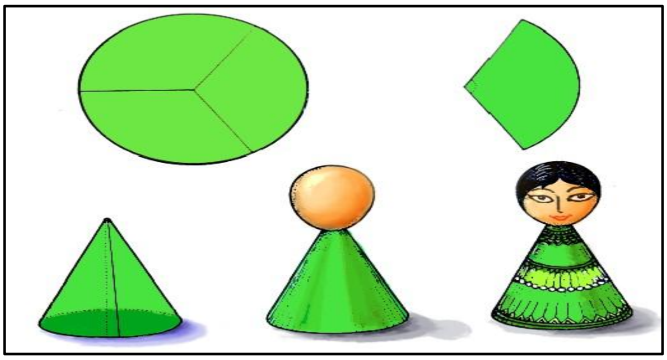

বোর্ড কাগজের চোঙের উপর পুতুলের গলায় মালা ও পোশাক এঁকে অথবা আলাদা কাপড় দিয়ে পোশাক তৈরি করে পরিয়ে দিন। আবার ডিমের খোসাতে পোশাক লাগিয়ে হস্তচালিত পাপেট তৈরি করা যায়। মা, বাবা, ভাইবোন এর পোশাক লাগিয়ে পরিবার তৈরি করা যায়।

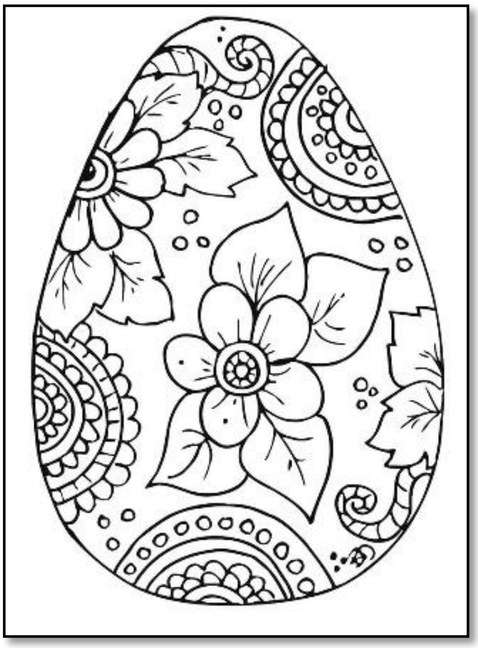

ডিমের খোসায় অংকিত শিল্পকর্ম

অধ্যায়-চার

- আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে ছবি আঁকা
- চারুও কারুকলা বিষয়ে শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা
- পাঠ পরিকল্পনা
- সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে ছবি আঁকা

ICT বা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ধারণা

ICT হচ্ছে Information and communication technology-এর সংক্ষিপ্ত রূপ (Acronym) বাংলায় যা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নামে পরিচিত। এককভাবে ICT এর সর্বজনস্বীকৃত কোন সংজ্ঞা দেয়া কঠিন। কেননা বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন ভাবে ICT এর প্রয়োগ ঘটছে।

তথ্যের (Information) তৈরি, প্রবাহ, সংরক্ষণ, বিনিময়, যোগাযোগ, পুনরুদ্ধার ইত্যাদির জন্য যে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয়ে আসছে তাই ICT যোগাযোগ আমাদের খুব পরিচিত একটি শব্দ, আর প্রযুক্তির অনেক উদাহরণ আমাদের চার পাশে ছড়িয়ে আছে। আমরা যখন "তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি" কথাটা বলি তখন আমরা কিন্তু বিশেষ একটা কিছু বোঝাই। মোটকথা বিজ্ঞানের তথ্যের উপর নির্ভর করে তৈরি করা নানা রকম যন্ত্রপাতি আর কলাকৌশল ব্যবহার করে যখন মানুষের জীবনটাকে সহজ করে দেয়া হয় সেটাই হচ্ছে প্রযুক্তি।

ICT এর মাধ্যম

ICT-এর সুফল পৌঁছে দেয়ার জন্য বিভিন্ন ধরনের মাধ্যম (ICT Media) ব্যবহার করা হয়ে থাকে। খুব পরিচিত মাধ্যমগুলো হচ্ছে -

- Radio
- Television
- Video
- Cassette / Tape

- CD / DVD
- Telephone
- Computer
- Hardware and Software
- Multimedia Projector
- Internet
- Setellite System etc.

তবে এগুলোর মধ্যে বর্তমানে কম্পিউটার এবং এর হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার-ই শিক্ষাক্ষেত্রে বেশি ব্যবহৃত হচ্ছে।

শিক্ষাক্ষেত্রে ICT (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি)

মানুষ শিখতে শুরু করে তার পরিবার থেকে, পরিবেশ থেকে। শিশুরা অনুকরণ, অনুসরণ করে প্রথম শিখতে শুরু করে। আবার বাবা মার সাথে ভাব বিনিময় করে নানান আকার ইংগিতের মাধ্যমে। যোগাযোগের শুরু ও বলা যায় এখান থেকেই, পরবর্তীতে শিশুরা কথা বলতে শেখে, ভাবের আদান প্রদান করে, তথ্য বিনিময় করে। এরপর স্কুলে ভর্তি হয়; শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক, সহপাঠিদের সাথে মিলে নানান বিষয়ে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জন করতে থাকে। তাহলে দেখা যাচ্ছে, মানুষের শিক্ষা অর্জনের মূলে রয়েছে অভিজ্ঞতা অর্জন এবং তথ্যের আদান প্রদান। তাই এই তথ্য আদান প্রদানের প্রক্রিয়াকে যত আকর্ষণীয় ও কার্যকরভাবে উপস্থাপন করা যাবে। শিক্ষা অর্জনও তত সহজ হয়ে উঠবে। এই তথ্য আদান প্রদান বা যোগাযোগকে আকর্ষণীয় কার্যকর করতে ব্যবহৃত হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের ডিজিটাল প্রযুক্তি। তাই শিক্ষাক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার খুবই কার্যকরভাবে করা সম্ভব|
ছবি আঁকার কথাই ধরা যাক, শিশুরা মনের ভাব প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে ছবি আঁকা শুরু করে সহজাত প্রবৃত্তিতে ২/৩ বছর বয়স থেকেই। রঙ তুলি বা পেন্সিল জাতীয় উপকরণের মাধ্যমে শিশুরা মূলতঃ প্রকাশ ঘটায় তার চিন্তা চেতনাকে। দিন দিনই এসব সামগ্রীর ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় অনেক অভিভাবক সেগুলোর সংস্থান দিতে পারেন না। কিন্তু প্রযুক্তি শিশুদের এ কাজে অনেক সহায়ক ভূমিকা রাখবে। কারণ আগামীতে বিদ্যালয়গুলোতে ডিজিটাল প্রযুক্তি শিশুদের দোরগোড়ায় আসছে। অনেক ধরনের এপ্লিকেশন সফটওয়্যার এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা ছবি আঁকা, নক্সা, ইলাস্ট্রেশন ইত্যাদি কাজে বৈচিত্রপূর্ণ ও আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতা তৈরি করবে। তা ছাড়া পরিমার্জিত প্রাথমিক শিক্ষা কারিকুলামে, চারু ও কারুকলা বিষয়ে একটি অর্জন উপযোগী যোগ্যতা (চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণি) সংযোগ হয়েছে ‘আধুনিক প্রযুক্তিতে ছবি আঁকা’। তাই ডিপিএড প্রশিক্ষণে শিক্ষকদের এ বিষয়ে সম্যক ধারণা এবং বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণের অংশ হিসেবে যুক্ত হয়েছে।

কম্পিউটার সহায়ক শিখন

এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা সরাসরি ICT ব্যবহারের মাধ্যমে একা একা কিম্বা দলীয়ভাবে শিখতে থাকবে। কম্পিউটার, মাল্টিমিডিয়া কনটেন্ট ব্যবহার করে তাদের গতানুগতিক শিখন পদ্ধতির বাইরে নতুন ধারণা অর্জনের মাধ্যমে নতুন বিষয় শিখতে থাকবে। এ পদ্ধতিতে শ্রেণিকক্ষে, শ্রেণিকক্ষের বাইরে, কম্পিউটার ল্যাবে বাড়িতে কিম্বা যে কোন স্থানে শেখার সুযোগ থাকছে। পেশাগত শিক্ষায় ICT বিষয়ক প্রাথমিক ধারণা এবং প্রয়োগ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ থাকায় এখানে সংক্ষিপ্ত আকারে ড্রইং টুলবার ও বিভিন্ন ড্রইং এবং আর্ট এর বিভিন্ন সফটওয়্যার নিয়েই আলোচনা হয়েছে।

ড্রইং টুলবার

পাওয়ার পয়েন্টের উইন্ডোতে সব সময় ড্রইং টুলবারটি সেট করা থাকে। উইন্ডোর নিচের দিকে এ টুলবারটি অবস্থান করে। এটির বিভিন্ন টুল ব্যবহার করে স্লাইডে ড্রইং করা যায়। অফিস-৭ এ সংযুক্ত ড্রইং অবজেক্টটি ব্যবহার করে পাওয়ার পয়েন্টের স্লাইডে সুন্দর সুন্দর ড্রইং ও নক্সা করা যায়। এটি ব্যবহার করে এমন কিছু ড্রইং করা যায় যা কেবলমাত্র অন্যান্য প্রসিদ্ধ সফটওয়্যার দ্বারাই করা সম্ভব ছিল। সাধারণ যে কোন ড্রইং কেথ্রীডাইমেনশনাল (3-D) এফেক্ট, বিভিন্ন ধরনের রঙের ব্যবহার, লাইটিং, শেড, বাহারি ধরনের টেক্সচারের ব্যবহার করে অতি সুন্দরতম ড্রইং-এ রূপদান করা যায়। স্লাইডে ড্রইং করার জন্য পর্দায় ড্রইং টুলবার সচল করে বিভিন্ন টুল ব্যবহার করতে হয়।

Drawing টুলবারটি যদি পর্দায় না থাকে তা হলে সেটা আনার জন্য–

ধাপ-ক: নতুন ফোল্ডার ও নতুন পাওয়ার পয়েন্ট ফাইল খোলার নিয়ম:

- কম্পিউটার সঠিক নিয়মে Open করুন
- কম্পিউটারের Desktop-এ খালি জায়গায় রাইট মাউস ক্লিক করুন
- New থেকে Folder এ ক্লিক করুন। Desktop এ New Folder নামে একটি নতুন ফোল্ডার আসবে
- কী-বোর্ডে নিজের নাম অথবা যে নাম দিতে ইচ্ছুক তা টাইপ করে ফোল্ডারটি Rename

করুন Double Click ক্লিক করে ফোল্ডারের ভিতরে ঢুকুন

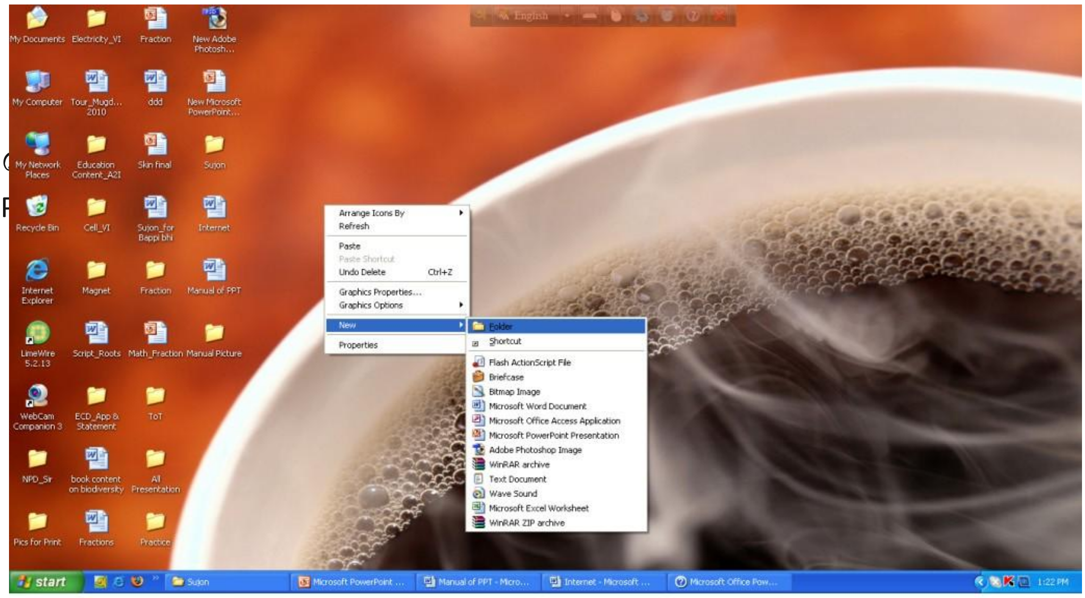

- (

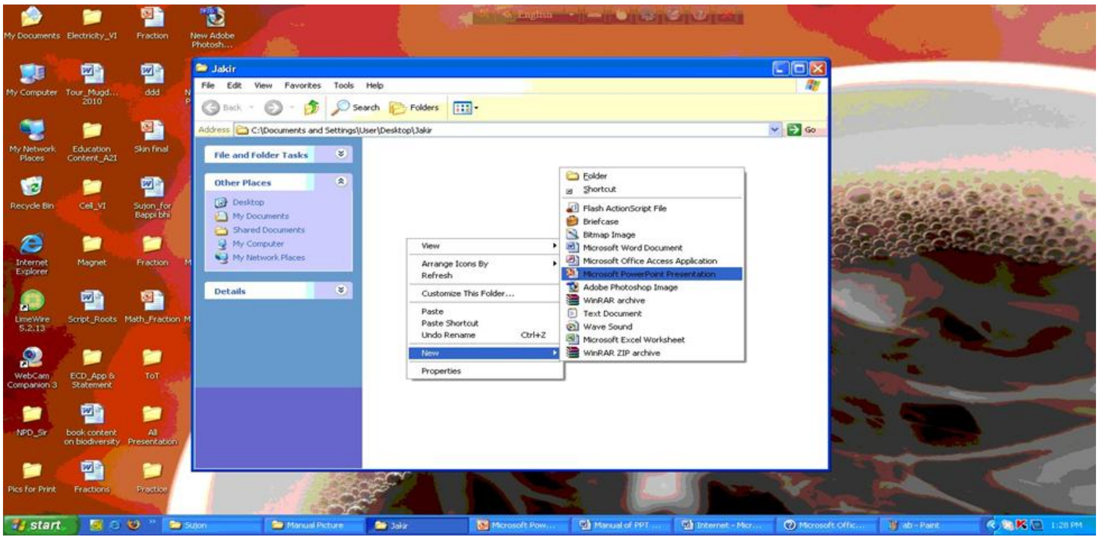

- সেটিকে Rename করে একটি নির্দিষ্ট নাম যেমন: Project-১ নাম দিন। ফাইলটি Double Click করে ভিতরে ঢুকুন
- নির্দিষ্ট ফোল্ডারে নতুন একটি পাওয়ার পয়েন্ট ফাইল খুলুন। নাম দিন-প্রজেক্ট ১

  Office Button Quick Access Toolbar Ribbon Command Group Titlebar

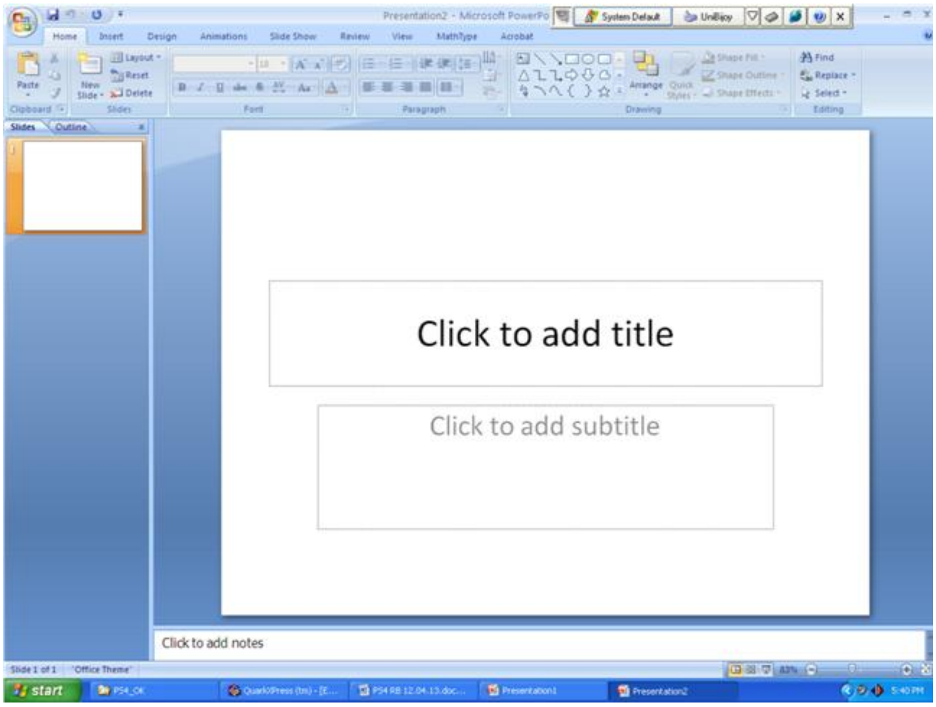

Outline and Slide View Working Window Status bar View Button

- Slides কমান্ড গ্রুপ থেকে Lay out Blank নির্বাচন করুন।
- Home menu তে ক্লিক করে Toolbars এ ক্লিক করুন।
- Drawing এ ক্লিক করুন; পর্দায় Drawing Toolbarটি প্রদর্শিত হবে।
    - Drawing কমান্ডগ্রুপ থেকে ইচ্ছেমত Line, Arrow, Rectangle, Oval প্রভৃতি Shape নির্বাচন করে স্লাইডে আঁকুন। কী-বোর্ডের Shift চেপে ধরে আঁকলে Shape টির আনুপাতিক হার ঠিক থাকবে।

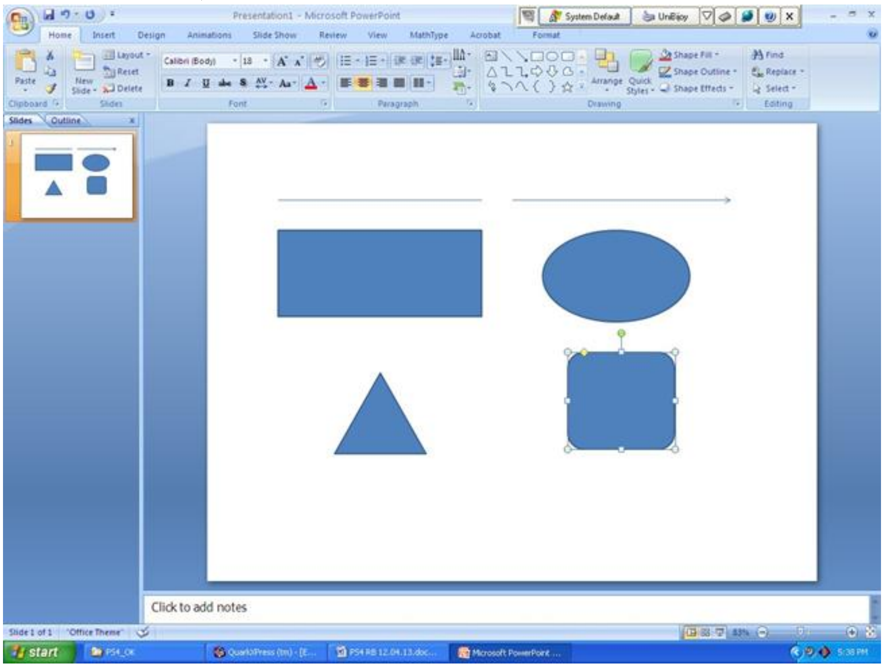

- নির্দিষ্ট ফোল্ডারে নতুন একটি পাওয়ার পয়েন্ট ফাইল খুলুন। নাম দিন Project-3
- Slides কমান্ডগ্রুপ থেকে Layout Blank নির্বাচন করুন।

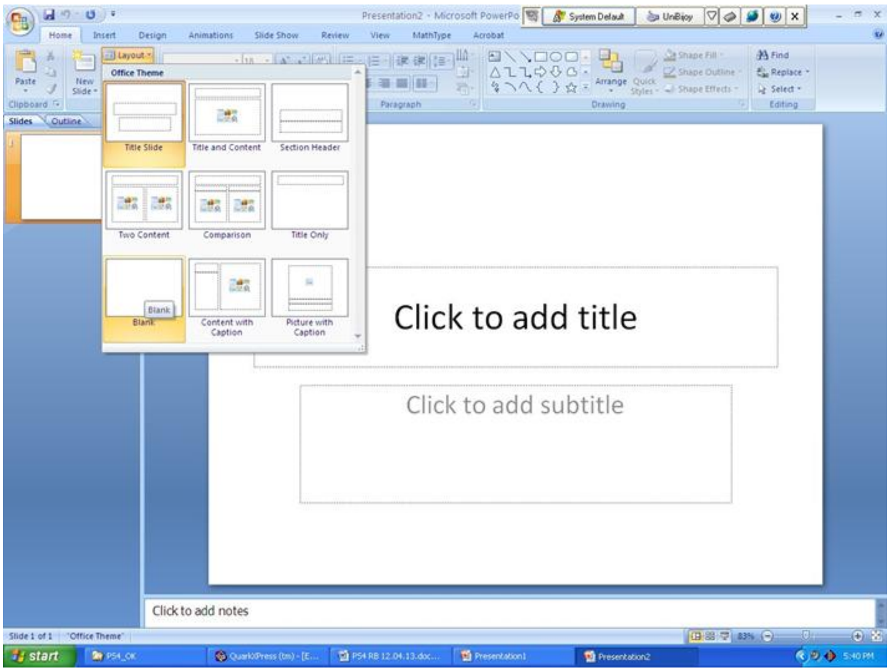

- Drawing কমান্ড গ্রুপ থেকে ইচ্ছামত Line, Arrow, Rectangle, Oval প্রভৃতি নির্বাচন করে স্লাইডে আঁকুন। কী বোর্ডের Shiftচেপে ধরে আঁকলে Shape টিতে আনুপাতিক হার ঠিক থাকবে।
- প্রাকৃতিক ছবি আঁকার জন্য Shapefill যেয়ে Curve Line সিলেক্ট কওে LeftKey চেপে ইচ্ছেমত গাছে, ঘরে, নদীর আঁকা বাঁকা লাইন করা যাবে।

Paint Software ব্যবহার করে ছবি আঁকা

- সব কম্পিউটার/লেপটপে PaintSoftware ইনস্টল করা থাকে না। Start All Programme-এ ক্লিক করে দেখে নিতে হবে। না থাকলে Paint Software টি ইনস্টল করে নিতে হবে।
- Start বাটনে ক্লিক করে Paint Double Click করে উইন্ডোটি ওপেন করুন।
- Title bar-এ Home রিবনটি সিলেক্ট করুন।
- Toolbar-G Pencil, Fill with Color, Text, Color picker-যে কোনটিতে ক্লিক করে সাদা Surface এ ইচ্ছেমত ড্রইং করা যায়। form- এ Color করতে যেয়ে Fill Color এ ক্লিক করে ইচ্ছে অনুসারে Color বারে যেয়ে রঙ করা যায়।
- যে কোন অপ্রয়োজনীয় লাইন/Color এসে গেলে ইরেজার এ ক্লিক করে নিয়ে মুছে ফেলা যায় বা Undo তে যেয়ে পূর্বের কাঙ্ক্ষিত অবস্থায় আসা যায়।
- ছবি আঁকা শেষ হলে Save করুন।
- ছবিটি স্লাইডে নিতে গেলে কপি করে Save বাটনে ক্লিক করলে উইন্ডোটি আসলে ডেস্কটপে যে ফোল্ডার

(Power Point Presentation) এর স্লাইডে নিতে চান, তাতে ক্লিক করে Save বাটনে ক্লিক করে Save করুন।

Shape রংকরুন

- কোনো Shape রং করতে চাইলে তার উপর ডাবল ক্লিক করুন। এতে Format রিবনটি নির্বাচিত হবে এবং Format রিবনের বিভিন্ন কমান্ডগ্রুপ সমূহ স্ক্রিনে আসবে (ছবি দেখুন)

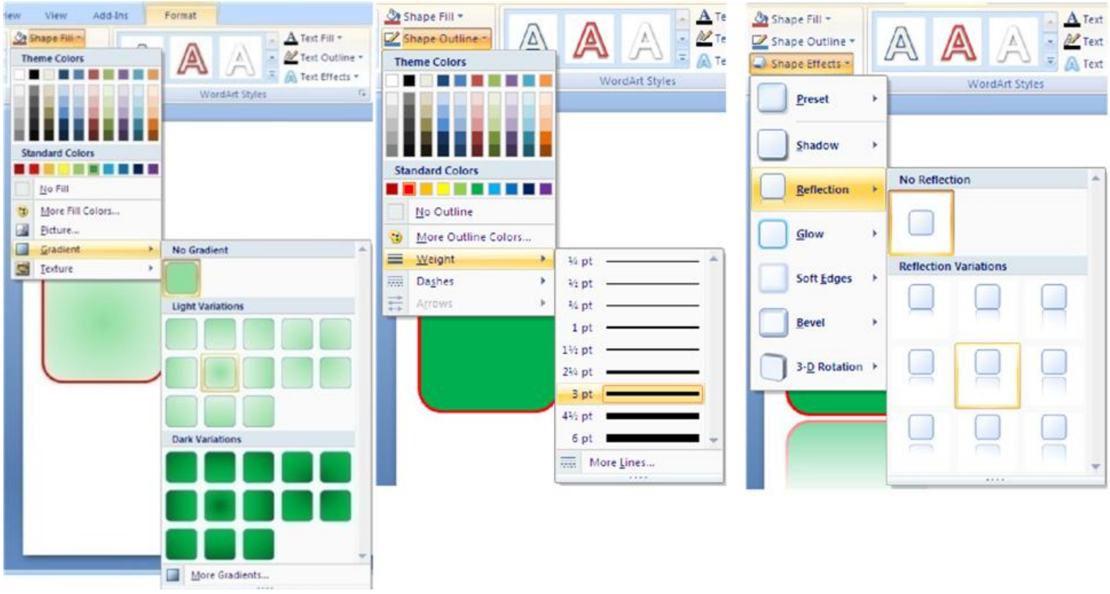

- Shape Fill থেকে পছন্দমত রং নির্বাচন করুন। এছাড়া বিভিন্ন Gradient নির্বাচন করতে পারেন
- Shape Outline এ গিয়ে পছন্দমত আউটলাইন রং নির্বাচন করুন। এছাড়া lineএর Weight বাড়াতে বা কমাতে পারেন।
- Shape Effect থেকে বিভিন্ন ইফেক্ট Shadow, 3-D, Glow প্রভৃতি যুক্ত করতে পারেন।

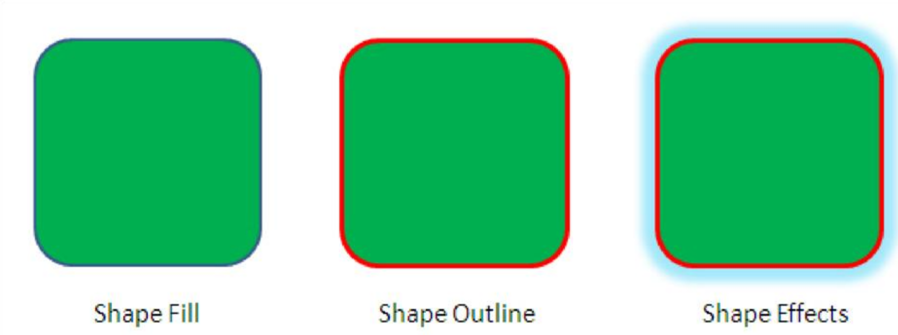

- Shape-resize করুন: যে shape টি resize করতে চান সেটি মাউস দিয়ে ক্লিক করুন। Shape টি সিলেক্ট অবস্থায় দেখাবে। যে কোন কোনা ধরে মাউস দিয়ে টেনে দেখুন, shape টির আকার পরিবর্তন হবে।

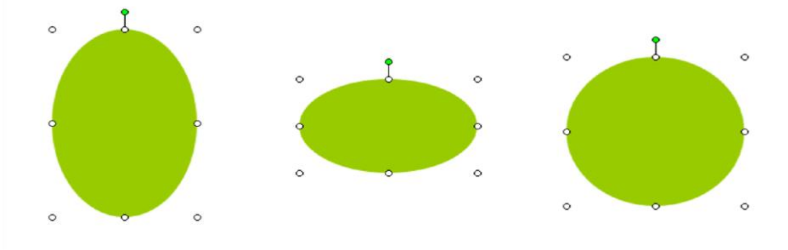

[Shift চেপে shape টি কোনাকুনি ধরে টানুন। এতে shape টি আনুপাতিক হারে বড় বা ছোট হবে

স্লাইডে বিভিন্ন ধরনের Shapes যুক্ত করা

এমএস পাওয়ারপয়েন্টে Default আকারে নানা ধরনের shape ও style তৈরি করা আছে। সেখান থেকে পছন্দমতো shape নিয়ে কাজ করতে পারেন।

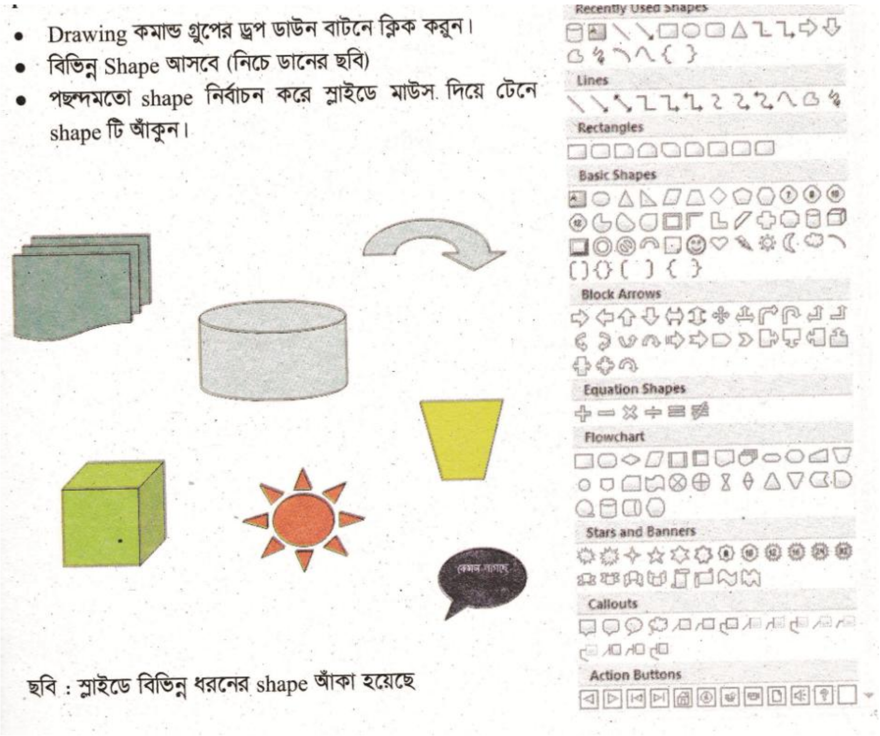

Shape এনিমেশন

Text, ছবি, Shapes প্রভৃতি একই উপায়ে এনিমেশন করা যায়। Project-2 এর এনিমেশন পর্বটি লক্ষ করুন। Line বা Arrowচিহ্ন ব্যবহার করে কোন বিষয়কে চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে নিচের উপায়টি লক্ষ করুন

- Drawing কমান্ড গ্রুপ থেকে Arrow shape টি নির্বাচন করে স্লাইডে একটি তীর চিহ্ন আঁকুন
- তীর চিহ্নটি সিলেক্ট অবস্থায় থাকবে। না থাকলে তার উপর ক্লিক করুন। এটিতে effect যুক্ত করা হবে
- Drawing কমান্ড গ্রুপ থেকে Custom Animation নির্বাচন করুন। ডানপাশে একটি বক্স আসবে

add effect ⟶ Entrance ⟶ Wipe wbe©vPb

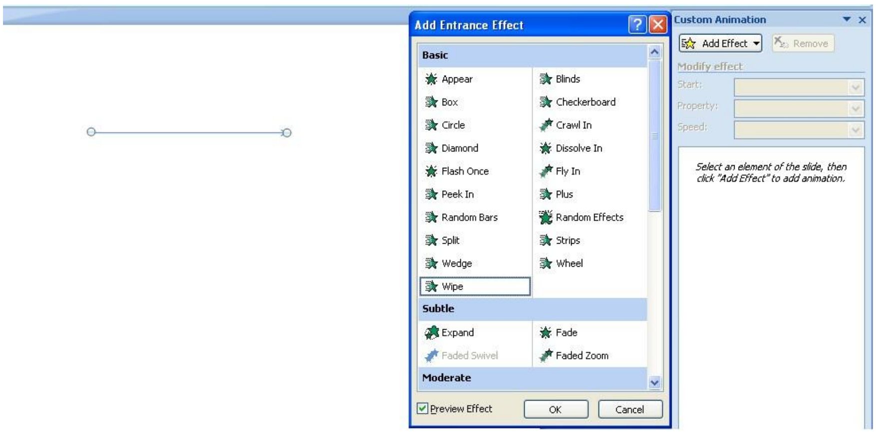

চারু ও কারুকলা বিষয়ে শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা ও পাঠ পরিকল্পনা

ভূমিকা

প্রতিটি শিশুই নিজের পরিবেশে প্রকৃতির আলো, বাতাস, রূপ, রস ও গন্ধ ইত্যাদির মধ্যে বেড়ে ওঠে। ধীরে ধীরে সে তার চারপাশের জগৎ ও বস্তুর সঙ্গে পরিচিত হয় এবং বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি তার অনুরাগ জন্মায়। এই অনুরাগ থেকেই সে সহজ ও স্বাভাবিকভাবে তার পরিবেশের মানুষ, পশু-পাখি, গাছ-পালা, নদী-নালা ইত্যাদিসহ প্রকৃতির সৌন্দর্যের সমারোহ উপভোগ করে। এভাবে শিশু কল্পনা করতে ভালবাসে, স্বপ্ন দেখতে ভালবাসে। তার মধ্যে ধীরে ধীরে সৃজনশীলতা এমনভাবে তৈরি হতে থাকে যে তার হাতের কাছে যা পায় তাই দিয়ে সে আঁচড় কাটে, বিভিন্ন জিনিস নেড়ে চেড়ে দেখে, কখনো কখনো ভাঙচুর করে; এইভাবে বস্তুর যে বিভিন্ন রূপ তার সামনে উন্মোচিত হয় তা দেখে সে সৃষ্টির আনন্দে নেচে ওঠে।

এ শিশুদেরকে আমরা সুনাগরিক হিসেবে এবং পরিশীলিত মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে চাই। এ লক্ষ্য নিয়ে শিশুকে সৃজনশীল ও সুশিক্ষিত করে গড়ে তোলার জন্য বেশ কিছু বিষয়ের উপর আমরা গুরুত্ব দিচ্ছি।

অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে চারু ও কারুকলা বিষয়টি সারা বিশ্বেই শিশু শিক্ষার জন্য একটি পরিকল্পিত ও আবশ্যিক বিষয় হিসেবে স্বীকৃত লাভ করেছে। প্রাথমিক শিক্ষা স্তর থেকেই চারু ও কারুকলা বিষয়টি বাংলা, ইংরেজি, পরিবেশ পরিচিতি সমাজ ও বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষা লাভে সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে। ছবি আঁকা ও অন্যান্য শিল্পকর্ম তৈরি শিশুরা আনন্দের সঙ্গে এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবেই করে। ছোট একটি নির্দিষ্ট মাপের কাগজে, ঘরবাড়ি, গাছপালা, মানুষ, পশু-পাখি আঁকে এবং নিজের ইচ্ছেমত রং দিয়ে সুন্দর করে তোলে। নিজের আঁকা ছবি দেখে সে নিজে যেমন আনন্দ পায় সে সঙ্গে অবচেতনে তার মনের কতগুলো বিষয়ের চর্চাও হয়ে যায়। যেমন সৌন্দর্যবোধ, শৃঙ্খলাবোধ, পরিশীলিত হওয়া বোধ ইত্যাদি। যে সব বস্তুকে নিয়ে সে ছবি আঁকে সেগুলোর প্রতি তার অনুরাগ জন্মায়। এভাবে শিশু প্রকৃতিপ্রেমী এবং প্রকৃতির বস্তু সামগ্রী জীব জন্তু ইত্যাদির প্রতি মমত্ববোধে সমৃদ্ধ হতে থাকে। দেশকে ভালবাসার স্পৃহা ও চিন্তা শিশুকাল থেকেই সে পেয়ে যায়। সৃজনশীল মানুষই দেশকে উন্নতির পথে নিয়ে যেতে পারে।

উচ্চতর পর্যায়ে আমাদের দেশের সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে চারুকলা অনুষদ ও বিভাগ রয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষার বেশ কয়েকটি প্রান্তিকযোগ্যতার উপর গুরুত্ব দিয়ে চারু ও কারুকলার বর্তমান শিখনক্রম তৈরি করা হয়েছে। সেগুলো হলো–

১। শিশুকে তার কল্পনা, কৌতূহল, সৃজনশীলতা বিকাশে আগ্রহী করে তোলা।

২। মানবাধিকার, আন্তর্জাতিকতাবোধ, বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের প্রতি আগ্রহশীল করে তোলা।

৩। স্বাধীন ও মুক্তিচিন্তায় উৎসাহিত করা, গণতান্ত্রিক রীতিনীতি অনুশীলন করা।

৪। ভালমন্দের পার্থক্য অনুধাবন করা।

৫। প্রকৃতি, পরিবেশ ও বিশ্ব জগৎ সম্পর্কে জানা, পরিবেশের উন্নয়ন ও সংরক্ষণে উদ্বুদ্ধ করা।

৬। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধে উদ্দীপ্ত করা, দেশ গড়ার কাজে সক্রিয় হতে উৎসাহিত করা।

৭। জাতীয় ইতিহাস ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে জানা এবং শ্রদ্ধাশীল হওয়া।

৮। সর্বোপরি, বাংলাদেশকে ভালভাবে জানা ও মমত্ববোধে উদ্বুদ্ধ করা।

আবশ্যকীয় শিখনক্রম
বিষয়: চারু ও কারুকলা

বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা	শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা				
	প্রথম শ্রেণি	দ্বিতীয় শ্রেণি	তৃতীয় শ্রেণি	চতুর্থ শ্রেণি	পঞ্চম শ্রেণি
১। ছবি আঁকার প্রাথমিক উপকরণের সাথে পরিচিতি হওয়া।	১.১ ছবি আঁকার কাগজ, পেন্সিল, রঙ, কালার প্যালেট ও তুলির সাথে পরিচিতি।	১.১ ছবি আঁকার কাগজ, পেন্সিল, প্যাস্টেল রঙ, জল রঙ, কালার প্যালেট ও তুলির সাথে পরিচয়।	১.১ ছবি আঁকার কাগজ, পেন্সিল, প্যাস্টেল রঙ, জল রঙ, পোস্টার রঙ এবং বিভিন্ন প্রকার তুলি সম্পর্কে জানতে পারা।	১.১ বিভিন্ন রকম কালি, তুলি, পেন্সিল ও রঙিন কলম, সাইনপেন সম্পর্কে জানা।	১.১ শিশুদের ছবি আঁকার বিভিন্ন রকমের রঙ তুলি, পেন্সিল এবং বিভিন্ন প্রকার পেন্সিলের বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্য জানা । (2B, 3B, 4B, 6B ইত্যাদি।)
২। খেয়াল খুশি মত ছবি আঁকা।	২.১ শিশু তার ইচ্ছেমত ছবি আঁকবে। শিশুর কল্পনায়, চিন্তায় সে যা ভাবে, তা খেলার আনন্দ নিয়ে আঁকবে।	২.১ শিশু তার ইচ্ছেমত ছবি আঁকবে। সে নিজেই ঠিক করে নিবে সে কোন বিষয়ে ছবি আঁকবে।	২.১ শিশু যা শিখছে এবং তার চার পাশটাকে যেভাবে দেখছে অর্থাৎ তার জানা জগৎ থেকে বিষয় নিয়ে ইচ্ছেমত ছবি আঁকা।	২.১ পরিচিত যে কোন জিনিস ও প্রাকৃতিক দৃশ্য ইচ্ছেমত কল্পনা থেকে রঙ বা পেন্সিলে আঁকা।	২.১ পরিচিতি যে কোন বস্তু, প্রাকৃতিক দৃশ্য, ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক স্মৃতি স্তম্ভ ইত্যাদি অবশ্যই নিজের ইচ্ছেমত আঁকা।
৩। অভিজ্ঞতা ভিত্তিক ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে ছবি আঁকা।	৩.১ শিশু নিজের পরিবেশে যা দেখে কিম্বা উপলব্ধি করে এবং যা তার কাছে ভালো লাগে তা ইচ্ছেমত আঁকবে।	৩.১ শিশু নিজের পরিবেশে যা দেখে কিম্বা উপলব্ধি করে এবং যা তার কাছে ভালো লাগে তা ইচ্ছেমত আঁকবে।	৩.১ শিশু তার পোষা পাখি অথবা তার প্রিয় জীব-জন্তুর ছবি আঁকা। ৩.২ শিশু বেড়াতে গিয়ে কোন জায়গা ভাল লাগলে মন থেকে সে জায়গার ছবি আঁকা।	৩.১ গাছ, ফুল-ফল, পাতা, পাখি ও মাছ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে স্মৃতি থেকে আঁকতে পারা। ৩.২ শিশুর দেখা গ্রাম, শহরের বিশেষ বিশেষ দর্শনীয় স্থানের ছবি (চিড়িয়াখানা, যাদুঘর, স্মৃতিসেধ, মেলা ইত্যাদি) আঁকা	৩.১ শিশুর প্রিয় খেলা, উৎসব, জন্মদিন, ঈদ, পূজা, বড়দিন, বৌদ্ধ পূর্ণিমা, নববর্ষ, মেলা, বাজার ইত্যাদির ছবি বুদ্ধি খাটিয়ে ইচ্ছেমত রঙ দিয়ে আঁকতে পারা।

৪। বর্ণমালা লেখা/ সুন্দর হাতের লেখার অভ্যাস করা।	৪.১ বোর্ড/ খাতায় বাংলা স্বরবর্ণের অক্ষরগুলো বড় করে লেখতে শেখা।	৪.১ শিশুর স্বাভাবিক বাংলা ইংরেজি লেখা সঠিক এবং সুন্দরভাবে লিখতে শেখা।	৪.১ দাগ ছাড়া সাদা কাগজে লাইন সোজা করে হাতের লেখা লেখতে পারা।	৪.১ সরু, একটু মোটা, মাঝারি মোটা এবং বেশ মোটা বিভিন্ন মাপের কলম দিয়ে লেখা শেখা।	৪.১ বাংলা-ইংরেজি সংখ্যা ইত্যাদি বর্ণ ও চিহ্নকে বিভিন্ন নক্‌শার আদলে লিখতে শিখবে; ৪.২ এই নক্‌শাটি বিভিন্ন রঙে হবে এবং সাদা কালোতে তৈরি করতে পারা।
৫। রেখাচিত্র অঙ্কন।	৫.১ শিশুদের রেখা অঙ্কনে হস্ত চালানোর অভ্যেস করানো।	৫.১ ছবি আঁকার কাগজে শুধু রেখা দিয়ে ছোট বড় বিভিন্ন আকারের নক্‌শা তৈরি করা।	৫.১ তিনটি ত্রিভূজ এবং তিনটি বৃত্ত সাজিয়ে ছবি তৈরি করতে পারা।	৫.১ মুক্ত হস্তে রেখা দিয়ে ছোট বড় অনেক গুলো বৃত্ত এঁকে নিজের মত নকশা বা ছবি তৈরি করতে পারা	৫.১ মুক্ত হস্তে রেখা দিয়ে ছোট বড় ত্রিভুজ বা বৃত্ত দিয়ে নক্‌শা বা ছবি তৈরি করতে পারা।
৬। মৌলিক রঙের সাথে পরিচিত হওয়া এবং ছবি এঁকে রঙ করা।	৬.১ মৌলিক রঙ গুলো ভাল করে চিনবে এবং ব্যবহার করা শিখবে। ৬.২ মে.লিক দুইটি রঙ মিশিয়ে অন্য যে রঙগুলো হয় সেটা শিখবে।	৬.১ মৌলিক এবং মিশ্রিত রঙগুলোর সাথে ফুল, পাখি, গাছপালার রঙ মেলাতে শেখা।	৬.১ মৌলিক এবং মিশ্রিত রঙের সমন্বয়ে অনেক বেশি ছবি আঁকার অভ্যাস করতে পারা।	৬.১ ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ ও বৃত্তের সাহায্যে নক্‌শা অঙ্কন করে নক্‌শাটি মে.লিক ও মিশ্রিত রঙ দিয়ে ভরাট করতে পারা।	৬.১ শিশু-তার ইচ্ছেমত যেসব ছবি আঁকবে তাতে মে.লিক ও মিশ্রিত রঙগুলোর বৈশিষ্ট্য চিনতে শিখা।
৭। অন্যান্য উপকরণের সাথে পরিচিত হওয়া।	৭.১ ছবি আঁকার পরিচিত উপকরণ ছাড়া অন্যান্য উপকরণের সাথে পরিচয়	৭.১ কাদামাটি, রঙিন কাগজ, আঠা, পাটখড়ি, খেজুর পাতা, নারিকেল পাতা, ঝিনুক, নুড়ি পাথর, ডিমের খোসা, ছোট বড় কাঠের টুকরো ইত্যাদি দিয়ে ছবি ও অন্যান্য শিল্পকর্ম বানানো।	৭.১ কাদামাটি, রঙিন কাগজ, আঠা, পাটখড়ি, খেজুর পাতা, নারিকেল পাতা, ঝিনুক, নুড়ি পাথর, ডিমের খোসা, ছোট বড় কাঠের টুকরো ইত্যাদি দিয়ে ছবি ও অন্যান্য শিল্পকর্ম বানানো।	৭.১ কাদামাটি, রঙিন কাগজ, আঠা, পাটখড়ি, খেজুর পাতা, নারিকেল পাতা, ঝিনুক, নুড়ি পাথর, ডিমের খোসা, ছোট বড় কাঠের টুকরো ইত্যাদি দিয়ে ছবি ও অন্যান্য শিল্পকর্ম বানাতে পারা।	৭.১ কাদামাটি, রঙিন কাগজ, আঠা, পাঠখড়ি, খেজুর পাতা, নারিকেল পাতা, ঝিনুক, নুড়ি পাথর, ডিমের খোসা, ছোট বড় কাঠের টুকরো ইত্যাদি দিয়ে ছবি ও অন্যান্য শিল্পকর্ম বানাতে পার

৮। কাদামাটি দিয়ে বিভিন্ন জিনিস তৈরি করা।	৮.১ কাদামাটি দিয়ে ইচ্ছেমত খেলনা, পুতুল, পশুপাখি ইত্যাদি তৈরি করতে পারা।	৮.১ কাদামাটি দিয়ে ইচ্ছেমত খেলনা, পুতুল, পশুপাখি ইত্যাদি তৈরি করতে পারা।	৮.১ কাদামাটি দিয়ে ইচ্ছেমত গোলাকার যে কোন ফল তৈরি করতে পারা। যেমন- আতা, ডালিম, বাতাবি লেবু ইত্যাদি। ৮.২ কাঁদামাটি দিয়ে শিল, নোড়া, বাটি, মাছ, পাখি, বাংলা ও ইংরেজি অক্ষর তৈরি করা।	৮.১ কাদামাটি দিয়ে ইচ্ছেমত গোলাকার যে কোন ফল তৈরি করতে পারা। যেমন আতা, ডালিম, বাতামি লেবু, বেল ইত্যাদি। ৮.২ কাদামাটি দিয়ে শিল, নোড়া, বাটি, মাছ, পাখি, বাংলা ও ইংরেজি অক্ষর তৈরি করা।	৮.১ মাটি দিয়ে বিভিন্ন মাপের ফলক বানাতে শিখবে। নরম মাটির এই ফলক কখনও খোদাই করে কখনও আলগা মাটি যুক্ত করে ফলকের তল উঁচু নিচু করে ইচ্ছেমত ছবি ও নক্শা তৈরি করতে পারা।
৯। রঙিন ও সাদাকালো কাগজ ছিড়ে বা কেটে আঠা লাগিয়ে নানারকম শিল্পকর্ম তৈরি এবং রঙিন টুকরো কাপড় কেটে আঠা দিয়ে লাগিয়ে ছবি তৈরি করা।	৯.১ রঙিন কাগজ ছিড়ে বা কেটে ছবি বা নক্শা তৈরি করা। ৯.২ রঙিন টুকরো কাপড় আঠা দিয়ে লাগিয়ে ছবি বা নক্শা তৈরি করা।	৯.১ রঙিন কাগজ ছিড়ে বা কেটে ছবি বা নক্শা তৈরি করা। ৯.২ রঙিন টুকরো কাপড় আঠা দিয়ে লাগিয়ে ছবি বা নক্শা তৈরি করা।	৯.১ রঙিন কাগজ ছিড়ে বা কেটে ছবি বা নক্শা তৈরি করা। ৯.২ রঙিন টুকরো কাপড় আঠা দিয়ে লাগিয়ে ছবি বা নক্শা তৈরি করা।	৯.১ রঙিন টুকরো কাগজ বা কাপড় দিয়ে ইচ্ছোমত ছবি ও নক্শা তৈরি করতে পারা। ৯.২ রঙিন কাগজ কেটে বাংলা ও ইংরেজি বর্ণমালা বা কোন লেখা তৈরি করতে পারা।	৯.১ রঙিন কাগজ বা কাপড় দিয়ে শিশুর ইচ্ছেমত ছবি ও নক্শা তৈরি করতে পারা।
১০। পাটখড়ি, খেজুর পাতা, নারিকেল পাতা, নূড়ি পাথর, ঝিনুক, ডিমের খোসা, ছোট বড় কাঠের টুকরো ইত্যাদি উপকরণ দিয়ে কিছু তৈরি করা।	১০.১ নিজের ইচ্ছেমত বা খেয়াল খুশিমত পাটখড়ি, খেজুর পাতা, নারকেল পাতা, ঝিনুক, নুড়ি পাথর, ডিমের খোসা, ছোট বড় কাঠের টুকরো, সুতা,ইত্যাদি উপকরণ দিয়ে সখের জিনিস তৈরি করা।	১০.১ নিজের ইচ্ছেমত বা খেয়াল খুশিমত পাটখড়ি, খেজুর পাতা, নারকেল পাতা, ঝিনুক, নুড়ি পাথর, ডিমের খোসা, ছোট বড় কাঠের টুকরো ইত্যাদি উপকরণ দিয়ে জিনিস তৈরি করা।	১০.১ খেজুর পাতা, নারকেল পাতা, তালা পাতা দিয়ে বিভিন্ন ধরনের দ্রব্য তৈরি করা।	১০.১ খেজুর পাতা, নারকেল পাতা, তালপাতা ও কলা পাতা দিয়ে সহজে নানা ধরনের ঝুড়ি, পাটি, বাঁশী ও টুপি তৈরি করতে পারা।	১০.১ খেজুর, নারকেল, তাল ও কলাপাতা দিয়ে সহজ নক্শা এবং পাটি, পাখা ইত্যাদি তৈরি করতে পারা।
	-	-	-		

১১। পাট দিয়ে রশি বেনী ও অন্যান্য সহজ জিনিস তৈরি করতে শেখা				১১.১ পাট ও পাটের রশি দিয়ে বেনী, শিকা ও অন্যান্য সহজ জিনিস তৈরি করতে পারা	১১.১ পাট ও পাটের রশি দিয়ে বেনী তৈরি, শিক্ষা ও অন্যান্য সহজ জিনিস তৈরি করতে পারা।
১২। বিভিন্ন জিনিস রঙ করতে পারা	-	-	১২.১ সংগ্রহ করা পোড়া মাটির জিনিস রঙ করতে পারা।	১২.১ সংগ্রহ বা নিজের তৈরি যে কোন জিনিস রঙ করতে পারা।	১২.১ সংগ্রহ বা নিজের তৈরি যে কোন জিনিস রঙ করতে পারা।
১৩। আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে ছবি আঁকা।	-	-	-	১৩.১ কম্পিউটারে ছবি আঁকা ও রঙ করতে পারা।	১৩.১ কম্পিউটারে ছবি আঁকা, রঙ করা এবং প্রিন্ট নেওয়া

পাঠ পরিকল্পনা কী? দৈনিক পাঠ পরিকল্পনা

দাঁড় বিহীন নৌকার পথচলা যেমন গন্তব্যহীন, তেমনি শ্রেণিকক্ষে পাঠ পরিকল্পনা বিহীন পাঠদান অর্থহীন। শ্রেণিকক্ষে সঠিক পাঠদানের পূর্বশর্ত হচ্ছে নিয়মিত পাঠ পরিকল্পনা তৈরি করে সেই অনুযায়ী পাঠদান। পাঠ পরিকল্পনা হচ্ছে কোন বিষয়ে ছাত্র ছাত্রীদের পাঠ দেওয়ার আগে নির্দিষ্ট পাঠটি সম্পর্কে পরিকল্পনা করে সময় গুলোকে ভাগ করে নেওয়া যথাক্রমে কুশল বিনিময়, উপস্থাপন ও মূল্যায়নের জন্য। যাতে করে নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট পাঠটি খুব সহজে ও বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন করে সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন করা যায়। এতে একজন শিক্ষকের থাকে পুরো পাঠদানের প্রস্তুতি। পাঠ পরিকল্পনা ছাড়া পাঠদানের ক্ষেত্রে তথ্য সংগ্রহ এবং প্রদানে নির্ধারিত পাঠটি সম্পর্কে ঘাটতি থেকে যায়। যা কখনোই কাম্য নয়। পাঠ পরিকল্পনা যে ব্যাপারটি আসে, তা হলো শিক্ষাপোকরণ। শিক্ষাপোকরণ হলো এমন সব উপকরণ, যা পাঠের বিষয়বস্তুর ওপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়। পাঠটি সহজ ও সুন্দরভাবে বোঝানোর জন্য এবং শ্রেণিকক্ষে আনন্দ ও বিনোদনমূলক পরিবেশ গড়ে তুলতে শিক্ষাপোকরণের কোন বিকল্প নেই। আর পাঠ পরিকল্পনা ও শিক্ষাপোকরনের মধ্যে অতি নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। কেননা, পাঠ পরিকল্পনার ওপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয় দৈনন্দিন শিক্ষাপোকরণ ব্যবহার করা হবে।

এক কথায় বলা যায় পাঠ পরিকল্পনা হল '**শ্রেণিকক্ষে পাঠ উপস্থাপনের পূর্বে পাঠটিতে কী পদ্ধতি/কৌশল ব্যবহার করা হবে, কী উপকরণ ব্যবহার করা হবে, কতটুকু সময় নিয়ে করা হবে এবং কীভাবে করা হবে তার একটি পূর্ণাঙ্গ রূপরেখা**'।

অর্থাৎ নির্ধারিত সময়ে পাঠ সংশ্লিষ্ট উপকরণ ও কৌশল সঠিকভাবে প্রয়োগের মাধ্যমে শিক্ষার্থী কর্তৃক শিখনফল অর্জন নিশ্চিত করার জন্য যে পরিকল্পনা করা হয়, তাকে পাঠ পরিকল্পনা বলা হয়।

পাঠ পরিকল্পনায় যা অন্তর্ভুক্ত থাকবে

০১। পাঠ্যসূচির অধ্যায় বা অংশ যা পড়ানো হবে।
০২। শিক্ষণের উদ্দেশ্য যা শিক্ষার্থীরা এই পাঠ শেষে অর্জন করতে পারবে।
০৩। নির্দিষ্ট শিক্ষণ পদ্ধতি যা ব্যবহার করা হবে।
০৪। শিক্ষণ সহায়ক সামগ্রী, স্থানীয় শিক্ষা উপকরণ এবং পাঠ্যপুস্তক যা ব্যবহৃত হবে।
০৫। শিক্ষার্থীদের পরিকল্পিত মূল্যায়ন কৌশল/পদ্ধতি।

- **পাঠ পরিকল্পনাটি পাঠদান শুরুর পূর্বে প্রস্তুত করতে হবে।**

পাঠ-পরিকল্পনার সুফল

- পাঠ-পরিকল্পনা করা থাকলে শিক্ষকের পক্ষে শ্রেণীর কাজ পরিচালনা সহজ হয়। পাঠ-পরিকল্পনা তৈরির সময় শিক্ষকের যে প্রস্তুতি তা শ্রেণীকক্ষে প্রত্যক্ষভাবে পাঠ শেখানোর কাজে বিশেষ সহায়ক হয়।

- পাঠ-পরিকল্পনা শিক্ষককে পাঠে সুনিদ্দিষ্টভাবে অগ্রসর হতে সহায়তা করে। তিনি কোন অপ্রয়োজনীয় যায়গায় গুরুত্ব দিয়ে অযথা সময় নষ্ট করেন না। ফলে শ্রেনীর শিখন-শেখানো কাজের জন্য বরাদ্ধকৃত সময়ের সুসম ব্যবহার নিশ্চিত হয়।

- পাঠ-পরিকল্পনা করা না থাকলে শিক্ষক শ্রেণিতে শিক্ষার্থীদের নিকট সুসামঞ্জস্যভাবে উপস্থাপন করতে পারেন না। ফলে শিক্ষার্থীদের পাঠ গ্রহণে অসুবিধা হয়।

- পাঠ-পরিকল্পনা করা থাকলে শিক্ষক নিজের মধ্যে যা কিছু ভাল তা শিক্ষার্থীদেরকে দিতে পারেন। ব্যক্তি হিসেবে শিক্ষকের নিজস্ব ত্রুটি/সীমাবদ্ধতা থাকতে পারে, কিন্তু এসব ত্রুটি/সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতনতার দরুন তিনি এগুলোকে তাৎক্ষনিকভাবে শ্রেনীতে পরিত্যাগ করতে পারেন না। পরিকল্পিত পাঠে এ ধরণের সীমাবদ্ধতা দূরীকরণ সহজ হয়।

- পূর্বে প্রস্তুতকৃত পাঠ-পরিকল্পনার সাহায্যে পাঠ উপস্থাপন করতে গেলে শিক্ষকের আন্তরিকতা ও আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। কেননা তিনি তাঁর নিজের পরিকল্পনার বাস্তব রূপায়নই দেখতে চান, তাকে বিফল হতে দিতে চাননা। ফলে শিক্ষক শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে সর্বশক্তি নিয়োগ করেন।

- পাঠ-পরিকল্পনার সাহায্যে পাঠদান করলে শিক্ষক তাঁর প্রচেষ্টার ফল হাতে হাতে পান; শিক্ষার্থীদের পাঠগ্রহণের সফলতা/বিফলতা তাৎক্ষনিকভাবে বুঝতে পারেন। ফলে শিক্ষার্থীদের সাফল্যে শিক্ষক স্বাভাবিকভাবেই উৎসাহিত হন। এতে শিক্ষকের মধ্যে প্রেষণা শক্তি জাগ্রত হয়।

- পাঠ-পরিকল্পনা বিদ্যালয় পরিচালনার কাজেও সহায়তা করে। বিদ্যালয়ের বিশেষ শ্রেণির জন্য নিদ্দিষ্ট বছরের পাঠ্যসূচিকে সহজে পরিমানগতভাবে ভেঙ্গে পরিকল্পনা তৈরি করা যায়। এতে করে সম্পুর্ণ পাঠ্যক্রমটি পরিকল্পিত আকারে বছরের মধ্যে শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপন করা যায়।

- পরিকল্পিত পাঠ শিক্ষার্থীরা সহজে গ্রহণ করতে পারে। ফলে শ্রেনি শৃঙ্খলা বজায় রাখা সহজ হয়।

- পাঠের জন্য উপকরণ নির্বাচন, সংগ্রহ/তৈরি ও ব্যবহার সহজ ও যথোপযুক্ত হয়।

- শিক্ষার্থীদের অর্জিত পাঠ মূল্যায়ন ও অপারগদের পারগতা নিশ্চিতকরণে শিক্ষকের পদ্ধতি নির্বাচন ও প্রয়োগ সহজ এবং যথোপযুক্ত হয়।

শিখনফল লেখার নিয়মাবলি

- শিখনফলে একটি মাত্র আচরনিক বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ থাকবে।
- শিখনফলের উদ্দেশ্যে ৩টি ক্ষেত্র - জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি থেকে শিখনফল চিহ্নিত করতে হবে।
- শিখনফল ক্রিয়াবাচক শব্দে লিখতে হবে।
- একটি মাত্র বাক্যে শিখনফল লিখতে হবে।
- শিখনফল সুনির্দিষ্ট,স্পষ্ট ও পরিমাপযোগ্য হবে।

শিখনফল লেখার ক্রিয়াপদ

বলা, বর্ননা করা, লেখা, পার্থক্য করা, বিবৃত করা, বিশ্লেষণ করা, পর্যবেক্ষণ করা, পরিমাপ করা, তালিকা করা, তুলনা করা, শ্রেণিকরণ করা, চিহ্নিত করা, সমাধান করা, পৃথক করা, তৈরি করা, প্রদর্শন করা, সনাক্ত করা, পরিবর্তন করা, অংকন করা ইত্যাদি।

নমুনা পাঠ পরিকল্পনা

দৈনিক পাঠ পরিকল্পনা

শ্রেণি: দ্বিতীয় বয়সের গড় - ৮+ শিক্ষার্থী সংখ্যা: ৬০জন (আনুমানিক) শিক্ষকের নাম:	**বিষয়: চারু ও কারুকলা (চারুকলা)** সাধারণ পাঠ: ঘরবাড়ি, গাছপালা, মাঠ-নদী, ফুল-পাখী, নিজের বাবা-মা, ভাই-বোন ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে শিশুর ধারনা থেকে নিজের মত করে ছবি আকা। বিশেষ পাঠ: জাতীয় পতাকা অংকন, (রংসহ)। সময়: ৪০ মিনিট।

শিখনফল

৩.১.১ শিশুরা নিজের অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষন ক্ষমতাকে ব্যবহার করতে শিখবে।

৩.১.২ ছবি আকার মাধ্যমে শিশু তার পর্যবেক্ষন ও কল্পনাকে বাস্তবে রূপ দিতে শিখবে।

পদ্ধতি: প্রদর্শন, পর্যবেক্ষণ, অংকন।

উপকরণ: কাগজ, পেন্সিল, রাবার, কাটার, রং মাল্টিমিডিয়া প্রভৃতি।

প্রস্তুতি

শিক্ষকের কাজ	শিক্ষার্থীর কাজ	সময়
• শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে কুশল বিনিময় করব। • শ্রেণিকক্ষে শ্রেণি বিন্যাস করব। • "জাতীয় সংগীত গেয়ে শুনাব" • পতাকার ছবি প্রদর্শন করব। • ছবি প্রদর্শনের মধ্য দিয়ে পাঠের শিরোনাম ঘোষণা	✓ শিক্ষার্থীরা দাড়িয়ে সম্মান প্রদর্শন করবে। ✓ শ্রেণি বিন্যাসে সহায়তা করবে। ✓ জাতীয় সংগীত শুনবে ও গাইবে। ✓ ছবি দেখে পাঠ সম্পর্কে বুঝতে পারবে। ✓ পাঠের শিরোনাম খাতায় লিখবে।	৫ মিনিট

উপস্থাপনা

শিক্ষকের কাজ	শিক্ষার্থীর কাজ	সময়
• জাতীয় পতাকা কিভাবে দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ নিয়ে অংকন করে সে সম্পর্কে বলব। • পতাকা রং করা সম্পর্কে বলব। • নিম্নলিখিত নিয়মানুযায়ী বোর্ডে পতাকা	✓ মনোযোগ দিয়ে পতাকা সম্পর্কে শনবে। ✓ পতাকার রং সম্পর্কে জানবে ও বুঝবে। ✓ জাতীয় পতাকা অংকনের নিয়মাবলি ভালোভাবে বুঝবে।	১০ মিনিট

অংকন করবো-প্রথমে ২০ ইঞ্চি দৈর্ঘ্যর ও ১২ ইঞ্চি প্রস্থের একটি আয়তক্ষেত্র অংকন করব। আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্যের ২০ ভাগের নয় ভাগে একটি লম্ব অংকন করি। প্রস্থের ঠিক অর্ধেক ভাগে দৈর্ঘ্যের সমান্তরাল করে রেখা টানব। রেখা দুটির ছেদবিন্দু কে কেন্দ্র করে ৪ ইঞ্চি ব্যাসার্ধ ধরে একটি বৃত্ত অংকন করব। বৃত্তের কেন্দ্র নির্ধারণের জন্য যে দুটি রেখা আঁকা হয়েছিল তা মুছে ফেলি। এ ভাবে পতাকা অংকন করব।	✓ অংকন সম্পর্কে শিক্ষককে ছোট ছোট প্রশ্ন করবে।	

প্রয়োগ

শিক্ষকের কাজ	শিক্ষার্থীর কাজ	সময়
• সঠিক মাপ অনুযায়ী পতাকা অংকন ও রং করতে দেব। • জাতীয় পতাকা অংকনেও সাহায্যে করব। • দলে গিয়ে সম্পূর্ণভাবে জাতীয় পতাকা অংকন ও রং করা দেখাব।	✓ শিক্ষকের নির্দেশনা অনুযায়ী জাতীয় পতাকা অংকন ও রং করবে। ✓ শিক্ষার্থীরা জাতীয় পতাকা অংকন ও রং করনে শিক্ষকের সাহায্য নিবে। ✓ শিক্ষার্থীরা সম্পূর্ণ শিক্ষকের সহায়তায় জাতীয় পতাকা অংকন ও রং করবে।	২০ মিনিট

মূল্যায়ন:

শিক্ষকের কাজ	সময়
শিক্ষার্থীদের কাজ দিয়ে শিক্ষক ঘুরে ঘুরে প্রত্যেক দলের শিক্ষার্থীদের কাজ মূল্যায়ন করবো (তিনমাত্রার স্কেলে মূল্যায়ন করবো)	৫ মিনিট

*** **নিরাময়মূলক ব্যবস্থা:** প্রশিক্ষণার্থীদের কাজ চলাকালীন সময়ে ব্যক্তিগত ভাবে দুর্বল শিক্ষার্থী চিহ্নিত পূর্বক সহায়তা দিবো।

মূল্যায়ন সংরক্ষণপত্র

পিটিআই এর নাম: ....
শিক্ষার্থীর নাম:..
শ্রেণি রোল/বোর্ড রোল:...
শিক্ষাবর্ষ:..

কাজের মূল্যায়ন মান			
ভাল	মধ্যম	নিম্ন মধ্যম	উন্নয়ন
A	B	C	D
4	3	2	1

ক্রমিক নং	কাজের নাম	মূল্যায়ন মান						ইন্সট্রাক্টরের স্বাক্ষর ও তারিখ
		অংকন	রং করা	বিষয় জ্ঞান	পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা	উপস্থাপন	সার্বিক মন্তব্য/গ্রেড	
১.	জাতীয় পতাকা	B	C	B	B	C	আরো ভাল করতে হবে গ্রেড-B / নম্বর -3	২২/২/২০১৭
২.								
৩.								
৪.								
৫.								
৬.								
৭.								
৮.								
৯.								
১০.								
১১.								
১২.								
১৩.								
১৪.								
১৫.								

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

সৈয়দ আলী আহসান (১৯৮৩), শিল্পবোধও শিল্পচৈতন্য, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা।

আব্দুস সাত্তার (১৯৮৯), শিল্পের উপকরণ ও ব্যবহার পদ্বতি, কনটেম্পোরারী কনসেপ্ট, ঢাকা।

মতিয়র রহমান ওকাজী আব্দুল বাতেন (২০০০), চারু ও কারুকলা, সি.ইন-এড প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য তথ্যপুস্তক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

বুলবন ওসমান (২০০১), সংস্কৃতি ও সংস্কৃতিতত্ত্ব, অরিত্র, ঢাকা।

মজুমদার পরিতোষ কুমার ও অন্যান্য (২০১৩), বিষয় ভিত্তিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল চারু ও কারুকলা, প্রশিক্ষণ বিভাগ, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

নীরেশ মুখার্জী (২০০৪), শিক্ষা উপকরণ তৈরী, নির্দেশিকা (বাংলা ও ইংরেজি)আইডিয়াল প্রকল্প, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

আইরিন পারভীন (২০০৫), বিষয়ভিত্তক শিক্ষা উপকরণ তৈরীর জন্য নির্দেশিকা, পরিবেশ পরিচিতি বিজ্ঞান ও প্রাথমিক গণিত, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

সংগীত

শিল্পকলা

প্রয়োগিক বা ব্যবহারিক ক্ষেত্রে "শিল্প" ও "কলা" শব্দদ্বয় অভিন্ন অর্থ বহন করে থাকলেও আক্ষরিকভাবে শিল্প বলতে বোঝায় কৌশলময় সুণিপুন কর্ম। চারু-কারু বা সংগীতে প্রতিভাযুক্ত কর্মই শিল্প। আর কলা বলতে বোঝায় বিদ্যা।শিল্প শব্দটি কর্ম হলেও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে কখনও কখনও কলা (কৌশল, দক্ষতা, নৈপূণ্য) ও বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। শিল্প = কলাবিদ্যা (নৈপূণ্য, দক্ষতা, কৌশল) দ্বারা কৃতকর্ম। আর কলা = শিল্পের বিদ্যা। যে বিদ্যা (কৌশল, দক্ষতা, নৈপূণ্য) দ্বারা শিল্পকর্ম করা হয়।

অতএব বলা যায় সৃষ্টিশীল ও প্রতিভাযুক্ত কর্মই শিল্প আর শিল্পের প্রতিভা ও কৌশলই কলা।

সংস্কৃতির মধ্যে একটি জাতির যে চিন্তা শক্তি ও সৃজনশীল প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায় সেগুলোকে শিল্প কলা বলে।

শিল্পকলা হল অনুভূতি বহিঃপ্রকাশের কোন উপায় বা প্রণালী, যা সাধারণত সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত এবং কালের আবর্তনে এটি সংস্কৃতিকেই পরিবর্তন করতে সহায়তা করে। উদাহরণস্বরূপ, শিল্পকলা হল অভ্যন্তরীণ সৃজনশীল আবেগের একটি বাস্তব পরিস্ফুটন। আনুষ্ঠানিক শিল্পকলা - এর অন্তর্গত হল সঙ্গীত, নৃত্য এবং মঞ্চনাটক।

সংগীত

গীত, বাদ্য ও নৃত্য এই তিনটি কলার একত্র সমন্বয়ই সংগীত। গীত, বাদ্য ও নৃত্য তিনটি স্বতন্ত্র জিনিস, আবার এই তিনের সমাবেশেই হয় সংগীত।

গীতঃ সুর, অর্থপূর্ণ শব্দ ও তালের সাহায্যে মনের ভাব প্রকাশ করাই হচ্ছে গীত।

বাদ্যঃ সুর ও তালের মাধ্যমে যন্ত্রের সাহায্যে মনের ভাব প্রকাশ করা হচ্ছে বাদ্য।

নৃত্যঃ ছন্দ ও সুন্দর অঙ্গভঙ্গির সমন্বয়ে হয় নৃত্য।

স্বর

যে ধ্বনি স্থায়ী, পৃথক অথচ স্পষ্ট ও পূর্ণরূপে বিকশিত হয়ে চিত্তের প্রসন্নতা আনে, সংগীতে তাকে স্বর বলে।

সংগীতের আছে প্রধান ৭টি স্বর। স্বরগুলোর **শাস্ত্রীয় নামঃ** ষড়জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত, নিষাদ। **ব্যবহারিক নামঃ** সা, রে, গা, মা, পা, ধা, নি। এই ৭টি শুদ্ধ স্বর। এছাড়াও আছে ৪টি **কোমল স্বরঃ** ঋা, জ্ঞা, দা, ণা একটি কড়ি স্বর হলো হ্মা। কোমল এবং কড়ি স্বরকে বিকৃত স্বর বলে।

স্বর দুই প্রকারঃ- ১) চলস্বর ২) অচল স্বর

চলস্বরঃ যে সকল স্বর শ্রুতি বিন্যাসের তারতম্যে বিকৃত হয় বা স্থান চ্যুত হয়, তাকে চলস্বর বা বিকৃতস্বর বলে।

অচলস্বরঃ যে সকল স্বর শ্রুতি বিন্যাসের তারতম্যে বিকৃত হয় না বা স্থান চ্যুত হয় না এদেরকে অচলস্বর বলে। অর্থাৎ এরা সর্বদাই শুদ্ধ স্বর। অচল স্বর দু'টি। যথাঃ ষড়জ (সা) ও পঞ্চম (পা)

স্বরের শ্রেণিবিন্যাস

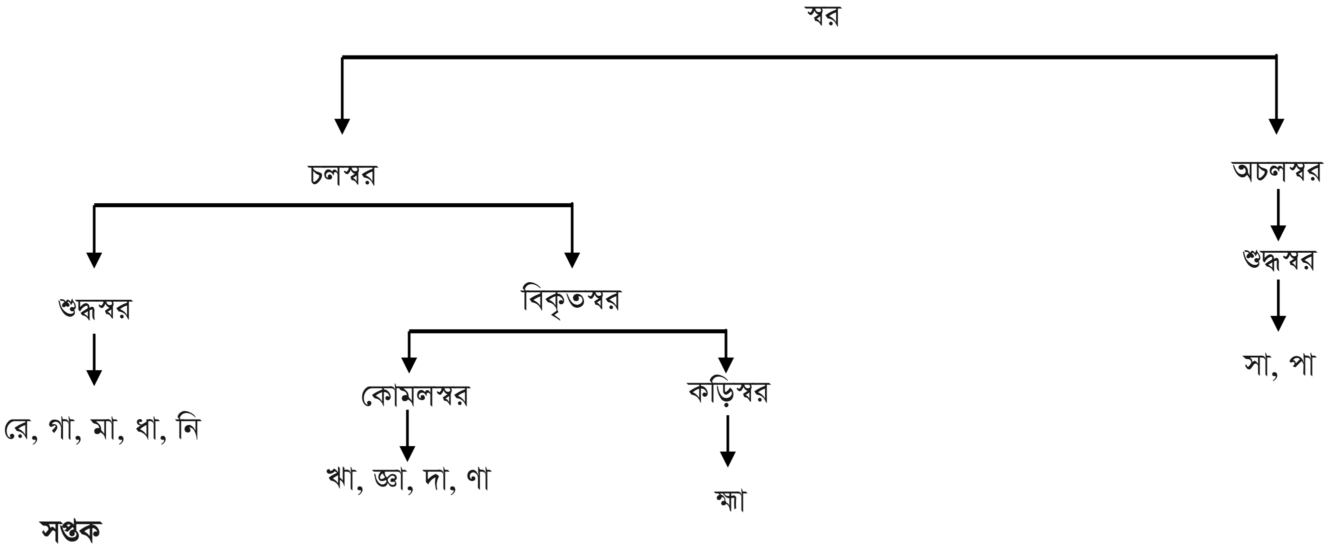

সপ্তক

শুদ্ধ সাত ও বিকৃত পাঁচ–মোট এই বারোটি স্বরকে একযোগে বলা হয় সপ্তক। (সা, ঋা/রা, জ্ঞা/গা, মা/হ্মা, পা, দা/ধা, ণা/নি) এই মোট ১২টি স্বর। এই সপ্তক তিন প্রকার–উদারা বা মন্দ্র, মুদারা বা মধ্য এবং তার বা তারা। উদারা চিহ্ন হসন্ত (্), মুদারা কোন চিহ্ন নাই, তারার চিহ্ন রেফ (´)।

সরগমঃ আরোহণ- সা, রে, গা, মা, পা, ধা, নি, র্সা

অবরোহণ- র্সা, নি, ধা, পা, মা, গা, রে, সা

তাল পরিচয়

সংগীতে তাল হলো কাল পরিমাণ বিশেষ। গীত, বাদ্য ও নৃত্যের গতি বা লয়ের স্থিতি নিরূপণ করাকেই বলে তাল। এই তাল সংগীতকে প্রতিষ্ঠিত করে অর্থাৎ ছন্দোবদ্ধ ও নিয়মাবদ্ধ করে।

মাত্রা

তালের সমান অংশ বা ভাগকে মাত্রা বলে। বিভিন্ন ছন্দোবদ্ধ মাত্রাসমষ্টি নিয়ে তাল গঠিত হয়। তাল প্রধানত দুপ্রকার–সমপদী ও বিষমপদী। অর্থাৎ সমান মাত্রায় যে ছন্দ, তা হলো সমপদী আর মাত্রা বিভাগ অসমান হলে তাকে বলা হয় বিষমপদী।

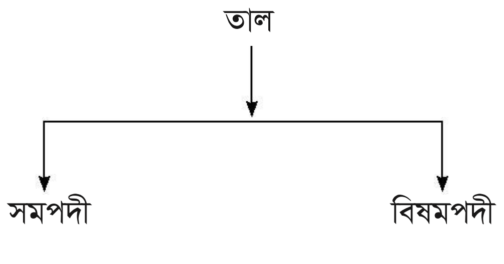

সমপদীতালের উদাহরণ – দাদরা, কাহারবা, একতাল, ত্রিতাল ইত্যাদি। **বিষমপদী**তাল হলো–তেওড়া, ঝাঁপ, রূপক, ঝম্পক ইত্যাদি।

এখানে তিনটি তালের পরিচয় দেওয়া হলো-

তাল - কাহারবা: ৮ মাত্রা (মতান্তরে ৪ মাত্রা)। একটি তাল ও একটি ফাঁক। প্রতি ৪ মাত্রা (মতান্তরে ২ মাত্রা) পর-পর তাল বিভাগ। এটি একটি সমপদী তাল ও লঘু অঙ্গের বাজ।

তাল চিহ্ন:	+	০	+
ঠেকা:	ধা গে তে টে না গে	ধি না ধা	
মাত্রা চিহ্ন:	১ ২ ৩ ৪	৫ ৬ ৭ ৮	১

'+' চিহ্ন দিয়ে সোম বা তালি বোঝায়।

'০' চিহ্ন দিয়ে ফাঁক বা খালি বোঝায়।

মতান্তরে

তাল চিহ্ন:	+		০		+
ঠেকা: ধাগে	তেটে	নাকে	ধিন্	ধাগে	
মাত্রা চিহ্ন:	১	২	৩	৪	১

তাল - দাদরা: ৬ মাত্রা। একটি তাল ও একটি ফাঁক। প্রতি তিন মাত্রা পরপর তাল-বিভাগ। এটি একটি সমপদী তাল ও লঘু অঙ্গের বাজ।

তাল চিহ্ন:	+			০			+
ঠেকা:	ধা	ধিন্	না	না	তিন	না	ধা
মাত্রা চিহ্ন:	১	২	৩	৪	৫	৬	১

তাল-একতাল (ত্রৈমাত্রিক ছন্দ): ১২ মাত্রা। তিনটি তাল ও একটি ফাঁক। প্রতি তিন মাত্রা পরপর তাল বিভাগ। এটি একটি সমপদী তাল ও খেয়াল অঙ্গের বাজ।

তাল চিহ্ন:	+	৩	০	১	+
ঠেকা:	ধা ধিন্ না ধা থুন্	না কৎ তা	ধাগে তেটে	ধিন তেটে ধা	
মাত্রা চিহ্ন:	১ ২ ৩	৪ ৫ ৬	৭ ৮ ৯	১০ ১১ ১২	১

কেন শিশুদের জন্য সংগীত শিক্ষা

সংগীতের প্রতি শিশু মনের আকর্ষণ সহজাত। তাই শিশুর মানবিক গুণাবলির বিকাশে ও তার জীবনকে মাধুর্যমণ্ডিত করে তুলতে অন্যান্য বিষয়ের পঠন-পাঠনের পাশাপাশি সুকুমার শিল্পচর্চার সুযোগ রাখা প্রয়োজন। এই প্রেক্ষিতে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন কমিটি সংগীত বিষয়টিকে একটি আবশ্যকীয় বিষয় হিসেবে প্রাথমিক শিক্ষাক্রমের অন্তর্ভুক্ত করেন।

সংগীত অনুশীলনের মাধ্যমে শিশুর সুকুমার মানসিকতা গড়ে তোলা, সৌন্দর্যবোধ জাগ্রত করার সাথে সাথে দেশীয় সংস্কৃতি সম্পর্কে জানা ও দেশপ্রেম জাগ্রত করার সম্ভাবনাময় দিকটির গুরুত্ব অনুধাবন করে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার পটভূমিতে যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম প্রণয়নের বিষয়টিকেও আবশ্যকীয় বিষয় হিসেবে রাখা হয়েছে। এই যোগ্যতাগুলোর কতটুকু কোন্ শ্রেণীতে অর্জিত হবে তা ধারাক্রম অনুযায়ী বিন্যস্ত করে এই বিষয়টির জন্য শিখনক্রম রচনা করা হয়েছে।

এই শিখনক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ১৪টি ছড়া গান নির্ধারণ করা হয়েছে। তা ছাড়া প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ১৩টি গান নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রাক-প্রাথমিকের ১৪টি ছড়া গানের মধ্যে ৩টি গান প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক উভয় শিক্ষার জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে। গান গুলো হল: “আমরা সবাই রাজা”, “আমরা করব জয়”, এবং “ প্রজাপতি! প্রজাপতি!”। বাকি ১১টি গানের প্রথম কলি হল: ১) ঝড় এলো এলো ঝড়, ২) মাথা, কাঁধ, হাঁটু, পায়ের পাতা, ৩। লাল ঝুটি কাকাতুয়া, ৪) আয় আয় চাঁদ মামা, ৫) এমন মজা হয় না, ৬) আমাদের দেশটা স্বপ্নপুরী, ৭) দোল দোল দোলনি, ৮) একদিন ছুটি হবে, ৯) মেঘের কোলে রোদ হেসেছে, ১০) এক ছিল টোনা, ১১) ক এ কলা খ এ খাই। গান গুলোর সম্পূর্ণ অংশ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষক সহায়িকায় উল্লেখিত আছে।

তাই শিখনক্রম অনুযায়ী সকল শিশুর অংশগ্রহণের মাধ্যমে বিদ্যালয়ে সংগীত অনুশীলনের প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হলে, তা শিশুর সার্বিক বিকাশ সাধনে সহায়তা করবে বলে আশা করা যায়।

সংগীত শিক্ষায় শিক্ষকের করণীয়

- শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করা।
- গানটির মূলভাব ব্যাখ্যা করা।
- প্রয়োজনে শব্দের অর্থ বলে দেওয়া।
- শুদ্ধ উচ্চারণে সঠিক তাল ও ছন্দ বজায় রেখে গানটি আবৃত্তি করে শোনান।
- তালের ছন্দ এবং মাত্রা হাতে তালি দিয়ে বোঝানো।
- সঠিক সুরে সম্পূর্ণ গানটি একবার গেয়ে শোনানো।
- সঠিক সুর, তাল,ছন্দ বজায় রেখে সমবেতভাবে গানটি গাওয়ানো।
- দৈবচয়নের ভিত্তিতে চার/পাঁচ জনকে ডেকে গানটি গাইতে দেয়া।
- কোথাও কোন ত্রুটি থাকলে সেটি ঠিক করে দেয়।
- পরে স্বরলিপি অনুযায়ি হারমনিয়াম, তবলা ও অন্যান্য বাদ্যযন্ত্রের সাথে গাওয়ানো।

ছড়া : প্রিয় ফু

ক : নজরুল ই ... া /

সু : খোন্দকার

ছড়ার প্রতি আকর্ষণ মানুষের সহজাত এবং চিরন্তন। ছড়া বা ছড়ার উপাদানের সাথে আমাদের জীবন ঘনিষ্ঠ অনেক কিছুর মিল আছে যা শিশু মনকে খুব সহজেই আকৃষ্ট করে। ছন্দ তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ছড়ার সেই ছন্দকে যদি সুরে গাঁথা যায় তখন তার ছোঁয়ায় শিশুরা মনের আনন্দে উড়ে বেড়ায়। অনাবিল আনন্দে ভরে যায় তার মন। বিশিষ্ট গীতিকার নজরুল ইসলাম বাবু এবং সুরকার খোন্দকার নুরুল আলম এর ছড়া গানে সেই ছোঁয়া আছে। এখানে শিক্ষার্থীদের গ্রহণ ও ধারণ ক্ষমতার কথা বিবেচনায় রেখেই ছোট শিশু উপযোগী ছড়া গানটি নির্বাচন করা হয়েছে। আমাদের মাতৃভাষা, জাতীয় পতাকা, জাতীয় ফল, ফুল, পশু, পাখি ও মাছের কথা বলা হয়েছে এখানে। গানটিকে আমরা দেশাত্মবোধক গান হিসেবেও বিবেচনা করতে পারি। গানটি শেখানোর পূর্বে যদি শিশুদেরকে আমাদের জাতীয় পতাকার রং, জাতীয় ফুলের নাম, ফলের নাম সম্পর্কে ধারণা দিই, তবে তারা আরও বেশি আগ্রহী হবে এবং তাদের জন্য গানের বাণী মনে রাখা সহজ হবে।

গানটি কাহারবা তালে (৪+৪=৮ মাত্রা) গাওয়া হয়েছে। (ধা গে তে টে । না গে ধি না। ধা)। এই গানটি গাওয়ার সময়/ পূর্বে উচ্চারণগুলো ঠিক আছে কিনা তা শুনে শুধরে দিতে হবে। ‘ফ’ এর উচ্চারণের বেলায় ঠোঁট দুটি মিলায়ে ‘ফ’ বলতে হবে। এ গানটি প্রথম শ্রেণির শিশুদের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে। এ গান ছাড়াও পছন্দ মত গান করানো সম্ভব।

ছড়া

কথ : নজরুল ই
সু : খোন্দকার
তা : কাহ

প্রিয় ফুল শাপলা ফুল
প্রিয় দেশ বাংলাদেশ।
প্রিয় ভাষা বাংলা ভাষা
মায়ের কথার মিষ্টি রেশ।।
প্রিয় পাখি দোয়েল পাখি
প্রিয় সবুজ লাল,
আরো প্রিয় জষ্ঠী মাসের
সুবাসী কাঁঠাল।
মাঠে রাখালীয়া বাঁশি
ভোলায় যত দুঃখ ক্লেশ।।
প্রিয় নদী পদ্মা নদী
প্রিয় ইলিশ মাছ,
সুন্দর বনের রয়েল বেঙ্গল
আর সুন্দরী গাছ।
চির সবুজ আমার দেশের
রূপের যেন নেইকো শেষ।।

II{ধসা –া সা –া | সা –া –রধা –া I ধসা –া সা –া | রগা গা –া –া I
প্রি ০ য় ০ | ফু ০ ০ ল শা প লা ০ | ফু০ ০ ল ০

||
I সণ্া –া ণ্া –া | রা –া –া –াগ I সা –া সা –া | সা –া –া –া I
প্রি ০ য় ০ | দে ০ ০ শ বা ং লা ০ | দে ০ ০ শ

I ধসা –া সা –রসা | সা ণ্া ণ্া –া I পধা –া –া ধণ্ধা | ধা –প্া প্া –া I
প্রি ০ য় ০০ | ভা ০ ষা ০ বা ং ০ লা০০ | ভা ০ ষা ০

I মা প্া প্া –া | ধা সা সা –া I রা –া –া রগরা | রসা –া –া –া}II
মা ০ য়ে র | ক ০ থা র মি ০ ষ্ টি০০ | রে ০ শ ০

II{মা –পা পা ধপা | গমা –া গা –া I গমা –া –া ধপা | পা –া পা –া I
১. প্রি ০ য় ০০ | পা ০ খি ০ দো ০ য়ে ল০ | পা ০ খি ০
২. প্রি ০ য় ০০ | ন ০ দী ০ প ০ দ্ দা | ন ০ দী ০

I মা –প্া পা –ধপা | পমা –া গা মা I মা –রা –া –া | –া –া –া –া I
প্রি ০ য় ০০ | স ০ বু জ্ লা ০ ০ ০ | ০ ০ ০ ল
প্রি ০ য় ০০ | ই ০ লি শ মা ০ ০ ০ | ০ ০ ০ ছ্
I রা –ন্া ন্া –া | সা –রা রা –গরা I রা –ন্া –া ন্া | সা –রা রা –া I
আ ০ রো ০ | প্রি ০ য় ০০ জ ০ ষ্ ঠী | মা ০ সে র্
সু ন্ দ র্ | ব ০ নে ০র্ র ০ য়ে ল্ | বে ঙ্ গ ল্

I সরা –া রা –পা | পা –মা মা –পমা I গা –া –া –া | –া –া –া –া}I
সু ০ বা ০ | সী ০ কাঁ ০০ ঠা ০ ০ ০ | ০ ০ ০ ল
আ র্ সু ন্ | দ ০ রী ০০ গা ০ ০ ০ | ০ ০ ০ ছ্

I গা -া পা -া | ধা -া না -া I র্র্সা -া না -া | ধপা -া পা -া I

মা ০ ঠে ০ | রা ০ খা ০ লি ০ য়া ০ | বাঁ০ ০ শি ০

চি ০ র ০ স ০ বু জ্ আ ০ মা র্ দে ০ শে র

I সরা -া রা -া | রা -া গা -া I রগা -া -া পমা | মা -া -া -া I

ভো ০ লা য় | য ০ তো ০ দু ০ খ্ খো০ | ক্লে ০ শ্ ০

রূ ০ পে র যে ০ ন ০ নে ০ ই কো০ শে ০ ষ ০

I প্া -া প্া -া | ধ্া -সা সা -া I রা -া -া গরা | সা -া -া -া II II

ভো ০ লা য় | য ০ তো ০ দু ০ খ্ খো০ | কে ০ শ্ ০

রূ ০ পে র যে ০ ন ০ নে ০ ই কো০ শে ০ ষ ০

ছড়া গান: প্রজাপতি প্রজাপতি

কথা: কাজী নজরুল ইসলাম

সুর: কমল দাশগুপ্ত

কাজী নজরুল ইসলাম–প্রজাপতি! প্রজাপতি! গানটি রচনা করেছেন। কবি বিশ্ব জগতকে শিশুমন দিয়ে দেখে, পর্যবেক্ষণ করে গভীরভাবে অনুভব করেছেন। যার মধ্যে রয়েছে নানা ধরনের গাছপালা, পশুপাখি, কীটপতঙ্গ। আছে লাল, নীল, সোনালী, রূপালী রঙ এর প্রজাপতি। যারা পাখা মেলে বনে বনে, পাতায় পাতায়, ফুলে ফুলে উড়ে বেড়ায়। ফুল থেকে মধু আহরণ করে ও মধু খায়। প্রজাপতির সাথে শিশুমন সবসময় উড়ে বেড়াতে চায়। বন্দী জীবন উপেক্ষা করে মুক্ত ভাবে ঘুরে বেড়াতে আগ্রহ প্রকাশ করে। মনের আনন্দে প্রজাপতি যেমন রকমারী রঙের পাখা মেলে নেচে বেড়ায় কবির শিশুমনও তেমন নানা রঙের সঙ্গে একমত হতে চায়। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে কমল দাশগুপ্তের সুরে গানটি কাহারবা তালে (৪+৪ = ৮ মাত্রা, ধা গে না তি । না ক ধি না । ধা) বিন্যাস করা হয়েছে।

ছড়া গান

কথা: কাজী নজরুল ইসলাম

সুর: কমল দাশগুপ্ত

তাল: কাহার্‌বা

প্রজাপতি! প্রজাপতি!
কোথায় পেলে ভাই এমন রঙিন পাখা,
টুকটুকে লাল-নীল ঝিলি-মিলি আঁকা-বাঁকা।।
তুমি টুল টুলে বন-ফুলে মধু খাও
মোর বন্ধু হয়ে সেই মধু দাও
ওই পাখা দাও সোনালী-রুপালি পরাগ মাখা।।
মোর মন যেতে চায় না পাঠশালাতে
প্রজাপতি! তুমি নিয়ে যাও সাথী করে
তোমার সাথে।
তুমি হাওয়ায় নেচে নেচে যাও
আর তোমার মত মোরে আনন্দ দাও
এই জামা ভাল লাগে না
দাও জামা ছবি-আঁকা।।

II সা গা -া মা | পা -া -া -া I পা ধা -া না | ⁿপা -া -া -া I
প্র জা ০ প | তি ০ ০ ০ প্র জা ০ প | তি ০ ০ ০

I { সা রা -া রা | রা -া রা -গা I মা ধা পা মা | গা -রা সা -ন্া I
কো থা য়্ পে | লে ০ ভা ই এ ম ন র | ঙী ন্ পা ০

I সা -া -া -া | -া -া -া -া } I সা গা -া সা | { গা -মা পা -া I
খা ০ ০ ০ | ০ ০ ০ ০ টুক্ টু ০ কে | লা ল্ নী ল্

I পা ণা ধা পা | মা -গা সা রা I গা -া -া -া | (সা গা -া -ন্া)} I
ঝি লি মি লি | আঁ ০ কা বাঁ কা ০ ০ ০ | টুক্ টু ০ কে

I সা রা -া রা | রা -া রা -গা I মা ধা পা মা | গা -রা সা -ন্া I
কো থা য় পে | লে ০ ভা ই এ ম ন র | ঙী ন্ পা ০

I সা -া -া -া | -া -া -া -া II
খা ০ ০ ০ | ০ ০ ০ ০

গা মা II পা ধা গা মা | পা ধা গা মা I পা হ্মা পা -া | -া -া পা -সা I
তু মি টু ল টু লে | ব ন ফু লে ম ধু খা ও | ০ ০ মো র্

I সা -রা রা রা | রা -া গা -মা I রা মা গা -া | -া সা -া রা I
ব ন্ ধু হ | য়ে ০ সে ই ম ধু দা ও | ০ ম ০ ধু

I গা -া -া -া | -া -া (গা মা)} I ᵍপা -া I {পা -ধা না -র্সা | না -া -া -া I
দা ও ০ ০ | ০ ০ তু মি ও ই পা ০ খা ০ | দা ০ ০ ও

[–গা –রা –সা]
I না র্সা র্সনা –ধা | ধা না নধা –পা I পা ণা ধা পা | মা (–পা গা –মা)}I
সো না লী ০ | রূ পা লী ০ প রা গ মা | খা ০ ও ই

I সা রা –া রা | রা –া রা –গা I মা ধা পা মা | গা –রা সা –ন্া I
কো থা য় পে | লে ০ ভা ই এ ম ন র | ঙী ন্ পা ০

I সা –া –া –া | –া –া –া –া II
খা ০ ০ ০ | ০ ০ ০ ০

পা –গা II পা –মা পা হ্মা | পা –া পা গা I গা –মা পা হ্মা | পা –া –া –া I
মো র ম ন্ যে তে | চা য় না ০ পা ঠ্ শা লা | তে ০ ০ ০

I নর্সা নর্সা –না ধা | পা –া মা গা I মা পা পা –া | গা –মা পা হ্মা I
প্র জা০ ০ প | তি ০ তু মি নি য়ে যা ও | সা ০ থী ক

I পা –া –া –া | হ্মাপা গা –া মা I গা –া –সা –রা | গা গা –মগা রা I
রে ০ ০ ০ | তো০ মা র্ সা থে ০ ০ ০ | প্র জা ০০ প

I সা –া –া –া | –া –া পা পা I {ধা –র্রা র্সা –া | না র্সা ধা না I
তি ০ ০ ০ | ০ ০ তু মি হা ও য়া য় | নে চে নে চে

I না –া –পা –া –া –া পা –া I ধণা ণা –ণা ধা | ণা –া র্সা র্রা I
যা ০ ০ ও ০ ০ আ র্ তো০ মা র্ ম | ত ০ মো রে

I র্সাঃ ণঃ –া ধা | পা –া (পা পা)} I সা –া I{সা –রা রা –া | গা মা পা মা I
আ ন ন্ দ | দা ও তু মি এ ই জা ০ মা ০ | ভা ল লা গে

I গরা –গা –া –া | –া –া মা –গা I মা –পা পা –া | –া –া –া –া I
না০ ০ ০ ০ | ০ ০ দা ও জা ০ মা ০ | ০ ০ ০ ০

[রা সা]
০ ০
I পা –ণা ধা পা | মা –গা (রা সা)} I সা রা –া রা | রা –া রা –গা I
ছ ০ বি আঁ | কা ০ এ ই কো থা য়্ | পে লে০ ভা ই

I মা ধা পা মা | গা –রা সা –ন্‌া I সা –া –া –া | –া –া –া –া II II
এ ম ন র | ঙী ন্ পা ০ খা ০ ০ ০ | ০ ০ ০ ০

ছড়া গান: আমরা সবাই রাজা

কথা: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সুর: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কাব্যগীতি সুধায় বিশ্বব্যাপী সুপরিচিত একটি নাম–সে হলো রবীন্দ্রনাথ। সাহিত্যে এমন কোন দিক নাই যেখানে রবীন্দ্রনাথ স্পর্শ করেন নাই। তাঁর স্পর্শে স্বমহিমায় চিরভাস্বর হয়েছে কবিতা, গল্প, নাটক, গান, চিত্রশিল্প ইত্যাদি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পূজা, স্বদেশ, প্রেম ও প্রকৃতিসহ বিভিন্ন পর্যায়ের গান রচনা করেছেন। তাঁর স্বদেশ পর্যায়ের এই গানটিতে শিশু মনের স্বাধীনতার কথা বলা হয়েছে। ছোট-বড় ভেদাভেদের কথা ভুলে গিয়ে একই সূত্রে সবাইকে গাঁথা হয়েছে এখানে। দাস দাসত্বের ঊর্ধ্বে সকলকে একই মন্ত্রে দীক্ষিত করার প্রয়াস পেয়েছে গানটিতে। রাজাপ্রজা, ধনি-দরিদ্র, উঁচু-নিচু ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে সকলকে সমমানের মনে করেছেন। যার যার নিজস্ব ঢং-এ আলাদা ব্যক্তি সত্ত্বার গুরুত্ব দিয়ে রচিত হয়েছে গানটি।

দ্রুত দাদরা তালে গানটি গাওয়া হয়েছে। প্রতি মাত্রায় বাঁয়াতে একটি করে আঘাত দিয়ে গানটির তাল রাখা হয়। গানটি গাইবার সময় উচ্চারণের প্রতি বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। রাজত্বে, স্বত্বে, দাসত্বে, অসত্বে ও আবর্তে ঠিক উচ্চারণ করতে হবে। এ শব্দগুলো উচ্চারণে জিহ্বার মাথায় জোর দিতে হবে। বাঁধা বলার সময় চন্দ্রবিন্দুর ঠিক উচ্চারণ করবে। এই গানের মধ্য দিয়ে সকলের সমঅধিকারের কথা বলা হয়েছে। সঠিক উচ্চারণে গাইলে গানের ভাবটিও যথাযথভাবে ফুটে উঠবে।

ছড় গা

কথা ও সুরঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

তালঃ দাদরা

আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে–
নইলে মোদের রাজার সনে মিলব কী স্বত্বে?
আমরা যা খুশি তাই করি,
তবু তাঁর খুশিতেই চরি,
আমরা নই বাঁধা নই দাসের রাজার ত্রাসের দাসত্বে–
নইলে মোদের রাজার সনে মিলব কী স্বত্বে?
রাজা সবারে দেন মান,
সে মান আপনি ফিরে পান,
মোদের খাটো ক'রে রাখে নি কেউ কোনো অসত্যে–
নইলে মোদের রাজার সনে মিলব কী স্বত্বে?
আমরা চলব আপন মতে,
শেষে মিলব তাঁরি পথে,
মোরা মরব না কেউ বিফলতার বিষম আবর্তে–
নইলে মোদের রাজার সনে মিলব কী স্বত্বে?

সা –া সা II র্সা র্সা –া | না না –া I ধা ধা –া | পা পা –া I
আ ম্ রা স বা ই রা জা ০ আ মা ০ দের্ এ ই

I ধা ধা –া | পা গা –া I পা –া –া | –া –া –া I
রা জা র্ রা জ ত্বে ০ ০ ০ ০ ০

I ধা –া ধা | পা পা –া I গা গা –া | রা সা –রা I
ন ই লে মো দে র রা জা র্ স নে ০

I গা –া মা | গা রা –া I সা –া –া | সা –া রা I
মি ল ব কী স্ব ০ ত্বে ০ ০ আ ম্ রা

I গা গা –া | রা সা –া ‖ I –া –া –া | সা –া রা II
স বা ই রা জা ০ ০ ০ ০ "আ ম্ রা"

II –া –া –া |{ পা –া পা I পা –া গা | পা পা –ধা I
০ ০ ০ আ ম্ রা যা ০ খু শি তা ই

I ধর্সা র্সা –া | র্সা র্সা –া I র্সা –র্গা র্গা | র্রা র্রা –া I
ক০ রি ০ ত বু ০ তাঁ র্ খু শি তে ই

I র্সা র্সা –া } | র্সা –া সা I সর্গা –া র্গা | র্রা র্রা –া I
চ রি ০ আ ম্ রা নই ০ বাঁ ধা ন ই

I র্সা র্সা –া | না না –া I ধা ধা –া | পা গা –া I
দা সে র্ রা জা র্ ত্রা সে র দা স ০

I পা –া –া | –া –া –া I ধা –া ধা | পা পা –া I
ত্বে ০ ০ ০ ০ ০ ন ই লে মো দে র্

I পা –া –া | –া –া –া I ধা –া ধা | পা পা –া I

তে ০ ০ ০ ০ ০ ন ই লে মো দে র্

I গা গা –া | রা সা –রা I গা –া মা | গা রা –া I

রা জা র্ স নে ০ মি ল্ ব কি ০

I সা –া –া | সা –া রা I গা গা –া | রা সা –া I

ত্বে ০ ০ আ ম্ রা স বা ই রা জা ০

I –া –া –া | সা –া সা II II

০ ০ ০ "আ ম্ রা"

I গা –া –া | গা গা –া I গপা পা –া | হ্মা পা –া I

পা ০ ন্ মো দে র্ খা০ টো ০ ক রে ০

I হ্মা পা –া | হ্মা পা –া I না না –া | ধা পা –হ্মা I

রা খে ০ নি কে উ কো নো ০ অ স ত্

I গা –া –া | –া –া –া I ধা –া ধা | পা পা –া I

তে ০ ০ ০ ০ ০ ন ই লে মো দে র্

I গা গা –া | রা সা –রা I গা –া মা | গা রা –া I

রা জা র্ স নে ০ মি ল্ ব কি ০

I সা –া –া | সা –া রা I গা গা –া | রা সা –া I

ত্বে ০ ০ আ ম্ রা স বা ই রা জা ০

II –া –া –া |{ পা –া পা I পা –া গা | পা পা –ধা I
০ ০ ০ আ ম্ রা চ ল্ ব আ প ন্

I ধর্সা র্সা –া | র্সা র্সা –া I র্সর্গা –া র্গা | র্রা র্রা –া I
ম০ তে ০ শে ষে ০ মি ল্ ব তাঁ রি ০

I র্সা র্সা –া } | র্সা র্সা –া I র্গা –া র্গা | র্রা র্রা –া I
প থে ০ মো রা ০ ম র্ ব না কে উ

I র্সা র্সা –া | না না –া I ধা ধা –া | পা গা –া I
বি ফ ০ ল তা র্ বি ষ ম্ আ ব র্

I পা –া –া | –া –া –া I ধা –া ধা | পা পা –া I
তে ০ ০ ০ ০ ০ ন ই লে মো দে র্

I গা গা –া | রা সা –রা I গা –া মা | গা রা –া I
রা জা র্ স নে ০ মি ল্ ব কি ০

I সা –া –া | সা –া রা I গা গা –া | রা সা –া I
ত্বে ০ ০ আ ম্ রা স বা ই রা জা ০

I –া –া –া | সা –া সা II II
০ ০ ০ ‘‘আ ম্ রা’’

বিশ্বসংগীত: আমরা করব জয়

বাংলায় শিশুদের উপযোগী বা শিশুকেন্দ্রিক অনেক গান আছে যার দ্বারা সকল বয়সের মানুষ উদ্বুদ্ধ হয়। তেমনি পৃথিবীর শিশুদের উদ্বুদ্ধ করার জন্য একটি গান বহুল প্রচলিত, যে গানে বিশ্বের সকল ভাষাভাষির শিশুরা অনুপ্রাণিত হয় এবং যে গানের বাংলা হলো "আমরা করব জয়"। গানটি আফ্রিকান কৃতদাসের মধ্যে প্রচলিত ছিল। পিট সিগার গানটি পুনর্বার Compose করেন। বঙ্গানুবাদ করেন হেমাঙ্গ বিশ্বাস। বিশ্বায়নের এই যুগে সমগ্র পৃথিবীটা যেন একই সূত্রে গাঁথা এবং এই পৃথিবীর সকল শিশুই যেন এক এবং অভিন্ন। তারা একত্র হয়ে তাদের সমস্ত বাধা বিপত্তি অতিক্রম করার চেষ্টা করবে। তারা এখন আর একা নয় কোন কিছুতেই যেন তারা ভয় পায় না। সবকিছুই যেন তারা একদিন অতিক্রম করবে। শিশুদের একাত্ম হতে উদ্বুদ্ধ করে এই গানটি রচিত। এতে শিশুর স্বদেশ ভূমিই নয় সমগ্র পৃথিবীর শিশুদের সাথে তাদের আত্মিক মিলের সুযোগ আছে। মূল বিশ্বসংগীতের (We shall overcome) ধারা বজায় রেখে গানটি গাওয়া হয়। গানটি বাংলায় কাহারবা তালে ধীর লয়ে গাওয়া হয়েছে।

বিশ্বস

আমরা করব জয়

আমরা করব জয় একদিন

ওহো বুকের গভীরে আমরা জেনেছি

যে আমরা করব জয় একদিন ॥

আমরা নই একা

আমরা নই একা আজকে

ওহো বুকের গভীরে আমরা জেনেছি

যে আমরা করব জয় একদিন ॥

আমাদের নেই কোন ভয়

আমাদের নেই কোনো ভয় আজকে

ওহো বুকের গভীরে আমরা জেনেছি

যে আমরা করব জয় একদিন ॥

II {পা পা ধা ধা | পা –াঃ –মঃ –গা I পা পা ধা ধা | পা –াঃ –মঃ –গা I

আম্ রা কর বো | জ ০ ০ য় আম্ রা কর বো জ ০ ০ য়

I পা পা ধা না | র্সা –া র্রা –া I না –া –ধা –নধা | –পা –া ধা না I

আম্ রা কর বো | জ য় এ ক্ দি ০ ০ ০০ ০ ন ও হো

| র্সা র্সা | পা –া –া –া I ধা ধা পা মা | গা –া –া মা I

বু কের্ গ ভী | রে ০ ০ ০ আম্ রা জে নে ছি ০ ০ যে

I পা পা রা মা | গা –া রা –গরা I সা –া –া –া | –া –া –া –া }II

আম রা কর্ ব | জ য় এ ০ক্ দি ০ ০ ০ ০ ০ ০ ন্

II পা পা ধা ধা | পা –াঃ মঃ –গা I পা পা ধা ধা পা –াঃ মঃ –গা I

আম্ রা নই এ | কা ০ ০ ০ আম্ রা নই এ কা ০ ০ ০

I পা পা ধা না | র্সা –া র্রা –া I না –া –ধা –নধা | –পা –া ধা না I

আম্ রা নই এ | কা ০ আ জ্ কে ০ ০ ০০ ০ ০ ও হো

I র্সা র্সা না ধা | পা –া –া –া I ধা ধা পা মা | গা –া –া মা I

বু কের্ গ ভী | রে ০ ০ ০ আম রা জে নে ছি ০ ০ যে

I পা পা রা মা | গা –া রা –গরা I সা –া –া –া | –া –া –া –া II

আম্ রা কর্ ব | জ য় এ ০ক্ দি ০ ০ ০ ০ ০ ০ ন্

II পপা –পা ধা ধধা | পা –াঃ –মঃ –গা I পপা –পা ধা ধধা | পা –াঃ –মঃ –গা I

আমা দের নেই কোন | ভ ০ ০ য় আমা দের নেই কোন ভ ০ ০ য়

I পপা –পা ধা ননা | র্সা –া র্রা –া I না –া –ধা –নধা | –পা –া ধা না I

আমা দের নেই কোন | ভ য় আ জ কে ০ ০ ০০ ০ ০ ও হো

I র্সা র্সা না ধা | পা -া -া -া I ধা ধা পা মা | গা -া -া মা I
বু কের্ গ ভী রে ০ ০ ০ আম্ রা জে নে ছি ০ ০ যে

I পা পা রা মা | গা -া রা -গরা I সা -া -া -া | -া -া -া -া II II
আম্ রা কর্ ব জ য়্ এ ০ক্ দি ০ ০ ০ ০ ০ ০ ন্

একুশে ফেব্রু

কথাঃ আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী
সুরঃ শহীদ আলতাফ
মাহমুদ

একুশে ফেব্রুয়ারি সম্পর্কে আমাদের সবারই কিছু ধারণা আছে। এই দিনটি মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালিত হয়।

আমাদের জাতীয় জীবনে একুশে ফেব্রুয়ারি একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দিন। মাতৃভাষা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে ঊনিশশো বাহান্ন সালের এই দিনে বরকত, সালাম, রফিক, জব্বার-রা ঢাকার রাজপথে বুকের রক্ত ঢেলে দিয়েছিলেন। তাঁদের সেই আত্মত্যাগেই বাংলাভাষা রাষ্ট্রভাষার সম্মান আদায় করে নিতে পেরেছিল। সেদিনের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের শহীদদের দেশপ্রেম ও তার চেতনাই আমাদের এগিয়ে নিয়ে গেছে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের দিকে। পেয়েছি স্বাধীন বাংলাদেশ। বাংলাভাষাপ্রেমী ভাইদের রক্তে রাঙা এই একুশে ফেব্রুয়ারি প্রতি বছর আমাদের কাছে নতুন হয়ে ফিরে আসে স্বজন হারানোর শোক বহন করে। মাতৃভাষার প্রতি ভালোবাসার অমর স্মৃতি হয়ে একুশে ফেব্রুয়ারি চিরভাস্বর হয়ে থাকবে। 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো' গানটি আমাদের খুব পরিচিত ও জনপ্রিয়।

মাতৃভাষার আকূতি নিয়ে আরো অনেক জনপ্রিয় গান আছে। 'মোদের গরব মোদের আশা, আ-মরি বাংলাভাষা', 'ওরা আমার মুখের ভাষা কাইড়া নিতে চায়,' 'ও বাঙ্গালি, তোরা ঢাকা শহর রক্তে ভাসাইলি' এ গানগুলো খুব উল্লেখযোগ্য। একুশে ফেব্রুয়ারি এখন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস রূপে স্বীকৃতি পেয়েছে। এর ফলে 'একুশে'র গুরুত্ব ও ব্যাপ্তি বেড়েছে অনেক। ভাষাপ্রেমীদের আত্মাহুতির ধারায় বিশ্বের সব মাতৃভাষার স্বীকৃতি বাঙ্গালির জন্য এক অপূর্ব গৌরব বয়ে এনেছে আবদুল গাফ্ফার চৌধুরীর একটি কবিতার কয়েকটি ছত্র নিয়ে রচিত এই গান। কবিতাটির আরো কিছুটা অংশ সুরে গাওয়া হয়। তবে এখানে যে ক'টি চরণ আছে, একুশে ফেব্রুয়ারির প্রভাত ফেরী ও বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সেটুকুই ফিরে ফিরে গাওয়া হয়। এ গানে সুর দিয়েছিলেন আলতাফ মাহমুদ। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় হানাদার বাহিনীর নির্যাতনে তিনি শাহাদাত বরণ করেন। আমাদের জাতীয় সংগ্রামের সঙ্গে সম্পৃক্ত এই গানটি প্রতিটি দেশবাসীর জানা প্রয়োজন। এই গানের বাণী ও সুরের বেদনায় প্লাবিত হয় একুশে ফেব্রুয়ারি। সুরের গতি ধীর ও সরল। উদারা সপ্তকের নি্, ধা্ আর পা্ স্বর এই গানে গাম্ভীর্য এনেছে। শেষ ছত্রের 'আমি কি ভুলিতে পারি' কথাটি বেদনার তীব্রতায় ভরে উঠেছে তারা সপ্তকের 'র্সা' স্বর প্রয়োগে গানটি ৩+৩=৬ মাত্রা দাদরা তালে নিবদ্ধ। তবে তালটি ধীর ভাবে গানের চলনে মিশে থাকে, বেদনার মূল ভাবটিকে ছাপিয়ে যায় না। 'ধন ধান্য পুষ্প ভরা' গানটির মতো এ গানটিতেও বেশির ভাগ সময় শুধু তাল রাখার জন্য বাঁয়াতে একটি করে আঘাত করা হয় 'ফেব্রুয়ারি' উচ্চারণে ইংরেজি 'F'- এর উচ্চারণ

বজায় রাখা হয়। 'রাঙানো' শব্দটিতে 'রাংগানো' না বলে 'ঙ' উচ্চারণ করতে হবে। গানের বাণিতে 'ঙ', 'ছ', 'ড়' ধ্বনিগুলো রয়েছে–এসব ধ্বনি উচ্চারণে সতর্ক থাকা প্রয়োজন। সর্বসাধারণের প্রিয় এই গানটি শুদ্ধ উচ্চারণে মূল ভাব বজায় রেখে গাইতে হবে।

একুশে ফেব্রু

কথা: আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী

সুর: শহীদ আলতাফ মাহমুদ

তাল: দাদরা

আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি

আমি কি ভুলিতে পারি।।

ছেলে হারা শত মায়ের অশ্রু গড়া এ ফেব্রুয়ারি

আমি কি ভুলিতে পারি।।

আমার সোনার দেশের রক্তে রাঙানো ফেব্রুয়ারি

আমি কি ভুলিতে পারি।।

II {^সগা গা -া | গা গা -া I গা -মরা রসা | সধ্া ধ্প্া প্া I
আ মা র | ভাই য়ে র র ০ক্ তে০ | রা০ ঙা০ নো

I প্া প্রা রা | রা -া গরসা I রগা গা -া | -া -া -া I
এ কু০ শে | ফে ব রু০০ য়া০ রি ০ | ০ ০ ০

I প্া প্গা গরা | রা রা গা I রসা -া -া | সা -া -া }II
আ মি০ কি০ | ভু লি তে০ পা০ ০ ০ | রি ০ ০

II{রমা মা মা | মা মা মা I মপা পধাঃ -গঃ | গা -া গা I
ছে০ লে হা | রা শ ত মা০ য়ে০ র্ | অ শ্ রু

I গা গমা রা | রা -া সন্া I ন্রা রা -া | -া -া -া I
গ ড়া০ এ | ফে ব রু০ য়া০ রি ০ | ০ ০ ০

I প্া প্গা গরা | রা রা রগা I রসা -া -া | সা -া -া }II
আ মি০ কি০ | ভু লি তে০ পা০ ০ ০ | রি ০ ০

II গপা পা -া | পধা পা -া I পধা পা -া | পধা -গা গা I
আ০ মা র | সো০ না র দে০ শে র্ | র০ ক্ তে

I মধা ধা ধা | ধা -া নধপা I ধনা না -া | -া -া -া I
রা০ ঙা নো | ফে ব রু০০ য়া০ রি ০ | ০ ০ ০

I না না না | না নর্সা ধা I নর্সা র্সা -া | -া -া -া II II
আ মি কি | ভু লি০ তে পা০ রি ০ | ০ ০ ০

জাতীয়

কথা ও সুর: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বাংলাদেশের স্বাধীনতা–পূর্বকালে অর্থাৎ তদানীন্তন পূর্ব–পাকিস্তানে 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি' গানটি নানা কারণেই বাঙালির কাছে খুব আদৃত হয়েছিল। ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে দেশপ্রেম ও গণজাগরণমূলক সভা–সমাবেশ ও মিছিলে বাঙালি কন্ঠে তুলে নিয়েছিল এই গান। রবীন্দ্রনাথের এই গানটিতে বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বর্ণনার পাশাপাশি রয়েছে সেই অপূর্ব রূপময়তায় বাঙালির মুগ্ধতা ও দেশপ্রেমের এক আবেগঘন প্রকাশ। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে এ গানেই বাঙালি তার চেতনার ভাষা খুঁজে পেয়েছিল, পেয়েছিল স্বদেশ–মুক্তির প্রেরণা। স্বাধীন বাংলাদেশে তাই এই গানটি জাতীয় সংগীত হিসেবে গৃহীত হলো। সুরের ক্ষেত্রে একটি বৈশিষ্ট্য খুব সহজেই এখানে লক্ষ করা যায়। শিলাইদহ এলাকার ডাকঘরের গগন হরকরা বাউল গানের সুরে 'আমি কোথায় পাব তারে/আমার মনের মানুষ যে রে' গানটি গেয়ে চিঠি বিলি করতেন। বাউলের এই সহজ সুরে মুগ্ধ হলেন রবীন্দ্রনাথ। সুরের এই আদর্শকে তিনি গ্রহণ করলেন তাঁর দেশাত্মবোধক গানটিতে।

বাংলার প্রকৃতি ও মানবমনের নিবিড় সম্পর্কটি বাউলের সুরে যেন চিত্ররূপময়তা পেয়েছে। স্বদেশ পর্যায়ের গানকে আবহমান সংগীতে গেঁথে দেবার মধ্যে যে এক ধরণের গভীর লোকসংলগ্নতার মাত্রা থাকে, সেটি এখানে উপলব্ধি করা যায়। সযত্ন শ্রদ্ধায় জাতীয় সংগীত গাইতে হয়, শিক্ষার্থীদের এ বিষয়ে বুঝিয়ে বলতে হবে। স্বরলিপি অনুযায়ী গানটি একটানা গেয়ে শেষ করতে হবে। ইচ্ছা অনুযায়ী কোনো লাইন দু'বার গাওয়া যাবে না। স্বরলিপিতে যেখানে দু'বার গাইবার নির্দেশ আছে, শুধু সেটুকুই দু'বার গাইতে হবে। জাতীয় সংগীতে বাণী ভুল করা একেবারেই অনুচিত। তাই এই গানটি প্রথমেই মুখস্থ করে নিতে হবে।

উচ্চারণের ক্ষেত্রে বিশেষ যত্নবান হতে হবে। 'বাঁশি' 'আঁচল' শব্দের চন্দ্রবিন্দুর উচ্চারণ, 'ফাগুনের' 'ফ' এবং 'দেখেছি', বিছায়েছ' বলতে 'ছ'–য়ের উচ্চারণে সর্তক থাকতে হবে। এসব শব্দ উচ্চারণের বিষয়টি আগেও অন্যান্য গানের প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে।

৩ + ৩ = ৬ মাত্রার দাদরা তালে গানটি নিবদ্ধ। এর লয় হবে মধ্য, অর্থাৎ খুব ঢিমা বা বেশি দ্রুত হবে না। সঠিক লয়ে গীত হলেই গানের সৌন্দর্যটি প্রকাশ পাবে। বাউল সুরের গান বলে এর সঙ্গে ব্যবহার করা উচিত।

জাতীয়

কথা ও সুরঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সুরঃ গগন হরকরার গান অবলম্বনে

তালঃ দাদরা

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস, আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি।
ওমা, ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে,
মরি হায়, হায়রে–
ওমা, অঘ্রানে তোর ভরা ক্ষেতে কী দেখেছি
আমি কি দেখেছি মধুর হাসি ॥
কী শোভা, কী ছায়া গো, কী স্নেহ কী মায়া গো
কী আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে, নদীর কূলে কূলে।
মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো,
মরি হায়, হায়রে–
মা, তোর বদন খানি মলিন হলে,
ওমা, আমি নয়ন জলে ভাসি ॥

মা পা II গা মা –গমগা | রা –সা –রসা I ^{স}ণ্া –ধ্া –া | –া ধ্া ণ্া I
আ মার্ সো না ০০র্ | বা ০ ০ঙ লা ০ ০ | ০ আ মি

I সা সরা –গমা | –গমগা রসা রসা I ণ্া সা –া | –রা –া $^{–রগ}$রা I
তো মা০ ০০ | ০০য় ভা০ লো০ বা সি ০ | ০ ০ ০

I –সা –া সা | সা সা –া I রমা মা –া | পা পা –া I
০ ০ চি | র দি ন্ তো০ মা র্ | আ কা ০

I –া –া সা | সা সা –া I রমা মা –া | পা পা –মা I
০ শ্ চি | র দি ন্ তো০ মা র্ | আ কা শ্

I পা পা –ধণা | ধা পা –মা I পা পা –ধণা | ^{প}ধা পা –া I
তো মা ০র্ | বা তা স আ মা ০র্ | প্রা ণে ০

I –া –া –া | –া ^{প}র্সা র্সর্রা I ^{ণ}র্সা ণা –া | ধা পা –ধা I
০ ০ ০ | ০ ও মা০ আ মা র্ | প্রা ণে ০

I মপা ^{ম}গা –া | মা গমা –পা II
বা০ জা য় | বাঁ শি০ ০

–া –া মা গা II {(মা ধা –া | ধা ধা –না I র্সা র্সা –র্রর্গা | র্রা র্সা –র্রর্সা I
০ ০ ও মা ফা গু ০ | নে তো র্ আ মে ০র্ | ব নে ০০

I না র্সা নধা | –া ধা না I না র্সা –া | –র্রা –র্সর্রর্গা –র্রা I
ঘ্রা ণে ০০ | ০ পা গল্ ক রে ০ | ০ ০০০ ০

|-সা -া -া | -া না না | না -া -া | র্সা -া -া |
০ ০ ০ | ০ ম রি হা ০ ০ | ০ ০ য়্

|নর্সা -নর্রা র্সা | ণা ধা -পমা} | না না | না -র্সা র্সা | র্সা র্সা -রা |
হা০ ০য়্ রে | ও মা ০০ ও মা অ ০ ঘ্রা ণে তো র্

|ণর্সা ণা -া | ধা পা -মা | পা -ণা ণা | ধা পা -া |
ভ০ রা ০ | ক্ষে তে ০ কী০ ০ দে | খে ছি ০

|-া -া -া | -া র্সা -র্সর্রা | ণর্রা -া ণা | ধা পা ধা |
০ ০ ০ | ০ আ মি০ কী০ ০ দে | খে ছি ০

I মপা মগা -া | মা গমা -পা II
ম০ ধু র | হা সি০ ০

II -া -া সা | সা রসা -ণ্া I ণ্া -া সরা | সা ণ্ধ্া -া I
০ ০ কী | শো ভা০ ০ কী ০ ছা০ | য়া গো০ ০

I -া -া ধ্া | ধ্া ধ্া -ণ্া I সা -গা গা | গা গমা -পা I
০ ০ কী | স্নে হ ০ কী ০ মা | য়া গো০ ০

I -মপমা -গা গমা | গা রসা -রা I গা গা -া | মা পা -ধপা I
০০০ ০ কী০ | আঁ চ০ ল বি ছা ০ | য়ে ছ ০০

I মা গা -রসা | সা গা -া I গা মা -গা | রা সা -রসা I
ব টে ০র্ | মূ লে ০ ন দী র্ | কূ লে ০০

I ণ্া সা -া | -রা -সরগা -রা I -সা -া -া | -া মা গা I
কূ লে ০ | ০ ০০০ ০ ০ ০ ০ | ০ মা তোর্

I{ মা ধা -া | ধা ধা -না I র্সা র্সা -র্রর্গা | র্রা র্সা -র্রর্সা I
মু খে র্ | বা ণী ০ আ মা ০র | কা নে ০০

I না র্সা -নধা | -া ধা না I না র্সা -া | -র্রা -র্সর্রর্গা -র্রা I
লা গে ০০ | ০ সু ধার্ ম তো ০ | ০ ০০০ ০

I –র্সা –া –া | –া (না না I না –া –া | –র্সা –া –া I
০ ০ ০ | ০ ম রি হা ০ ০ | ০ ০ য়্

I নর্সা –নর্রা র্সা | ণা ধা –পমা)} I না না | না না র্সা | র্সা র্সা –র্রা I
হা০ ০য় রে | মা তো ০র্ মা তোর্ | ব দ ন্ | খা নি ০

I ণর্সা ণা –া | ধা পা –মা I পা পা –ধণা | ণধা পা –া I
ম০ লি ন্ | হ লে ০ আ মি ০০ | ন০ য় ০

I –া –া –া | –া র্সা র্সর্রা I ণর্সা ণা –া | ধা পা –ধা I
০ ০ ০ | ন্ ও মা০ আ০ মি ০ | ন য় ন্

I মপা মগা –া | মা গমা –পা II II
জ০ লে ০ | ভা সি০ ০

দেশাত্মবোধক গানঃ ধন ধান্য পুষ্প ভরা

কথা ও সুরঃ দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

বাংলা কাব্যগীতির ধারায় সুপরিচিত একটি নাম–কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। দেশাত্মবোধ, প্রেম ও হাস্যরস এ তিনটি ছিল তাঁর গানের তিন প্রধান বিষয়। তবে দেশাত্মবোধক গানে তাঁর কৃতিত্ব অবিস্মরণীয়।

'ধন ধান্য পুষ্প ভরা' কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের লেখা একটি বিখ্যাত দেশাত্মবোধক গান। এছাড়া 'বঙ্গ আমার! জননী আমার!' 'যেদিন সুনীল জলধি হইতে', 'আজি গো তোমার চরণে জননী', 'আবার তোরা মানুষ হ'-বাঙালির সুপরিচিত এই গানগুলোতেও তাঁর স্বদেশ প্রেমের উজ্জ্বল প্রকাশ ঘটেছে।

স্বাধীন বাংলাদেশে এই গানটি দেশের জাতীয়গীতি হিসেবে গৃহীত হয়েছে। গানটিতে জন্মধন্যতাবোধ, দেশের নিসর্গশোভা ও দেশগৌরবের কথা বর্ণিত হয়েছে। বাংলাদেশের অপরূপ প্রাকৃতিক দৃশ্য বাঙালির অন্তরকে প্রভাবিত করে। ফুল-ফল, স্নিগ্ধ নদী, ধূম্র পাহাড় ও মাঠ-ঘাটের রূপময়তায় এক সুন্দর স্বপ্নাবেশ সৃষ্টি হয়। প্রাণে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে গান 'সকল দেশের রানী সে যে আমার জন্মভূমি।' গানের শেষ কথাটি হলো, বাঙালির ঘরের মতো ভাইয়ের মায়ের এত স্নেহ পৃথিবীর আর কোথাও পাওয়া যায় না। গানটি গাইতে গাইতে জন্মভূমির প্রতি ভালোবাসায় অন্তর পূর্ণ হয়ে ওঠে। এখানেই গানের বৈশিষ্ট্য।

গীতিকার এবং সুরকার উভয় ক্ষেত্রেই দ্বিজেন্দ্রলাল রায় তাঁর প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। সুরের দিক থেকে 'ধন ধান্য পুষ্প ভরা' গানটি গুরুগম্ভীর। সুরের চলন, ছন্দ ও স্বরবিরামে পাশ্চাত্য সংগীতের ধীর ও উদাত্ত ভাব আছে। তবে তা রচিত হয়েছে ভারতীয় সংগীতের কেদারা ঠাটে। এতে বিকৃত স্বর আছে দুটি–কোমল নি (ণা) ও কড়ি মা (হ্মা)। তার সপ্তকের দুটি স্বর ব্যবহৃত হয়েছে–একটি 'র্সা', অপরটি 'র্রে'।

৩+৩ = ৬ মাত্রার এই গানটির গতি ধীর। সাধারণত প্রতি মাত্রায় টোকা না দিয়ে বাঁয়াতে একটি করে আঘাত দিয়ে গানের তাল রাখা হয়।

দীর্ঘ গানটির উচ্চারণে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। 'দেশ ' কে 'দ্যাশ' আর 'ধান্য' কে 'ধাইন্য' বা 'দাইন্য' বলা যাবে না। 'স্মৃতি' বলতে হবে 'সৃঁতি'। 'খুঁজে' শব্দটিতে চন্দ্রবিন্দু উচ্চারণ করতে হবে। 'ড'-য়ে শূণ্য 'ড়'-য়ের ক্ষেত্রে সচেতন হয়ে 'তড়িৎ' বা 'পাহাড়' উচ্চারণে জিভের পাতার উল্টো দিক দিয়ে উপরের মাড়িতে আঘাত করে 'ড়' বলতে হবে। 'ফুল' উচ্চারণে অবশ্যই দুটো ঠোঁট মিলিয়ে এই 'ফ' বলতে হবে।। 'চ', 'ছ', 'জ', 'য' উচ্চারণের সময়ে জিভ দিয়ে উপরের দাঁতের মাড়ি ভালো করে চেপে বাতাসের পথ আটকে নিতে হবে প্রথমে। এছাড়া গানটিতে 'ধ', 'ভ', 'ঝ', 'ঢ' মহাপ্রাণ ধ্বনিগুলো আছে। এগুলো যেন কিছুতেই 'দ', 'ব', 'জ', 'ড'-য়ের মতো না শোনায়। 'বক্ষে' উচ্চারণ হবে 'বোক্খে'।

দেশাত্মবোধক গান

কথা ও সুর: দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

তাল: দাদরা

ধন ধান্য পুষ্প ভরা, আমাদের এই বসুন্ধরা
তাহার মাঝে আছে দেশ এক সকল দেশের সেরা
ও সে স্বপ্ন দিয়ে তৈরি সে দেশ স্মৃতি দিয়ে ঘেরা
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি
ও সে, সকল দেশের রানী সে যে আমার জন্মভূমি
সে যে আমার জন্মভূমি।

চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা, কোথায় উজল এমন ধারা
কোথায় এমন খেলে তড়িৎ এমন কালো মেঘে

ও তার পাখির ডাকে ঘুমিয়ে উঠে পাখির ডাকে জাগে
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি
ও সে, সকল দেশের রানী সে যে আমার জন্মভূমি
সে যে আমার জন্মভূমি।

এত স্নিগ্ধ নদী কাহার, কোথায় এমন ধূম্র পাহাড়
কোথায় এমন হরিত ক্ষেত্র আকাশ তলে মেশে
এমন ধানের উপর ঢেউ খেলে যায়
বাতাস কাহার দেশে
এমন দেশটি কোথায় খুঁজে পাবে নাকো তুমি
ও সে, সকল দেশের রানী সে যে আমার জন্মভূমি
সে যে আমার জন্মভূমি।

পুষ্পে পুষ্পে ভরা শাখি, কুঞ্জে কুঞ্জে গাহে পাখি
গুঞ্জরিয়া আসে অলি পুঞ্জে পুঞ্জে ধেয়ে
তারা ফুলের উপর ঘুমিয়ে পড়ে ফুলের মধু খেয়ে

এমন দেশটি কোথায় খুঁজে পাবে নাকো তুমি
ও সে, সকল দেশের রানী সে যে আমার জন্মভূমি
সে যে আমার জন্মভূমি।

ভায়ের মায়ের এত স্নেহ, কোথায় গেলে পাবে কেহ
ওমা তোমার চরণ দুটি বক্ষে আমার ধরি
আমার এই দেশেতে জন্ম যেন এই দেশেতে মরি
এমন দেশটি কোথায় খুঁজে পাবে নাকো তুমি
ও সে, সকর দেশের রানী সে যে আমার জন্মভূমি
সে যে আমার জন্মভূমি।

II সা সা –া | সমা –া মা I (স)মা –া মা | (গ)মা –া মা I
ধ ন ০ ধা০ ০ ন্য পু ০ ষ্প ভ ০ রা

I মা মগা –পা | পা পা –া I পা পা –া | (প)মা গা –া I
আ মা০ ০ দের্ এ ই ব সু ন্ ধ রা ০

I মা মা –া | ধা ধা –া I ধর্সা ণা –া | ধা পমা –গা I
তা হা র মা ঝে ০ আ০ ছে ০ দেশ্ এ০ ক্

I মা মা –া | ধা পা –ণা I ণা ধা –া | –া ধা ধা I
স ক ল দে শে র সে রা ০ ০ ও সে

I ধা র্সা র্সা | ণা ধা –া I পা –ধা পা | মা গা –া I
স্ব প্ ন দি য়ে ০ তৈ ০ রি সে দে শ্

I সা গা –া | মা পা –ধপা I মগা মা –া | –া –া –া I
স্মৃ তি ০ দি য়ে ০০ ঘে০ রা ০ ০ ০ ০

I ধর্সা র্সা –া | র্সা –া র্সা I র্সর্রা র্সাঃ ণঃ | ণা ধা –া I
এ০ ম ন্ দে শ্ টি কো০ থা ও খুঁ জে ০

I পধা পা –া | ধা পধা –ণা I ণা ণা –া | –া ণা ণা I
পা০ বে ০ না কো০ তু মি ০ ০ ও সে

I ণর্রা র্সা –া | ণা ধা –া I পা –ধা পা | মা গা –া I
স০ ক ল্ দে শে র্ রা ০ নী সে যে ০

I সা সগা -া | মা -র্মর্রা র্রা I র্রা র্রা -া | -া র্সর্রা র্সা I
আ মা০ র্ জ ০ন্ ম ভূ মি ০ ০ সে০ যে

I ণা ধা -ণা | পধা -ণা ণা I ণরা রা -া | -া রা গা I
আ মা র্ জ০ ন্ ম ভূ০ মি ০ ০ সে যে

I সা গা -া | মা -ধা পা I মগা মা -া | -া -া -া II
আ মা র্ জ ন্ ম ভূ০ মি ০ ০ ০ ০

II সা -া সা | সমা -া মা I মা মা -া | মা মা -া I
চ ০ ন্দ্র সূ র্ য গ্র হ ০ তা রা ০

I মা মগা -পা | পা পা -া I পা পা -া | ক্ষা ধপা -া I
কো থা০ য় উ জ ল্ এ ম ন্ ধ রা০ ০

I মা মা -া | ধা ধা -া I ধর্সা ণা -া | ধা পমা -গা I
কো থা য় এ ম ন্ খে০ লে ০ ত ড়ি০ ৎ

I মা মা -া | ধা পা -ণা I ণা ধা -া | -া ধা -া I
এ ম ন্ কা লো ০ মে ঘে ০ ০ ও তার্

I ধর্সা র্সা -া | ণা ধা -া I ধপা ধা পা | মা গা -া I
পা০ খি র ডা কে ০ ঘু০ মি য়ে উ ঠি ০

I সা গা -া | মা পা -ধপা I মগা মা -া | -া -া -া I
পা খি র ডা কে ০০ জে০ গে ০ ০ ০ ০

I ধর্সা র্সা -া | র্সা -া র্সা I র্সর্রা র্সাঃ ণঃ | ণা ধা -া I
এ০ ম ন্ দে শ্ টি কো০ থা ও খুঁ জে ০

I পধা পা -া | ধা পধা -ণা I ণা ণা -া | -া ণা ণা I
পা০ বে ০ না কো০ ০ তু মি ০ ০ ও সে

I ণর্রা র্সা -া | ণা ধা -া I পা -ধা পা | মা গা -া I
স০ ক ল্ দে শে র্ রা ০ নী সে যে ০

I সা সগা -া | মা -মর্রা র্রা I র্রা র্রা -া | -া র্সর্রা র্সা I
আ মা০ র্ জ ০ন্ ম ভূ মি ০ ০ সে০ যে

I ণা ধা -ণা | পধা -ণা ণা I ণরা রা -া | -া রা গা I
আ মা র্ জ০ ন্ ম ভূ০ মি ০ ০ সে যে

I সা গা -া | মা -ধা পা I মগা মা -া | -া -া -া II
আ মা র্ জ ন্ ম ভূ০ মি ০ ০ ০ ০

II সা -া সা | [স]মা -া মা I মা মা -া | মা মা -া I
এ ০ ত স্নি ০ গ্ধ ন দী ০ কা হা র

I মা মগা -পা | পা পা -া I পা -া পা | পহ্মা পা -া I
কো থা০ য়্ এ ম ন্ ধূ ০ ম্র পা০ হা ড়্

I মা মা -া | [ম]ধা ধা -া I ধর্সা ণা -া | ধা -া [প]মগা I
কো থা য়্ এ ম ন্ হ০ রি ত্ ক্ষে ০ ত্র০

I মা মা -া | ধা পা -ণা I ণা ধা -া | -া ধা ধা I
আ কা শ্ ত লে ০ মে শে ০ ০ এ মন্

I ধর্সা র্সা -া | ণা ধা -ণা I পা ধা পা | মা গা -া I
ধা নে র্ উ প র্ ঢে উ খে লে যা য়্

I সা গা -া | মা পা -ধপা I মগা মা -া | -া -া -া I
বা তা স্ কা হা ০র্ দে০ শে ০ ০ ০ ০

I ধর্সা র্সা -া | র্সা -া র্সা I র্সর্রা র্সাঃ ণঃ | ণা ধা -া I
এ০ ম ন্ দে শ্ টি কো০ থা ও খুঁ জে ০

I পধা পা -া | ধা পধা -ণা I ণা ণা -া | -া ণা ণা I
পা০ বে ০ না কো০ ০ তু মি ০ ০ ও সে

I ণর্রা র্সা -া | ণা ধা -া I পা -ধা পা | মা গা -া I
স০ ক ল্ দে শে র্ রা ০ ণী সে যে ০

I সা সগা -া | মা -মর্রা র্রা I র্রা র্রা -া | -া র্সর্রা র্সা I
আ মা০ র্ জ ০ন্ ম ভূ মি ০ ০ সে০ যে

I ণা ধা -ণা | পধা -ণা ণা I ণরা রা -া | -া রা গা I
আ মা র্ জ০ ন্ ম ভূ০ মি ০ ০ সে যে

I সা গা -া | মা -ধা পা I মগা মা -া | -া -া -া II
আ মা র্ জ ন্ ম ভূ০ মি ০ ০ ০ ০

II সা -া সা | (স)মা -া মা I মা মা -া | মা মা -া I
পু ষ্ পে | পু ষ্ পে ভ রা ০ শা খী ০

I মা -গা পা | পা -া পা I পা পা -া | পমা পা -া I
কু ন্ জে কু ন্ জে গা হে ০ পা০ খি ০

I (প)মা -া মা | ধা ধা -া I ধর্সা ণা -া | ধা পমা -গা I
গু ন্ জ রি য়া ০ আ০ সে ০ অ লি০ ০

I মা -া মা | ধা -পা ণা I ণা ধা -া | -া ধা ধা I
পু ন্ জে পু ন্ জে ধে য়ে ০ ০ তা রা

I (ধ)র্সা র্সা -া | ণা ধা -ণা I পা ধা পা | মা গা -া I
ফু লে র্ উ প র্ ঘু মি য়ে প ড়ে ০

I সা গা -া | মা পা -ধপা I মগা মা -া | -া -া -া I
ফু লে র্ ম ধু ০০ খে০ য়ে ০ ০ ০ ০

I ধর্সা র্সা -া | র্সা -া র্সা I র্সর্রা র্সাঃ ণঃ | ণা ধা -া I
এ০ ম ন্ দে শ্ টি কো০ থা ও খুঁ জে ০

I পধা পা -া | ধা পধা -ণা I ণা ণা -া | -া ণা ণা I
পা০ বে ০ না কো০ ০ তু মি ০ ০ ও সে

I ণর্রা র্সা -া | ণা ধা -া I পা -ধা পা | মা গা -া I
স০ ক ল্ দে শে র্ রা ০ নী সে যে ০

I সা সগা -া | মা -র্মর্রা র্রা I র্রা র্রা -া | -া র্সর্রা র্সা I
আ মা০ র্ জ ০ন্ ম ভূ মি ০ ০ সে০ যে

I ণা ধা -ণা | পধা -ণা ণা I ণরা রা -া | -া রা গা I
আ মা র্ জ০ ন্ ম ভূ০ মি ০ ০ সে যে

I সা গা -া | মা -ধা পা I মগা মা -া | -া -া -া II
আ মা র্ জ ন্ ম ভূ০ মি ০ ০ ০ ০

II সা -া সা | (স)মা -া মা I (স)মা মা -া | মা মা -া I
ভা য়ে র্ মা য়ে র্ এ ত ০ স্নে হ ০

I মা মগা -পা | পা পা -া I পা পা -া | পক্ষা ধপা -া I
কো থা০ য়্ গে লে ০ পা বে ০ কে০ হ০ ০

I মা মা -া | ধা ধা -া I ধর্সা ণা -া | ধা পমা -গা I
ও মা ০ তো মা র্ চ০ র ণ্ দু টি০ ০

I মা -া মা | ধা পা -ণা I ণা ধা -া | -া ধা ধা I
ব ০ ক্ষে আ মা র্ ধ রি ০ ০ আ মার্

I ধা -র্সা র্সা | ণা ধা -ণা I পা -ধা পা | মা গা -া I
এ ই দে শে তে ০ জ ন্ ম যে ন ০

I সা -া গা | মা পা -ধপা I মগা মা -া | -া -া -া I
এ ই দে শে তে ০০ ম০ রি, ০ ০ ০ ০

I ধর্সা র্সা –া | র্সা –া র্সা I র্সর্রা র্সাঃ ণঃ | ণা ধা –া I
এ০ ম ন্ দে শ্ টি কো০ থা ও খুঁ জে ০

I পধা পা –া | ধা পধা –ণা I ণা ণা –া | –া ণা ণা I
পা০ বে ০ না কো০ ০ তু মি ০ ০ ও সে

I ণর্রা র্সা –া | ণা ধা –া I পা –ধা পা | মা গা –া I
স০ ক ল দে শে র্ রা ০ ণী সে যে ০

I সা সগা –া | মা –মর্রা র্রা I র্রা র্রা –া | –া র্সর্রা র্সা I
আ মা০ র্ জ ০ন্ ম ভূ মি ০ ০ সে০ যে

I ণা ধা –ণা | পধা –ণা ণা I ণরা রা –া | –া রা গা I
আ মা র্ জ০ ন্ ম ভূ০ মি ০ ০ সে যে

I সা গা –া | মা –ধা পা I মগা মা –া | –া –া –া II I
আ মা র্ জ ন্ ম ভূ০ মি ০ ০ ০ ০

উদ্দীপনামূ : চল চ

কথা ও সুর: কাজী নজরুল ইসলাম

আমরা সবাই কাজী নজরুল ইসলামের গান শুনেছি। আমাদের দেশে নজরুল সংগীত ও রবীন্দ্র সংগীতের জনপ্রিয়তা ব্যাপক। বিভিন্ন ধরনের গান সৃষ্টি করেছেন কাজী নজরুল ইসলাম। দেশাত্মবোধক গানের ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছেন তিনি।

১৯২৮ সালে ঢাকা সফরকালে কবি 'চল্ চল্ চল্' গানটি রচনা করেন। ঐ বছর ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে ঢাকা মুসলিম সাহিত্য সমাজের দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনে সমবেত কণ্ঠের এই গানটি উদ্বোধন সংগীত হিসেবে গীত হয়। এই গানটি তারুণ্যের বন্দনায় উজ্জ্বল। মার্চের সুরে সৈনিকদের পা ফেলবার তালে তালে বাঁধা গানটিতে নবীনদের অগ্রযাত্রায় জীবনের জয়গান ধ্বনিত হয়েছে। একাত্তর সালে স্বাধীনতা অর্জনের পর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এই গানকে রণসংগীত হিসেবে গ্রহণ করেন।

এই গানের একটি ছত্রের দু'রকম পাঠ পাওয়া যায়। 'সজীব করিব মহাশ্মশান' আর 'সজীব করিব গোরস্থান' দু' রকমই কবি লিখেছেন।

কবি যেমন জাগরণ ও উদ্দীপনামূলক গান লিখেছেন, তেমনি আছে তাঁর শিশুদের উপযোগী গান। 'প্রজাপতি প্রজাপতি', 'মোমের পুতুল মমীর দেশের মেয়ে', 'লাল টুকটুকে বৌ যায় গো' - এ সব গান শিশুরা মনের আনন্দে গাইতে পারে। এ গানগুলো প্রাক-প্রাথমিক, প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে ক্লাসের শুরুতে অথবা ক্লাসের শেষে গাওয়ার ব্যবস্থা করা যায়। পুরো গানটি না গেয়ে প্রথম চারটি লাইন গেয়েও শিশুশিক্ষার্থীদের গাইতে উৎসাহিত করা যায়। পিটিআইতে অবশ্য শিক্ষার্থীরা পুরো গান শিখে নিবেন।

সহজ তালের এই গান দৃপ্তভঙ্গিতে গাইতে হবে। তরুণদের জয়যাত্রার গানটি গাইবার জন্যে উচ্চারণে বলিষ্ঠতা আর ছন্দের ঝোঁকে আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তোলার চেষ্টা থাকতে হবে। জাতীয় প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে সব বাধা-বিঘ্ন উপেক্ষা করে এগিয়ে চলবার শপথে পূর্ণ গানটির পদক্ষেপ।

উচ্চারণের ক্ষেত্রে সব সময়ই সচেতন থাকা প্রয়োজন। এই গানে কয়েকটি মহাপ্রাণ ধ্বনি আছে। যেমন- 'আঘাত', 'প্রভাত', 'বাধার বিন্ধ্যাচল', 'ভাঙরে ভাঙ' অংশগুলোর 'ঘ', 'ভ', 'ধ' ধ্বনিগুলো যেন কিছুতেই 'গ', 'ব', 'দ' বলা না হয়, সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে। 'মহাশ্মশান' শব্দের 'শ্ম' উচ্চারণে একই সঙ্গে নাক ও মুখ দিয়ে বাতাস বের করে 'শঁ' বলতে হবে। 'আহ্বান' শব্দটি বেশ কঠিন। উচ্চারণ করতে হবে 'আওভান'। 'ভ' উচ্চারিত হবে এখানে ইংরেজি 'v'- এর মতো।

এই গানটিতে তারা সপ্তকের 'র্সা', 'র্রে', 'র্গা' স্বর রয়েছে। আর আছে মুদারা সপ্তকের 'প্া', 'নি্ ', 'ধ্া'। বিকৃত স্বরের মধ্যে আছে কোমল নি (ণা), কোমল ধা (দা), কড়ি মা (হ্মা), কোমল রে (ঋা)। অর্থাৎ পাঁচটি বিকৃত স্বরের মধ্যে চারটি স্বরের সঙ্গেই শিক্ষার্থীর পরিচয় ঘটছে এই গানে।

শেখানো হয়ে গেলে, পিটিআইয়ের মাঠে শিক্ষার্থীরা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে তালে তালে পা ফেলে গানটি গাইতে পারে। প্রথমে সবাই এক জায়গায় দাঁড়িয়ে পুরো গানটি একবার গেয়ে তারপর মার্চ করে মাঠ পরিµমা করে গাইলে গানের ভেতরের বলিষ্ঠতাটি অনুভব করতে পারবেন। এতে তালটিও ভালোভাবে আয়ত্ত হবে। বিদ্যালয়ে শিশুদের ক্ষেত্রে গান গেয়ে মার্চ করার বিষয়টি আরো ফলপ্রসূ হবে।

৩+৩=৬ মাত্রার দাদরা তালে গানটি নিবদ্ধ। হাতে তালি দিয়ে তালের ঠেকা বলে দিলে তালটি শিক্ষার্থীরা সহজে বুঝতে পারবে।

উদ্দীপনামূলক গান

কথা ও সুরঃ কাজী নজরুল ইসলাম

তালঃ দাদরা

চল্ চল্ চল্ উর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল

নিম্নে উতলা ধরণী তল

অরুণ প্রাতের তরুণ দল

চল্‌রে চল্‌রে চল্ ॥

ঊষার দুয়ারে হানি আঘাত

আমরা আনিব রাঙা প্রভাত

আমরা টুটাব তিমির রাত, বাধার বিন্ধ্যাচল

নব নবীনের গাহিয়া গান

সজীব করিব মহাশ্মশান

আমরা দানিব নূতন প্রাণ্

বাহুতে নবীন বল্

চল্‌রে নওজোয়ান, শোন্‌রে পাতিয়া কান্

মৃত্যু তোরণ দুয়ারে দুয়ারে জীবনের আহ্বান।

ভাঙরে ভাঙ আগল্

চল্‌রে চল্‌রে চল

চল চল চল ॥

II প্সা –া –া | প্সা –া –া I প্সা –া –া | –া –া –া I
চ০ ০ ল্ | চ০ ০ ল্ | চ০ ০ ল্ | ০ ০ ০

I সা –গা গা | সা গা গা I সা গা গা | মা –া গা I
উ ০ র্ধ | গ গ নে | বা জে মা | দঁ ০ ল

I ন্া রা রা | ন্া রা রা I ন্া রা রা | গা –সা –া I
নি ম্ নে | উ ত লা | ধ র নী | ত ০ ল

I সা গা গা | সা গা গা I গা গা মা | পা –া –া I
অ রু ণ | প্রা তে র্ | ত রু ণ | দ ০ ল

I ধা –পা মা | গা –রা গা I সা –া –া | –া –া –া II
চ ল্ রে | চ ল্ রে | চ ০ ০ | ০ ০ ল

II র্সা র্সা া | র্সা র্সা র্সা I না না ণা | না –ধা –া I
উ ষা র | দু য়া রে | হা নি আ | ঘা ০ ত

I ধা ধা দা | ধা ধা দা I ধা ধা দা | ধা –নধা –া I
আ ম রা | আ নি ব | রা ঙা প্র | ভা ০০ ত

I পা পা হ্মা | পা পা হ্মা I পা পা হ্মা | ধপা –হ্মপা –া I
আ ম রা | টু টা ব | তি মি র | রা০ ০০ ত্

I মা গা –রা | গা –পা মা I গা –া –া | –া –া –া I
বা ধা র | বি ন্ ধ্যা | চ ০ ০ | ০ ০ ল্

I মা মা মা | মা মা -া I মা মা মা | মা -া -া I
ন ব ন | বী নে র্ গা হি য়া | গা ০ ন

I গা গা -পা | মা গা গা I গা গা গা | গা -া -া I
স জী ব | ক রি্ ব ম হা শ্ম | শা ০ ন

I গা মা গা | রা রা রা I রা রা ঋা | গরা -া -া I
আ ম রা | দা নি ব ন তু ন | প্রা০ ০ ণ

-া
I প্া ধ্া ন্া | সা গা রা I সা -া -া | -া -া (-মা) I
বা হু তে | ন বী ন ব ০ ০ | ০ ০ ল্

I র্সা -র্গা র্রা | র্সা -া না I র্সা -া -া | -া -া না I
চ ল্ রে | নৌ ০ জো য়া ০ ০ | ০ ০ ন্

-া
I না -া ণা | না না ণা I না -া -া | -া -া (-র্সা) I
শো ন্ রে | পা তি য়া কা ০ ০ | ০ ০ ন্

I র্সা -া র্সা | ধা ধা ধা I র্রা র্সা র্সা | ধা পা পা I
মৃ ০ ত্যু | তো র ণ্ দু য়া রে | দু য়া রে

I গা পা গা | -রা রা -া I সা -া -া | -া -া -মা I
জী ব নে | র্ আ ০ হবা ০ ০ | ০ ০ ন্

I মা -া মা | মা -া মা I মা -া -া | -া -া -া I
ভা ঙ্ রে | ভা ঙ্ আ গ ০ ০ | ০ ০ ল্

I (গা -া গা | রা -া পা I সা -া -া | -া -া -মা) I
চ ল্ রে | চ ল্ রে চ ০ ০ | ০ ০ ল্

I গা -া গা | রা -া রা I সা -া -া | -া -া -া II
চ ল্ রে | চ ল রে চ ০ ০ | ০ ০ ল

হাম্‌দঃ এই সুন্দর ফুল

কথা ও সুরঃ কাজী নজরুল ইসলাম

কাজী নজরুল ইসলাম ভক্তি ও মাহাত্ম্যবোধের প্রেরণা থেকে ইসলাম ধর্ম বিষয়ক দু'শতাধিক গান রচনা করেছেন। এই সব গান ইসলামী গান হিসেবে খ্যাত। কবি নিজেই 'ইসলামী' বিশেষণটি ব্যবহার করেছেন। আল্লাহ্‌র প্রশস্তি, নবী হযরত মোহাম্মদের প্রশস্তি, ধর্মীয় অনুষ্ঠান, ধর্মীয় বিধান, উপাসনা, উপসনালয় প্রভৃতি নানা বিষয় নিয়ে তাঁর ইসলামী গীতিমালা রচিত। 'এই সুন্দর ফুল সুন্দর ফল' কবির এই গানটি খোদার প্রশস্তিমূলক।

মানুষের অন্তরের গভীর ভক্তি ও কৃতজ্ঞতার ভাবটি কবি নজরুল ইসলাম এখানে খুব সহজভাবে প্রকাশ করেছেন। পরম করুণাময় আল্লাহ্‌ সৌন্দর্যময় প্রকৃতি যেমন সৃষ্টি করেছেন, তেমনি মানুষের উপভোগের জন্য দিয়েছেন ফুলফল, পানীয় ও শস্যের অফুরন্ত সম্ভার। আত্মীয়–বন্ধুজনের স্নেহ-মমতাময় পরিবেশও তাঁরই দান। এছাড়া তাঁর আরো দুটো দানের বিষয় কবি এখানে সকৃতজ্ঞতায় উল্লেখ করেছেন। একটি আমাদের প্রিয় নবী হযরত মোহাম্মদ সালালাহু আলায়হে ওয়া সালাম। অপরটি জীবনযাপনের নীতি নির্দেশক পবিত্র কোরানের বাণী। নিজের দীনতাকে স্বীকার করেই বলা হয়েছে, আমরা খোদার আদেশ অবহেলা করি, তবু তাঁর স্নেহধারা অবিরাম বর্ষিত হচ্ছে।

সরল ভক্তির এই গানে সুরের গতিটিও অত্যন্ত সরল। ফলে গানের ভক্তি-ভাব সহজেই মনকে আপ্লুত করে। উদারা সপ্তকের কোমল নি্ (ণা্), ধা্, পা্ আর তারা সপ্তকের র্সা, র্রে স্বর এতে লেগেছে। বিকৃত স্বর আছে দুটো, কোমল নি (ণা) আর কড়ি মা (হ্মা)।

৪+৪ = ৮ মাত্রার কাহার্‌বা তালে গানের সুর বিন্যাস করা হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে তালের আঘাতের পর বাণী শুরু হওয়াতে একটা আড়ির ঝোঁক এসে যায়। এই চলনটি গানের একটি বৈশিষ্ট্য।

উচ্চারণের ক্ষেত্রে 'ফ' সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে। কেননা এ গানে 'ফুল', 'ফল', 'ফসল' শব্দগুলো ঘুরে ঘুরেই আসে। এছাড়া 'তোমার', 'খোদা', 'রোজ', 'কোরান' ইত্যাদি শব্দ যেন 'তুমার', 'খুদা', 'রুজ', 'কুরান' হয়ে না যায়, খেয়াল রাখতে হবে।

হাম্‌দ

কথা ও : কাজী নজ

এই সুন্দর ফুল্ সুন্দর

খো তোমার ।

শস্য শ্যামল ফসল্ ভর

খোদা তোমার ।॥

তুমি কতই দিলে রতন স্বজন

ক্ষুধা পেলেই অন্ন জোগাও,

খোদা তোমার ।॥

খোদা তোমার হুকুম তর

তবু আলো দিয়ে বাতাস ।

শ্রেষ্ঠ নবী দিলে মোরে, ত

পথ না ভুলি দিলে, পাক্ ।

খোদা তোমার ।॥

সা -া II সা -রা রা -গা | সা -া -া -া I সা -রা রা -গা | সা -া -া -া I
এ ই সু ন্ দ র্ ফু ল্ ০ ০ সু ন্ দ র্ ফ ল্ ০ ০

I -া -া গা গা | -া মা পা -ধা I মা -পা পা -া | -া মা গা -মা I
০ ০ মি ঠা ০ ন দী র্ পা ০ নি ০ ০ খো দা ০

I -রগা -া গা গা | -মা গা রাঃ -সঃ I সা -া সা -া | -া -া সা -া I
০০ ০ তো মা র্ মে হে র বা ০ ণী ০ ০ ০ এ ই

I পা -ধা -া ধা | ধা -া নধা -পা I পা -ধা পধা -না | -া ধা পা -া I
শ ০ ০ স্য শ্যা ০ ম০ ল্ ফ ০ স০ ল্ ০ ভ রা ০

I -া -া সা সা | -রা রা রা -গা I মা -পা পা -া | -া মা গা -মা I
০ ০ মা টি র্ ডা লি ০ খা ০ নি ০ ০ খো দা ০

I -[র]গা -া গা গা | -মা গা রা -সা I [র]সা -া সা -া | -া -া সা -া II
০ ০ তো মা র্ মে হে র্ বা ০ ণী ০ ০ ০ "এ ই"

II -া -া পা পা | -া ধা ধা -র্সা I র্সা -া র্সা -া | -া র্সা [র্র]র্সা -া I
০ ০ তু মি ০ ক ত ই দি ০ লে ০ ০ র ত ন্

I -া না -া র্সা | না -ধা নধা -পা I পা -ধা পধা -না | -র্সনা ধা পা -া I
০ ভা ই বে রা ০ দা০ র্ পু ০ ত্র০ ০ ০০ স্ব জ ন

I -া -া পা পা | -ধা পা মা -গা I রা -গা গা -া | -[ম]গা রা সা -া I
০ ০ ক্ষু ধা ০ পে লে ই অ ন্ ন ০ ০ যো গা ও

I –া –া সা সা | –রা রা –া গা I মা –পা পা –া | –া মা গা –মা I
০ ০ মা নি ০ চা ই না মা ০ নি ০ ০ খো দা ০

I –রগা –া গা গা | –মা গা রাঃ –সঃ I রসা –া সা –া | –া –া সা –া II
০০ ০ তো মা র্ মে হে র্ বা ০ ণী ০ ০ ০ "এ ই"

সা সা II –া –া সা সা | –ণ্া ণ্া ধ্া –প্া I প্া –ধ্া ধ্া – সা | –া সা সা –া I
খো দা ০ ০ তো মা র্ হু কু ম্ ত ০ র্ ০ ক্ ক রি ০

I –া –া ধ্া সা | –া রা গা –মা I রা –গা –া –া | –া –া গা গা I
০ ০ আ মি ০ প্র তি ০ পা ০ ০ ০ ০ য় ত বু

I গা –মা গমা –পা | –া পা ধপা –মা I মা – পা মপা –ধা | –া ধা নধা –পা I
আ ০ লো ০ ০ দি য়ে০ ০ বা ০ তা০ স্ ০ দি য়ে০ ০

–া –া
I পা –ধা পধা না | –া ধা নধা –া I পা –া –া –া | –া –া (সা সা) I
বাঁ ০ চা০ ও ০ এ বান্ ০ দা ০ ০ য় ০ ০ খো দা

I পা –গা –া গা | পা –ধা ধর্সা –া I পা –ধা ধর্সা –া | –া র্সনা র্সা –া I
শ্রে ০ ষ্ ঠ ন ০ বী০ ০ দি ০ লে০ ০ ০ মো০ রে ০

I –া না না র্সা | না –ধা নধা –পা I পধা –না –া র্সনা | ধা –পা পা –া I
০ ত রি য়ে নি ০ তে০ ০ রো০ ০ জ্ হা০ শ ০ রে ০

I –া মপা –া পা | পা –া ধপা –মা I –া মা –া ধপা | পাঃ মঃ –মা –া I
০ প থ্ না ভু ০ লি ০ ০ তা ই তো০ দি লে ০ ০

I –া গা –া মা | গা –রা রাঃ –সঃ I সা –রা রা –পা | –া মা গা –মা I
০ পা ক্ কো রা ০ নে র্ বা ০ ণী ০ ০ খো দা ০

I –রগা –া গা গা | –মা গা রা –সা I রসা –া সা –া | –া –া সা –া II II
০ ০ তো মা র্ মে হে র্ বা ০ ণী ০ ০ ০ "এ ই"

লোকসংগীতঃ আল্লা মেঘ দে পানি দে

কথা ও সুরঃ আব্দুল লতিফ

বাংলা গানের প্রধান একটি ধারা লোকসংগীত। এ গানে থাকে আমাদের লোকসমাজের জীবনঘনিষ্ঠ কথা। আর এর সুরে আছে এমন বৈশিষ্ট্য, যা গ্রাম বাংলার মাটির খুব কাছাকাছি বলেই মনে হয়। নদীর মাঝি, মাঠের রাখাল, গাড়িয়াল ভাই থেকে গ্রামের সাধারণ নর–নারীর জীবনসংগ্রাম ও তাদের আনন্দ-বেদনার গাথা এই গান। অত্যন্ত সমৃদ্ধ ও বিশাল এই গীত-ভাণ্ডার। 'আল্লা ম্যাঘ দে পানি দে' অতি পরিচিত একটি লোকসংগীত। বিশিষ্ট শিল্পী আব্বাস উদ্দীন আহ্মদের কণ্ঠে এই গানটি খুব জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।

গ্রীষ্মের প্রখর রোদে মাটি ফেটে চৌচির হয়ে যায়। খাল, বিল, নদী যায় শুকিয়ে। বৃষ্টির জন্য তৃষিত চাতকের মতো আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে কিষাণ-কিষাণী। স্রষ্টার কাছে তাদের আকুল প্রার্থনা–'আল্লা মেঘ দে'। গ্রামীণ জীবনের অতি বাস্তব একটি চিত্র এই গানে। পল্লীকবি জসীমউদ্দীনের অমর কাব্য 'নকসীকাঁথার মাঠে' বৃষ্টির জন্যে মাগন গানের যে বর্ণনা আছে, তার সঙ্গে এই গানের মিল রয়েছে।

এটি আঞ্চলিক গান বলে উচ্চারণের ক্ষেত্রে অন্যান্য গানের সঙ্গে পার্থক্য থাকবে। 'মেঘ', 'কেডা' উচ্চারণ হবে 'ম্যাঘ' 'ক্যাডা'। এমনকি 'ঘ' বলতে হবে 'গ'- য়ের মতো। 'ছ', 'জ', 'য' উচ্চারিত হবে জিভ দিয়ে বাতাস পুরো না ঠেকিয়ে 'ছ'-কে প্রায় ইংরেজি 'S' আর 'জ' বা 'য'-কে ইংরেজি 'Z' এর মতো বলতে হবে। 'ড়'-কে 'র' বলা যাবে, কেননা আঞ্চলিক উচ্চারণে তাই হয়। 'ফ' উচ্চারণ হবে উপরের দাঁত দিয়ে নিচের ঠোঁট ছুঁয়ে, ইংরেজি 'F'- এর মতো

গানটিতে ৪+৪= ৮ মাত্রার কাহারবা তাল ব্যবহার করা হয়েছে। গানের শুরুতে দুটি ছত্র গাইতে হবে তালের ঝোঁক ছাড়া, টেনে টেনে। তারপর 'ম্যাঘ দে' বলার প্রারম্ভে তাল অর্থাৎ সম্ পড়বে। হাতে তালি দিয়ে গাইলে ছাত্রছাত্রীরা আনন্দ পাবে।

এই গানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা লোকসংগীতের সুরের সঙ্গে পরিচিত হবে। কড়ি মা (ক্মা) ও কোমল নি (ণা) - এই দুটি বিকৃত স্বর এখানে ব্যবহৃত হয়েছে। উদারা সপ্তকের একটি স্বর 'ন্' এবং তারা সপ্তকের চারটি স্বর 'র্সা', 'র্রে', 'র্গা', 'র্মা' - গানটিতে পাওয়া যায়। 'আল্লা মেঘ দে' কথাটি নানা সুরে ঘুরে ঘুরে আসায় মেঘ চাইবার আকুলতা খুব সুন্দর ভাবে ফুটে উঠেছে। শিশুরা গানটি গাইতে গাইতে নাচের মুদ্রা ব্যবহার করে নাচতে পারে সহজেই।

আল্লা মেঘ দে

কথা ও : আব্দুল

তা : কাহ

বেলা দ্বিপ্রহর ধূ ধূ বালুচর
ধুপেতে কলিজা ফাটে, পিয়াসে কাতর।
আল্লা ম্যাঘ দে, আল্লা মেঘ দে পানি দে
ছায়া দেরে তুই, আল্লা মেঘ দে ॥

আস্‌মান হইল টুডা টুডা জমিন্‌ হইল ফাডা
ম্যাঘ রাজা ঘুমাইয়া রইছে
ম্যাঘ দিবো তোর্‌ ক্যাডা ॥

হালের্‌ গরু বাইন্‌ধা গিরস্ত মরে কাইন্‌দা
ঘরের রমণী কান্‌দে
ডাইল খিচুড়ি রাইন্‌ধা ॥

ফাইট্যা ফাইট্যা রইছে যত খালা বিলা নদী
পানির লাইগ্যা কাইন্‌দ্যা মরে পঙ্খি জলধি ॥
কপোত কপোতী কান্‌দে খোপেতে বসিয়া
শুকনো ফুলের কলি পড়ে ঝরিয়া ঝরিয়া ॥
আম পাতা লড়ে চড়ে কাডল পাতা ঝরে
পানি পানি কইরা ঝিলে পান কউড়ী মরে ॥

তাল ছাড়া –

–া –া গা মা পা মা পা –া –া –া –া –া –া –া
০ ০ বে লা দ্বি প্র হ ০ ০ ০ ০ ০ ০ র্

ধা –া ধা –পা পা –মা মা গা গা –া –া –া –গমা –গরা –া –া
ধূ ০ ধূ ০ বা ০ লু ০ চ ০ ০ ০ ০০ ০০ ০ র

রা গা রা পা মা মা মগা গা –া –া –া –া –গমা –া –গরা
ধূ পে তে ক লি জা ফা০ টে ০ ০ ০ ০ ০০ ০ ০০

ন্‌া সা রা –া –া গরা সন্‌া সা –া –া –া –া গা মা
পি য়া সে ০ ০ ০০ কা০ ত ০ ০ ০ র আ ল্লা

তালে –

I পা –া পা –া | –া –া গা মা II ধা –া ধা –া | ধা ধা ণা –ধা I
ম্যা ঘ্ দে ০ ০ ০ আ ল্লা ম্যা ঘ্ দে ০ পা নি দে ০

I পা পা | ধ পা মগা মা I পা –া পা –া | –া –া গা মা I
ছা য়া তু ই আ০ ল্লা ম্যা ঘ্ দে ০ ০ ০ আ ল্লা

I ধা –া ধা –া | –া –া গা মা I পা –া পা –া | –া –া –া –া I
ম্যা ঘ দে ০ ০ ০ আ ল্লা ম্যা ঘ্ দে ০ ০ ০ ০ ০

I পা ধা | র্রা র্মা I র্সা র্সা | পা ঃ –া –া I
আ মান্ হই ল | টু ডা টু ডা

I পা ধা | র্রা র্মা I র্সা না | পা ধা II
ম্যাঘ রা জা ঘু | মাই য়া রই ছে

II পা –ধা র্সা র্সা | র্রা র্গা র্মা –র্গা I র্সা র্সা ণা ধণা | পা ধা –া –া I
হা লের্ গ রু | বা ইন্ ধা ০ গি রস্ত্ ম রে০ কাইন্ দা ০ ০

I পা ধা র্সা র্সা | র্রা র্মা র্গা র্রা I র্সা র্সা ণা ধণা | পা ধা মা পা II
ঘ রে র র ম ণী কান্ দে ডাইল্ খি চু ড়ি০ রাইন্ ধা আ ল্লা

II পা ধা র্সা র্সা | র্রা র্মা র্গা র্রা I র্সা র্সা ণা ধা | পা ধা –া –া I
ফাই ট্যা ফাই ট্যা রই ছে য ত খা লা বি লা ন দী ০ ০

I পা ধা র্সা র্সা | র্রা র্মা র্গা র্রা I র্সা –া ণা ধা | পা ধা মা পা II
পা নির্ লাই গ্যা কাইন্ দা ম রে প ঙ্ খী জ ল ধি আ ল্লা

II পা ধা র্সা র্সা | র্রা র্মা র্গা র্রা I র্সা র্সা ণা ধা | পা ধা –া –া I
ক পো ত ক | পো তী কান্ দে খো পে তে ব সি য়া ০ ০

I পা ধা র্সা র্সা | র্রা র্মা র্গা র্রা I র্সা র্সা ণা ধা | পা ধা মা পা II
শু কনা ফু লের ক লি প ড়ে ঝ রি য়া ঝ রি য়া আ ল্লা

II পা –ধা র্সা র্সা | র্রা র্মা র্গা র্রা I র্সা র্সা ণা ধা | পা ধা –া –া I
আ ম্ পা তা | ল ড়ে চ ড়ে কা ডল্ পা তা ঝ রে ০ ০

I পা ধা র্সা র্সা | র্রা র্মা র্গা র্রা I র্সা র্সা ণা ধা | পা ধা মা পা II
পা নি পা নি কই রা ঝি লে পা ন কউ ড়ী ম রে “আ ল্লা”

শ্রমের মর্যাদা সম্পর্কিত গান: নিজের হাতে কাজ কর

কথা ও সুর: আবদুল লতিফ

মানুষ মাত্রেই শ্রমের প্রতি মর্যাদা বোধ থাকা প্রয়োজন। আবদুল লতিফ রচিত ও সুরারোপিত 'নিজের হাতে কাজ কর কাজতো ঘৃণার নয়' গানটিতে শ্রমের মর্যাদার কথা বলা হয়েছে। যা তৃতীয় শ্রেণির সংগীত বইয়ে সংযোজন করা হয়েছে। নিজের হাতে কাজ করলে কাউকে ছোট বা ঘৃণা করা হয় না বা ঘৃণার চোখে দেখার কোন অবকাশ নেই। এই বোধটিকে সামনে রেখে শিশুদের মনে শ্রমের মর্যাদা জাগ্রত করার কথা এখানে বলা হয়েছে। মানুষের পরিচয় হলো তার কাজ এবং প্রত্যেক কাজই সম্মানজনক। মহানবী হযরত মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম) সকল কাজই নিজের হাতে করতেন এবং কাজের মানুষকে তিনি গভীরভাবে সম্মান করতেন। মানুষ তার মৃত্যুর পর একমাত্র কাজের মাধ্যমেই পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে পারেন। তাই কাজকে কখনই অবজ্ঞা করা উচিত নয়। আবদুল লতিফ রচিত নিজের হাতে কাজ কর গানটি কাহারবা তালে ৪+৪=৮ মাত্রায় গাওয়া হয়েছে। গানটি সঞ্চারীতে যেখানে বলা হয়েছে 'খোদার হাবিব মোদের নবী কাজ করে নিজ হাতে' সেখানে 'করে' উচ্চারণ 'কোরে' হবে।

পরের লাইনে 'শ্রমের' শব্দটিকে 'শ্রোমেরো' উচ্চারণ করতে হবে। অন্য সময় 'শ্রমের' শব্দটির উচ্চারণ করার সময় হসন্তযুক্ত উচ্চারণ করতে হয়। কিন্তু এখানে ছন্দের প্রয়োজনে 'রো' উচ্চারণ হবে। 'বেঁচে' উচ্চারণ করার সময় চন্দ্রবিন্দুর উচ্চারণ স্পষ্ট হতে হবে। তা না হলে 'বেচে' (অর্থাৎ বিক্রি করে) মনে হবে।

নিজের হাতে

কথা ও সুরঃ আবদুল লতিফ

তালঃ কাহারবা

নিজের হাতে কাজ কর
কাজতো ঘৃণার নয়
কাজের মাঝে হয় মানুষের
সত্য পরিচয় ॥

কাজকে ঘৃণা করে যারা
সুনাম কভু পায়না তারা
কাজ করে তাই অনেক মানুষ
নামিদামি হয় ॥

খোদার হাবীব মোদের নবী
কাজ করে নিজ হাতে
শ্রমের মর্যাদা দিতেন
সন্দেহ নাই তাতে ॥

মানুষতো নয় অমর ভবে
কাজটা শুধুই বেঁচে রবে
কাজের মাঝে মরেও মানুষ
অমর জগৎময় ॥

II{ পা -া পা মা | জ্ঞা -া জ্ঞা -রা I (র)সা -া -া সা | সা -া -া -া I
নি ০ জে র | হা ০ তে ০ | কা ০ জ্ ক | র ০ ০ ০

I (ন)সা -া -া ন্া | (ন)সা -া (স)রা -া I (র)জ্ঞা -া -া -া | -া -া -া -া I
কা ০ জ্ তো | ঘৃ ০ ণা র্ | ন ০ ০ ০ | ০ ০ ০ য়

I (ম)পা -া মা -জ্ঞা | (জ্ঞ)মা -া জ্ঞা -রা I (র)জ্ঞা -া -া সা | (স)রা -া সা -া I
কা ০ জে র্ | মা ০ ঝে ০ | হ ০ য়্ মা | নু ০ ষে র

I সা -া -া রা | জ্ঞা -া (জ্ঞ)দা -া I (দ)পা -া -া -মা | -জ্ঞা -রা -সা -া I
স ০ ০ ত্য | প ০ রি ০ | চ ০ ০ ০ | ০ ০ ০ য়্

I পা -া -া দা | ণা -া জ্ঞা -রা I (র)সা -া -া -া | -া -া -া -া } II
স ০ ০ ত্য | প ০ রি ০ | চ ০ ০ ০ | ০ ০ ০ য়্

II (প)ণা -া ণা পা | মজ্ঞা -া -া -া I ণা ণা -া পা | মজ্ঞা -া -া -া I
কা জ্ কে ঘৃ | ণা০ ০ ০ ০ | ক রে ০ যা | রা০ ০ ০ ০

I দা দা -া মা | (ম)রা -া -া -মা I মা -পা পা পা | পা -া -া -া I
সু না ম্ ক | ভু ০ ০ ০ | পা য় না তা | রা ০ ০ ০

I পা -া মা -জ্ঞা | মপা -মা জ্ঞা -রা I রজ্ঞ -া রা -সা | রজ্ঞ -রা সা -া I
কা জ্ ক ০ | রে০ ০ তা ই | অ০ ০ নে ক | মা০ ০ নু ষ্

I সা -া সা -রা | জ্ঞা -া জ্ঞা -দা I পা -া -া -মা | -জ্ঞা -রা -সা -া I
না ০ মী ০ | দা ০ মী ০ | হ ০ ০ ০ | ০ ০ ০ য়্

I (দ)প্া -া প্া -দ্া | ণ্া -া জ্ঞা -রা I সা -া -া -া | -া -া -া -া II
না ০ মী ০ | দা ০ মী ০ | হ ০ ০ ০ | ০ ০ ০ য়্

II{ন্া -া ন্া -া ন্া -া ন্া -া I [ন]সা -া সা -া | সা -া সা -া I
খো ০ দা র্ হা ০ বী ব মো ০ দে র্ ন ০ বী ০

I [ন]সা -া -া রা | সা -া ন্া -া I সা -া [স]জ্ঞা -া | -া -া -া -া I
কা ০ জ্ ক রে ০ নি জ হা ০ তে ০ ০ ০ ০ ০

I [স]জ্ঞা -া জ্ঞা -া | জ্ঞা -া জ্ঞা -া I রা -জ্ঞা রা -মা | জ্ঞা -রা সা -া I
শ্র ০ মে ০ র ০ ম র্ যা ০ দা ০ দি ০ তে ন্

I ন্া -া -া ন্া | সা -া জ্ঞা রা I [র]সা -া সা -া | -া -া -া -া }I
স ০ ন্ দে হ্ ০ না ই তা ০ তে ০ ০ ০ ০ ০

II{ণা ণা -া পা | মজ্ঞা -া -া -া I ণা ণা -া পা | মজ্ঞা -া -া -া I
মা নু ষ্ তো ন০ ০ ০ য় অ ম র্ ভ বে০ ০ ০ ০

I [জ্ঞ]দা -া দা মা | [ম]রা -া -া -মা I মা মা -পা পা | পা -া -া -া }I
কা জ্ টা শু ধু ০ ০ ই বেঁ চে ০ র বে ০ ০ ০

I [ম]পা -া মা -জ্ঞা | মপা -মা জ্ঞা -রা I রজ্ঞা -া রা -সা | রজ্ঞ -রা সা -া I
কা ০ জে র্ মা০ ০ ঝে ০ ম০ ০ রে ও মা০ ০ নু ষ্

I সা -া -সা -রা | জ্ঞা -া জ্ঞা দা I পা -া -া -মা | -জ্ঞা -রা -সা -া I
অ ০ ম র্ জ ০ গ ত ম ০ ০ ০ ০ ০ ০ য়্

I প্া -া প্া -দ্া | ণ্া -া জ্ঞা -রা I সা -া -া -া | -া -া -া -া II II
অ ০ ম র্ জ ০ গ ত ম ০ ০ ০ ০ ০ ০ য়্

প্রার্থনা : আনন্দলো ালো

কথাঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সুরঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পূজা, স্বদেশ, প্রেম, প্রকৃতিসহ বিভিন্ন পর্যায়ের গান রচনা করেছেন। "আনন্দলোকে, মঙ্গলালোকে বিরাজ সত্যসুন্দর" পূজা পর্যায়ের একটি গান। নিসর্গের সমস্ত সৌন্দর্যের মধ্যে স্রষ্টার যে অপূর্ব প্রকাশ তা এ গানে বর্ণিত হয়েছে। বিশ্বজগত যেন মনি মুক্তায় পরিপূর্ণ আনন্দ সৌন্দর্যের মধ্যে অবগাহন করছে। ধরণী এক অপূর্ব শোভায় সুশোভিত, যেখানে ফুল পল্লব দ্বারা বেষ্টিত। বিশ্ব ভুবনের এই সামগ্রিক সৌন্দর্যে তাঁরই আশীর্বাদ যেন ঝরে পড়ছে। এই ঐশ্বর্যপূর্ণ ও বৈচিত্রময় জগৎ মানুষের জন্য স্রষ্টার এক নীরব স্নেহের অবদান। ভক্তপ্রাণের এক বিনম্র নিবেদনই গানটির মধ্যে নিহিত আছে।

গানের প্রতিটি শব্দে গভীর অর্থ বিরাজমান। তাই গাওয়ার সময় সুর, ছন্দ ও লয়ের এক অভূতপূর্ব মিল খুঁজে পাওয়া যায়। কাট কাট উচ্চারণে কখনও যেন গানটি গাওয়া না হয় সে দিকে লক্ষ রাখতে হবে। ধীর লয়ে গাইতে হবে যাতে করে উপাসনার গম্ভীর ভাব বজায় থাকে।

এই গানে সরল গতি রয়েছে এবং গানটি এক তালে গাওয়া। একতাল ১২ মাত্রা তিনটি তাল ও ১টি ফাঁক।। ত্রিমাত্রিক ছন্দে চতুর্বিভাগীয় (৩। ৩। ৩। ৩)। উচ্চারণের বেলায় 'বেষ্টিত' শব্দটি ঠিক উচ্চারণে গাইতে হবে। বেষ্টিত উচ্চারণে কখনো ব্যাষ্টিত যেন না হয়। তেমনি কোমল উচ্চারণ যেন কোমল হয়। এটি যেন কমল না হয়। সঠিক তাল ও উচ্চারণে গাইলে গানের মূলভাব ফুটে উঠবে।

প্রার্থনা :

কথা ও সুরঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

তালঃ একতাল

আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে
বিরাজ', সত্যসুন্দর ॥
মহিমা তব উদ্ভাসিত মহাগগনমাঝে,
বিশ্বজগত মণিভূষণ বেষ্টিত চরণে ॥
গ্রহতারক চন্দ্রতপন ব্যাকুল দ্রুতবেগে
করিছে পান করিছে স্নান, অক্ষয় কিরণে ॥
ধরণী'পর ঝরে নির্ঝর, মোহন মধুশোভা
ফুল পল্লব-
গীতগন্ধ সুন্দরবরনে ॥
বহে জীবন রজনীদিন চিরনতুনধারা,
করুণা তব অবিশ্রাম জনমে মরণে ॥
স্নেহ প্রেম দয়া ভক্তি কোমল করে প্রাণ,
কত সান্ত্বনা করো বর্ষণ সন্তাপহরণে ॥
জগতে তব কী মহোৎসব, বন্দন করে বিশ্ব
শ্রীসম্পদ ভূমাস্পদ নির্ভয়শরণে ॥

২ ৩ ০ ১
II গা –া –া | গা –া গা | গা –া –া | রা –া –া I
আ ০ ০ ন ন্ দ লো ০ ০ কে ০ ০

২ ৩ ০ ১
I গা –া পা | মা –া –া | মা –া –ধা | পা –া –া I
ম ঙ্ গ লা ০ ০ লো ০ ০ কে ০ ০

২ ৩ ০ ১
I সা –া –া | রা –া –া | রগা –া –া | –া –া –রসা I
বি ০ ০ রা ০ ০ জ ০ ০ ০ ০ ০০

২ ৩ ০ ১ ‖
I সা –া গা | রা –া ন্া | সরসা –া –া | –া –া –া II
স ০ ত্য সু ন্ দ র০০ ০ ০ ০ ০ ০

২ ৩ ০ ১
[রা]
II { সা সা সা | –া ন্া সা | রা –া রা | –া সা ন্া I
ম হি মা ০ ত ব উ দ্ ভা ০ সি ত

২ ৩ ০ ১
I গা গা –া | গা মা পা | মপা –মা গা | –া –া –া }I
ম হা ০ গ গ ন মা০ ০ ঝে ০ ০ ০

২ ৩ ০ ১
I পা –া পা | পা পা হ্মা | পা পা পা | –া পা হ্মা I
বি ০ শ্ব জ গ ত ম ণি ভূ ০ ষ ণ

২ ৩ ০ ১
I পা –া পা | হ্মা পা ধা | পা –া –া | –া –া –মা II
বে ষ্ টি ত চ র ণে ০ ০ ০ ০ ০

২ ৩ ০ ১
[রা]
II { সা সা সা | –া ন্া সা | রা –া রা | রা সা ন্া I
গ্র হ তা ০ র ক চ ন্ দ্র ত প ন

২ ৩ ০ ১
I গা -া গা | গা মা পা | মপা -মা গা | -া -া -া }I
ব্যা ০ কু ল দ্রু ত বে০ ০ গে ০ ০ ০

২ ৩ ০ ১
I পা পা পা | পা -া হ্মা | পা পা পা | পা -া হ্মা I
ক রি ছে পা ০ ন ক রি ছে স্না ০ ন

২ ৩ ০ ১
I পা -া পা | হ্মা পা ধা | পা -া -া | -া -া -মা II
অ ০ ক্ষ য় কি র ণে ০ ০ ০ ০ ০

২ ৩ ০ ১
[রা]
II { সা সা সা | -া ন্‌া সা | রা রা রা | -া সা ন্‌া I
ধ র ণী ০ প র ঝ রে নি র্‌ ঝ র

২ ৩ ০ ১
I গা -া গা | গা মা পা | মপা -মা গা | -া -া -া }I
মো ০ হ ন ম ধু শো০ ০ ভা ০ ০ ০

২ ৩ ০ ১
I পা পা পা | -া পা হ্মা | পা -া পা | পা -া হ্মা I
ফু ল প ল্‌ ল ব গী ০ ত গ ন্‌ ধ

২ ৩ ০ ১
I পা -া পা | হ্মা পা ধা | পা -া -া | -া -া -মা II
সু ন দ র ব র ণে ০ ০ ০ ০ ০

২ ৩ ০ ১
[রা]
II { সা সা সা | -া ন্‌া সা | রা রা রা | -া সা ন্‌া I
ব হে জী ০ ব ন র জ নী ০ দি ন

২ ৩ ০ ১
I গা গা গা | -া মা পা | মপা -মা গা | -া -া -া }I
চি র নূ ০ ত ন ধা০ ০ রা ০ ০ ০

২ ৩ ০ ১
I পা পা পা | –া পা হ্মা | পা পা –া | পা –া হ্মা I
ক রু ণা ০ ত ব অ বি ০ শ্রা ০ ম

২ ৩ ০ ১
I পা –া পা | –হ্মা পা ধা | পা –া –া | –া –া –মা II
জ ন মে ০ ম র ণে ০ ০ ০ ০ ০

২ ৩ ০ ১
[রা]
II { সা –া সা | সা –ন্া সা | রা রা –া | রা –সা ন্া I
স্নে ০ হ প্রে ০ ম দ য়া ০ ভ ক্ তি

২ ৩ ০ ১
I গা –া গা | গা মা পা | মপা –মা –গা | –া –া –া }I
কো ০ ম ল ক রে প্রা০ ০ ০ ০ ০ ণ্

২ ৩ ০ ১
I পা পা পা | –া পা হ্মা | পা পা পা | –া পা হ্মা I
ক ত সা ন্ ত্ব না ক রো ব র্ ষ ণ

২ ৩ ০ ১
I পা –া পা | হ্মা পা ধা | পা –া –া | –া –া –মা II
স ন্ তা প হ র ণে ০ ০ ০ ০ ০

২ ৩ ০ ১
[রা]
II { সা সা সা | –া ন্া সা | রা রা রা | –া সা ন্া I
জ গ তে ০ ত ব কী ম হো ৎ স ব

২ ৩ ০ ১
I গা –া গা | গা মা পা | মপা –মা গা | –া –া –া }I
ব ন্ দ ন ক রে বি০ ০ শ্ব ০ ০ ০

২ ৩ ০ ১
I পা –া পা | –া পা হ্মা | পা –া পা | –া পা হ্মা I
শ্রী ০ স ম্ প দ ভূ ০ মা স্ প দ

২ ৩ ০ ১
I পা –া পা | হ্মা পা ধা | পা –া –া | –া –া –মা IIII
নি র্ ভ য় শ র ণে ০ ০ ০ ০ ০

মুক্তিযুদ্ধের গান: রক্ত দিয়ে নাম লিখেছি

কথা: আবুল কাসেম সন্দ্বীপ

সুর: সুজেয় শ্যাম

২৪ বছর পাকিস্তানিদের পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করতে ১৯৭১ সালে শুরু হয়েছিল স্বাধীনতা যুদ্ধ। লাখো কোটি মুক্তিকামী জনতা ঝাঁপিয়ে পড়েছিল দেশকে স্বাধীন করার লক্ষ্যে। নয় মাসব্যাপী গ্রাম শহর বন্দরে মুক্তিবাহিনী বীরদর্পে যুদ্ধ করে বুকের রক্ত ঢেলে দিয়ে অর্জন করেছে এই স্বাধীন বাংলাদেশ।

তখন অনেক গান রচিত হয়েছিল যা দ্বারা মুক্তিযোদ্ধারা অনুপ্রাণিত হয়েছিল। 'রক্ত দিয়ে নাম লিখেছি' তারই একটি গান। বহুল প্রচলিত এই গানটি মুক্তিযোদ্ধাদের মনে অনেক সাহস ও উদ্দীপনা যুগিয়েছিল–যা স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে গাওয়া হয়েছে। গানটিতে জীবনপন করে রক্তের বদলে মুক্ত করার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়েছে। গানটিতে প্রতিশোধ নেয়ার মাধ্যমে মুক্ত স্বাধীন দেশ গড়ার দৃপ্ত মনস্কামের কথা বলা হয়েছে। গানটির মাধ্যমে শিশু মন মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হবে। মিশ্র (মধ্য ও দ্রুত) লয়ে গানটি ৪+৪ = মাত্রা কাহারবা এবং ৩+৩ = ৬ মাত্রা দাদরা তালে গাওয়া হয়েছে।

গানটিতে 'রক্ত', 'মুক্তি', 'তুচ্ছ' কয়টি যুক্তাক্ষর রয়েছে। যুক্ত অক্ষরটি হসন্ত সহযোগে জোরদার ভাবে উচ্চারণ করতে হবে। 'লড়ছি' এবং 'গড়েছি' শব্দ দুটির উচ্চারণে 'ড়' উচ্চারণ স্পষ্ট ও জোরালো হতে হবে। 'র' এর মত হবে না। 'ড়' এর উচ্চারণ করার সময় জিভের মাথা উল্টে নিয়ে তলার দিকটা মাড়িতে আঘাত করে উচ্চারণ করতে হবে।

মুক্তিযুদ্ধের গান

তালঃ তাল ফের্‌তা (কাহারবা/দাদরা)

কথাঃ আবুল কাসেম সন্দ্বীপ সুরঃ সুজেয় শ্যাম

রক্ত দিয়ে নাম লিখেছি বাংলাদেশের নাম
মুক্তিছাড়া তুচ্ছ মোদের এই জীবনের দাম ॥
সংকটে আর সংঘাতে আমরা চলি সব একসাথে
জীবনমরণ পণ করে সব লড়ছি অবিরাম ॥
রক্ত যখন দিয়েছি আরও রক্ত দেব
রক্তের প্রতিশোধ মোরা নেবই নেব
ঘরে ঘরে আজ দূর্গ গড়েছি বাংলার সন্তান
সইব না মোরা সইব না আর জীবনের অপমান ॥
জীবন জয়ের গৌরবে নতুন দিনের সৌরভে
মুক্ত স্বাধীন জীবন গড়া মোদের মনস্কাম ॥

II মা –া মা মা | মর্সা –া –া –া I ণা –া দা পা | মা –া –া –া I
র ক্ ত দি য়ে ০ ০ ০ না ম্ লি খে ছি ০ ০ ০

I মা –া মা –া | পা –া ণা –া I দা –া –া –া | –া –া –া –া ‖ I
বা ং লা ০ দে ০ শে র্ না ০ ০ ০ ০ ০ ০ ম

I {মা –া মা পা | দা –া –া –া I মা –া পা দা | র্সা –া (–া –া)} I
মু ক্ তি ছা ড়া ০ ০ ০ তু ০ চ্ছ মো দে র্ ০ ০

দা –া I ণা –া দা –া | পা –া মা –া I –া –া –া –া | –া –া মা –া I
এ ই জী ০ ব ০ নে র্ দা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ম্ এ ই

I র্রা –া র্সা –া | ণা –া দা –া I –া –া –া –া | –া –া মা –া I
জী ০ ব ০ নে র্ দা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ম্ এ ই

I ণা –া দা –া | পা –া মা –া I –া –া –া –া | –া –া –া –া II
জী ০ ব ০ নে র্ দা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ম্

II মা –া –া পা | ধা –া পা মা I রা –া –া রা | সা –া –া –া I
সং ০ ০ ক টে ০ আ র্ সং ০ ০ ঘা তে ০ ০ ০

I মা –া পা ধা | –পা মা রা সা I সা –া ণ্া ধ্া | –া –া –া –া I
আ ম্ রা চ ০ লি স ব্ এ ক্ সা থে ০ ০ ০ ০

I রা রা –া সা | রা –সা –ধ্া –া I গা –া গা জ্ঞা | গা –া –া –া I
জী ব ন্ ম র ০ ০ ন্ প ণ্ ক রে স ০ ০ ব্

I মা –া মা –া | পা –া দা –া I ণা –া –া –া | –া –া –া –া I
ল ডু ছি ০ অ ০ বি ০ রা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ম্

I র্সা –া র্সা –া | ণা –া ণা –া I দা –া –া –া | –া –া –া –া II
বা ঙ্ লা ০ দে ০ শে র্ না ০ ০ ০ ০ ০ ০ ম্

দ্রুত দাদ্‌রা –

*II ধধধা ধধা ধধধা | ধধা ধধধা ধধা I ধধধা ধধা ধধধা | ধধা –া –া I
রকত যখন্ দিয়েছি | আরো রক্ত দেব রক্ত দেব রক্ত | দেব ০ ০

I ণণা ণণা ণণা | ণণা ণণা ণণা I ণণা ণণা র্রর্া | র্রর্া –া –া I
রক্তে র্প্রতি শো০ধ্ | মোরা নেবই নেব নেবই নেব নেবই | নেব ০ ০

I সসসা জ্ঞরসা জ্ঞজ্ঞা | সসসা জ্ঞজ্ঞা রসসা I জ্ঞা –া –া –া গগা গগগা I
ঘরেঘ রেআজ্ দূর্গ | গড়েছি বাংলা র্সন্ তান্ ০ ০ ০ | সইবো নামোরা

I মমমা মমা দদদা | –পমদা র্সাঃ মদঃI র্সাঃ মদঃ র্সাঃ | ঃ –া –া II
সইবো নাআর জীবনে র্অপ মান্ অপ মান্ অপ মান্ ০ ০ ০

II মা মা –া পা | ধা –পা –মা –রা I রা –া রা সা | –া –া –া –া I
জী ব ন্ জ য়ে ০ ০ র্ গৌ ০ র বে ০ ০ ০ ০

I মা মা –া পা | ধা –পা –মা –রা I সা –া ণ্া ধ্া | –া –া –া –া I
নূ ত ন্ দি নে ০ ০ র্ সৌ ০ র্ ভে ০ ০ ০ ০

I রা –া রা সা | রা –সা –ধ্া –া I গা গা –া জ্ঞা | গা –া –া –া I
মু ক্ ত ধী ০ ০ ন্ জী ব ন্ গ ড়া ০ ০

I মা –া মা –া | পা –া দা –া I ণা –া –া –া | –া –া –া –া I
মো ০ দে র্ ম ০ ন ষ্ কা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ম্

I র্ণসা –া র্সা –া | ণা –া ণা –া I দা –া –া –া | –া –া –া –া IIII
বাং ০ লা ০ দে ০ শে র্ না ০ ০ ০ ০ ০ ০ ম্

তারকা চিহ্নিত স্থানে এসে দ্রুত দাদরার ছন্দে দ্রুত লয়ে গাইতে হবে।
ড্রাম বিটের মত প্রতিটি বিটের ৩ মাত্রার ছন্দে। যেমন –

I ধি ধি না | না তি না I ধি ধি না | না তি না I ধি ধি না | না তি না I ধি ধি না | না তি না I
র ক্ ত য খ ন্ দি য়ে ছি আ রো ০ র ক্ ত দে ব ০ র ক ত দে ব ০

পাঠ পরিকল্পনা

যে কোন কাজ সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য পরিকল্পনা প্রয়োজন। পরিকল্পনা ছাড়া কোন কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা যায় না। তাই শিক্ষককে শ্রেণিতে পাঠদানের পূর্বে অবশ্যই একটি পরিকল্পনা করা প্রয়োজন। সেই পরিকল্পনার জন্য অবশ্যই পূর্ব প্রস্তুতি নিতে হয়। পাঠ উপস্থাপনের কৌশল সম্পৃক্ত একটা রূপরেখা পাঠদানের পূর্বাহ্নে প্রস্তুত করাই হলো পাঠ পরিকল্পনা।

নমুনা পাঠ পরিকল্পনা

<table>
<tr><td>পরিচিতি</td><td>বিদ্যালয়ের নাম : ক
শিক্ষকের নাম : খ
রোল নম্বর : ৭
শিক্ষাবর্ষ : ২০১৬-'১৭
শিক্ষার্থীর সংখ্যা : ৪০</td><td>বিষয় : সংগীত
শ্রেণি : দ্বিতীয়
পাঠ : জাতীয় সংগীত (প্রথম অন্তরা পর্যন্ত)
সময় : ৪০ মিনিট
তারিখ : ২৫/০৪/২০১৬</td></tr>
<tr><td>শিখনফল</td><td colspan="2">২.১.১ জাতীয় সংগীত প্রথম অন্তরা পর্যন্ত পরিচিত হবে।
২.১.২ জাতীয় সংগীতটি প্রথম অন্তরা পর্যন্ত আবৃত্তি করতে পারবে।
২.২.১ জাতীয় সংগীতটি প্রথম অন্তরা পর্যন্ত সুরে ও তালে গাইতে পারবে।
২.৩.১ জাতীয় সংগীত পরিবেশন কালে কীভাবে সম্মান প্রদর্শন করতে হয় তা দেখাতে পারবে।</td></tr>
<tr><td colspan="3">উপকরণ: সংগীত বিষয়ক শিক্ষক নির্দেশিকা, হারমনিয়াম, তবলা, মন্দিরা, চার্ট, মোবাইল ফোন / মাল্টিমিডিয়া ইত্যাদি</td></tr>
<tr><td colspan="3">শিখন শেখানো কার্যাবলী</td></tr>
<tr><td>প্রস্তুতি</td><td colspan="2">সালাম ও কুশল বিনিময়ের মাধ্যমে শিখন উপযোগী পরিবেশ তৈরি করবো।
কোন গানটি আমাদের জাতীয় সংগীত জিজ্ঞাসা করবো।
এই সুন্দর গানটি কার লেখা তা জানতে চাইব।
জাতীয় সংগীত গাইবার সময় কীভাবে সম্মান দেখাতে হয় তা দেখাতে বলবো।</td></tr>
<tr><td>উপস্থাপ</td><td colspan="2">জাতীয় সংগীতটির প্রথম অন্তরা পর্যন্ত পোস্টার পেপারে/বোর্ডে লিখে টানিয়ে দেব।
প্রাণে, বাঁশি, ঘ্রাণে, অঘ্রাণে ইত্যাদি শব্দগুলো বারবার উচ্চারণ করাবো।
শুদ্ধভাবে বলা ও উচ্চারণ করার জন্য শিক্ষার্থীদের সাথে নিয়ে বেশ কয়েকবার প্রথম অন্তরা পর্যন্ত আবৃত্তি করাবো।
তাল বুঝিয়ে দিয়ে ছন্দের তালে তালে গানটি কয়েকবার গাইতে সহায়তা করবো।</td></tr>
</table>

ন	দলগতভাবে সুর, লয় ও তাল বজায় রেখে গানটি কয়েকবার গাইতে সহায়তা দেব। শিক্ষক নির্দেশিকায় প্রদত্ত স্বরলিপি অনুযায়ী সম্ভাব্য ক্ষেত্রে হারমোনিয়াম ও তবলার সহযোগে গানটি শিখতে সহায়তা দেব। প্রয়োজনে সিডি, মোবাইল ফোন বা মাল্টিমিডিয়ার সাহায্যে শেখাবো।
মূ ল্য য় ন	আজকের শিখনফল কত নম্পরূপভাবে যাচা প্রথমে স স্বরে গান গাই ছোট দল করে কয়েক জনকে একা

বিভিন্ন প্রকার বাদ্যযন্ত্রের ছবি

হারমোনিয়াম

পিয়ানো

তানপুরা

ডুগি তবলা

মৃদঙ্গ

মন্দিরা

গিটার

বাঁশি

একতারা

শিক্ষাক্রম

কোন কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে চাইলে কাজটি আরম্ভ করার পূর্বেই একটি পরিকল্পনা করতে হয় এবং পরিকল্পনা অনুসরণ করে কাজটি সম্পন্ন করতে হয়। কোন কাজ থেকে কী ফল পাওয়া যাবে, ঐ ফল লাভের জন্য কীভাবে কাজটি করতে হবে, কত সময় ধরে করতে হবে, কাজটি করতে কী লাগবে, কারা কাজটি করবে এবং কখন করবে, কাঙ্খিত ফল লাভ করা হলো কি-না তা কীভাবে মূল্যায়ন করা হবে, তার সবকিছুই পরিকল্পনায় সুনির্দিষ্ট করা থাকে। শিক্ষা ক্ষেত্রে এ ধরনের সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনাই হল শিক্ষাক্রম। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন কমিটি প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নের জন্য শিক্ষাক্রম বিস্তৃতভাবে প্রণয়ন করেছে।

নিম্নে বিস্তৃত শিক্ষাক্রম থেকে একটি বিষয়ের বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতার বিন্যাস দেখানো হল।

বিস্তৃত শিক্ষাক্রম
বিষয়: সংগীত
শ্রেণি: প্রথম

বষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা	অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	শিখনফল	বিষয়বস্তু	পরিকল্পিত কাজ	লেখক ও অঙ্কন শিল্পীদের জন্য নির্দেশনা
১. ছড়া গান গাইতে পারা।	১.১ ছড়া গানটি শুনবে, আবৃত্তি করবে এবং গাইতে পারবে।	১.১.১ ছড়াগানটির সাথে পরিচিত হবে। ১.১.২ তালে তালে ছড়াগানটি আবৃত্তি করতে পারবে। ১.১.৩ তালে এবং সুরে ছড়াগানটি গাইতে পারবে।	১.১ নজরুল ইসলাম বাবুরচিত এবং খন্দকার নুরুল আলম সুরারোপিত 'প্রিয় ফুল শাপলা ফুল' ছড়া গান।	১.১.১.১ শিক্ষককে বেশ কয়েকবার ছড়াগানটি আবৃত্তি করে শিক্ষার্থীদের শোনাতে হবে। ১.১.২.১ শিক্ষককে শিক্ষার্থীদের সাথে নিয়ে বেশ কয়েকবার ছড়াগানটি আবৃত্তি করতে হবে। ১.১.৩.১ শিক্ষক নির্দেশিকায় প্রদত্ত স্বরলিপি অনুযায়ী শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে গানটি তালে তালে গেয়ে শোনাবেন। ১.১.৩.২ শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে নিয়ে সম্ভাব্য ক্ষেত্রে হারমোনিয়াম, তবলা সহযোগে তালে তালে গানটি গাইবেন।	শিক্ষক নির্দেশিকাস্পরিচয়, স্বরের নাম, গানের অংশ, তাল পরিচয়, তাল চর্চা, আবৃত্তি ও উচ্চারণ আকারমাত্রিস্বরলিপি অনুসরণ পদ্ধতি, কয়েকজন স্বনামধন্য সংগীত সাধকের, কয়েকটি অতি পরিচিত বাদ্যযন্ত্রের ছবি, স্বরলিপিসহ ছড়াগান, স্বরলিপিসহ জাতীয় সংগীত ও শিখন-শেখানোকার্যাবলি অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১. করুণাময় গোস্বামী (১৯৯৫), সংগীত কোষ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

২. জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (২০১৩), শিক্ষক নির্দেশিকা, সংগীত, ঢাকা।

৩. নিরেশ চন্দ্র মুখার্জী (২০১৩), বিষয় ভিত্তিক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল-সংগীত, প্রশিক্ষণ বিভাগ, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

৪. নিরেশ চন্দ্র মুখার্জী (২০১৫), এক্সপ্রেসিভ আর্ট-সংগীত, তথ্যপুস্তক, নেপ, ময়মনসিংহ।

শারীরিক শিক্ষা

প্রথম অধ্যায়

সর্বাঙ্গীন বিকাশে শারীরিক শিক্ষা

শারীরিক শিক্ষা মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণীর আদিম ও স্বাভাবিক শিক্ষা। মানবজাতির জন্মের পর নিরাপত্তা ও জীবিকা নির্বাহের পন্থা হিসেবেএটিকে অবলম্বন করা হয়। শারীরিক শিক্ষার ক্ষেত্রে যতই চিন্তা ভাবনা ও গবেষণা করা হচ্ছে সময় ও পরিস্থিতির সাথে সাথে এর ধ্যান-ধারণাও পরিবর্তন, পরিবর্ধন হচ্ছে। প্রাচীনকালের শারীরিক শিক্ষা ছিল শুধু দৈহিক উন্নতি, ও শক্তিশালী মাংসপেশী তৈরি।

বর্তমানে শারীরিক শিক্ষা একদিকে জ্ঞানের একটি বিশেষ ক্ষেত্র হিসেবে (discipline) অন্যদিকে একটি পেশা হিসেবে (profession) প্রতিষ্ঠিত। জ্ঞানের ক্ষেত্র হিসেবে শারীরিক শিক্ষা পঠন-পাঠন এবং গবেষণা নিয়ে যুক্ত এবং বৃত্তি হিসেবে শারীরিক শিক্ষা তার জ্ঞানকে মানব কল্যাণে প্রয়োগ করে।

শারীরিক শিক্ষা ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশে সবচেয়ে কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে পারে, যদি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শারীরিক শিক্ষার কার্যক্রম যথাযথভাবে সংগঠিত ও পরিচালিত করা যায়।

মানবসত্তার দ্বৈতবাদ শরীর ও মন থেকে যার সৃষ্টি। তাই সাধারণ ধারণায় শারীরিক শিক্ষার অর্থ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে শারীরিক (Physical) শব্দটির উপর অধিকতর গুরুত্ব দেওয়ার একটি স্বাভাবিক প্রবণতা দেখা যায়। ফলে শারীরিক শিক্ষা তার স্বকীয়তা হারিয়ে ভুলভাবে উপস্থাপিত হয় এবং সংকীর্ণ হয়ে পড়ে। যার ফলে শিক্ষার লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য শারীরিক শিক্ষার আবদান সমাজের কাছে অজ্ঞাত থেকে যায়। এর ফলে শিক্ষা (Education) একদিকে যেমন অসম্পূর্ণ হয়ে পড়ে অন্যদিকে সমাজ শারীরিক শিক্ষার কল্যাণকর অবদান থেকে বঞ্চিত হয়। তাই ব্যক্তি, সমাজ ও দেশের স্বার্থে শারীরিক শিক্ষার সত্যিকার অর্থ বোঝা প্রয়োজন।

শারীরিক শিক্ষার অর্থ বোঝার জন্য বিশেষ্য পদ (noun) শিক্ষার (Education) ওপর জোর দিতে হবে। বিশেষণ পদ শারীরিক (physical)এর ওপর নয়। এখানে বিশেষণ পদ শারীরিক (physical) শুধুমাত্র উপায় নির্দেশ করে। শারীরিক শিক্ষার লক্ষ্য শুধু শারীরিক উন্নতি সাধন নয় শারীরিক কার্যাবলির মধ্য দিয়ে সমগ্র ব্যক্তি সত্তার উন্নতি সাধন। শিক্ষার লক্ষ্যই শারীরিক শিক্ষার লক্ষ্য। শারীরিক শিক্ষা এই লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করে আনন্দদায়ক খেলাধুলাকে যা শিশুর জন্মগত প্রবণতা এবং যার প্রতি শিশুর স্বাভাবিক আকর্ষণ চিরন্তন।

এজন্য প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে শিশু-শিক্ষার্থীদের সুস্থ্য স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও বিকাশে শারীরিক শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। খেলাধুলার মাধ্যমে শিশু অফুরন্ত আনন্দ লাভ করে, ভীতি ও জড়তামুক্ত হয়ে কাজে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে। শারীরিক শিক্ষা শিক্ষার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। খেলাধুলার প্রতি শিশুর স্বাভাবিক ও অফুরন্ত আগ্রহকে সুষ্ঠুভাবে ও সঠিক পথে পরিচালনা করে তাকে ব্যক্তি, সমাজ ও জাতীয় জীবনে একজন দক্ষ, যোগ্য ও সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব।

শারীরিক শিক্ষার সংজ্ঞা

সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে শারীরিক শিক্ষার ধ্যান-ধারণাও অনেক পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হয়েছে। শারীরিক শিক্ষা আজ আর শুধুমাত্র শরীর গঠন, শারীরিক কসরত ও শারীরিক উন্নয়নের মাঝেই সীমাবদ্ধ নয়। যেমন অতীতে শারীরিক শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ছিলো- শারীরিক উন্নতি আর আধুনিক শারীরিক শিক্ষার উদ্দেশ্য হলো ব্যক্তিসত্তার সুষম বিকাশ সাধন।

* ডি. কে. ম্যাথিউস শারীরিক শিক্ষার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন- "শারীরিক কার্যকলাপের দ্বারা বা মাধ্যমে অর্জিত শিক্ষাই শারীরিক শিক্ষা।"

* স্মিথ ও ক্লিফটন বলেছেন- "বিজ্ঞানসম্মত ও কৌশলগত অঙ্গসঞ্চালনের নাম শারীরিক শিক্ষা।

* বিউকার (C. A. Bucher) শারীরিক শিক্ষার সংজ্ঞা হিসেবে বলেন শারীরিক শিক্ষা হলো শিক্ষার অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং শারীরিক শিক্ষা সুনির্বাচিত শারীরিক কাজকর্মের মাধ্যমে শারীরিক, মানসিক, প্রাক্ষোভিক এবং সামাজিক দিক দিয়ে উপযুক্ত নাগরিক গড়ে তোলার লক্ষ্যে পৌঁছানোর এক প্রচেষ্টা (Physical education, an integral part of total education process, is a field of endeavour which has its aim the development of physically, mentally, emotionally and socially fit citizen through the medium of physical activities which have been selected with a view to realizing these outcomes).

* Baley I Field শারীরিক শিক্ষা সম্বন্ধে বলেছেন- শারীরিক শিক্ষা হলো এমন এক পদ্ধতি যার মাধ্যমে সুনির্বাচিত শারীরিক কাজে যোগদানের সাহায্যে পরিবেশের সাথে মানিয়ে নেয়া যায় এবং দৈহিক, কৌশলগত, বৌদ্ধিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, প্রাক্ষোভিক এবং সৌন্দর্যমূলক শিক্ষা পাওয়া যায় (Physical education is a process through which favorable adaptations and learning organic neuromuscular, intellectual, social, cultural, emotional and aesthetic result from selected fairly vigorous physical activities).

পরিশেষে বলা যায়, যে শিক্ষার মাধ্যমে ব্যক্তি দৈহিক, মানসিক, সামাজিক, নৈতিক, সাংস্কৃতিক ও নান্দনিক বিকাশ সাধনের মাধ্যমে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠে তাকে শারীরিক শিক্ষা বলে।

শারীরিক শিক্ষার শ্রেণিবিভাগ

শারীরিক শিক্ষার বিষয়সমূহকে সাধারণত দু’ভাগে ভাগ করা হয়- ব্যবহারিক বিষয় এবং তত্ত্বীয় বিষয়

আবার শারীরিক শিক্ষার ব্যবহারিক বিষয়সমূহকে বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়। শ্রেণিবিভাগসমূহ নিম্নরূপ:

১) প্রধান খেলা (মেজর গেইম): ফুটবল, ক্রিকেট, হকি, বাস্কেট বল, হ্যান্ডবল, ভলিবল।

২) স্বল্প পরিসর খেলা (স্মল এরিয়া গেইম): কাবাডি, ব্যাডমিন্টন, টেবিল টেনিস, টেনিস ও খো-খো।

৩) জিমন্যাস্টিক্স: জিমন্যাস্টিক্সকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা যায় যেমন,

ক) মৌলিক জিমন্যাস্টিক্স: প্রতিদিন কোন সময় নিয়মিতভাবে কোন বিশেষ পদ্ধতিতে সহজ কিছু ব্যায়ামের কর্মসূচী যা ব্যক্তির সর্বাঙ্গীন যোগ্যতা বৃদ্ধি করে। মৌলিক জিমন্যাস্টিক্সের একটি বড় অংশ জুড়ে আছে শিক্ষামূলক জিমন্যাস্টিক্স। শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশের লক্ষ্যে কিছু বিশেষ ব্যায়াম যা “শারীরিক শিক্ষা” এর কর্মসূচী হিসেবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অনুশীলন করানো হয়। যেমন:- দৌঁড়ানো, জাম্পিং, ফ্রন্টরোল, ব্যাকরোল, কার্টহুইল, রোমান রিং, হেডস্ট্যান্ড, হ্যান্ডস্ট্যান্ড ইত্যাদি।

খ) ক্রীড়া জিমন্যাস্টিক্স: ক্রীড়া জিমন্যাস্টিক্স একটি প্রতিযোগিতামূলক ক্রীড়া। এতে এগুলো বিভিন্ন ধরনের যেমন: অলিম্পিক, বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ, আন্ত:মহাদেশীয়, আঞ্চলিক ও জাতীয় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। তাই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ এবং সর্বোচ্চ দক্ষতা অর্জন ক্রীড়া জিমন্যাস্টিক্সের মূল উদ্দেশ্য। ইভেন্ট- প্যারালাল বার, হরাইজেন্টাল বার, রোমান রিং, পমেল হর্স, লং হর্স, বীম, ফ্লোর/গ্রাউন্ড এক্সারসাইজ ইত্যাদি।

গ) সাহায্যকারী জিমন্যাস্টিক্স: সাহায্যকারী জিমন্যাস্টিক্স সরাসরি মৌলিক বা ক্রীড়া জিমন্যাস্টিক্স এর মত নয়। আবার এর বর্হিভূত ও নয়। তবে এর ব্যায়ামগুলো বিশেষ শ্রেণির ব্যক্তি যেমন- শারীরিকভাবে অসুস্থ বা অপ্রকৃতিস্থ, কর্মজীবী, ক্রীড়াবিদ, প্রতিরক্ষাকর্মীগণ নিয়মিত বা অনিয়মিতভাবে বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বনে অনুশীলন করে এই ধরনের জিমন্যাস্টিক্স চিকিৎসা ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় বলে একে প্রতিকারমূলক বা মেডিক্যাল জিমন্যাস্টিক্সও বলা হয়।

৪) এ্যাথলেটিক্স:

ক) ওয়ার্ম আপ এবং সংশ্লিষ্ট ক্রীড়ার জন্য কন্ডিশনিং ব্যায়াম

খ) ট্রাক ইভেন্টস- বিভিন্ন দূরত্বের দৌড়, হার্ডলস ও রীলে

গ) ফিল্ড ইভেন্টস- উচ্চলাফ, দীর্ঘলাফ, পোলভল্ট, হপষ্টেপ এন্ড জাম্প

ঘ) থ্রোয়িং ইভেন্টস- ডিসকাস, শর্টপুট, জেভলিন, হ্যামার থ্রো।

৫) একোয়াটিক্স (জল-ক্রীড়া):

ক) ফ্লোটিং- বিভিন্ন ধরনের ফ্লোটিং

খ) সাঁতার- মুক্ত সাঁতার, চিৎ সাঁতার, বুক সাঁতার, প্রজাপতি সাঁতার

খ) লাইফ সেভিং- রিলিজ মেথড, রেসকিউ মেথড এবং কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাস প্রদান।

ঘ) আত্মরক্ষামূলক কলাকৌশল (ডিফেনসিভ অব আর্টস):- স্কোয়াড ডিল, বক্সিং, কুস্তি, জুডো, কারাত।

৬) রিদমিক্স একটিভিটিস: মার্চ পিটি, মাইনর গেমস (সরঞ্জামসহ ও সরঞ্জাম ছাড়া), ক্যালেস্থনিক, এ্যারোবিবাস।

শারীরিক শিক্ষার তত্ত্বীয় বিষয়সমূহ

ক) শারীরিক শিক্ষার তত্ত্ব ও নীতি

খ) শারীরিক শিক্ষার ইতিহাস

গ) শারীরিক শিক্ষার শিক্ষাদান পদ্ধতি

ঘ) খেলাধুলার নিয়ম কানুন

ঙ) শিক্ষা ও ক্রীড়া মনোবিজ্ঞান

চ) শারীরিক শিক্ষার সংগঠন ও প্রশাসন

ছ) এনাটমী ও স্পোর্টস ফিজিওলজী এবং

জ) স্বাস্থ্য শিক্ষা ও প্রাথমিক চিকিৎসা

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শারীরিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হলো সামাজিক প্রতিষ্ঠান। তাই সমাজ সংরক্ষণ, সমাজ সংস্কার ও ধনাত্মক সামাজিক পরিবর্তনের কাজে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমাজ ও দেশের কাছে দায়বদ্ধ। দেশের মানব সম্পদকে সঠিকভাবে বিকশিত করা এবং আজকের শিশুকে আগামী দিনের সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার দায়িত্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উপর ন্যস্ত। এ ব্যাপারে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় কাজ মূলত দ্বিমুখী। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রথম কাজ হলো শিশু শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত বিকাশ সাধান (Personal development),এর মধ্যে শিক্ষার্থীর শারীরিক, মানসিক ও আত্মিক দিক অন্তর্ভূক্ত। শিক্ষার্থীর জন্মসূত্রে পাওয়া সম্ভাবনাসমূহের যথাযথ পরিচর্যা ও বিকাশ ঘটানোর দায়িত্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দ্বিতীয় কাজ হলো শিশু শিক্ষার্থীকে জৈবিক সত্তা থেকে সামাজিক সত্তায় রূপান্তরিত করা। এর মধ্যে শিশুর চারিত্রিক ও মূল্যবোধের উন্নতি এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিকের বিকাশ অন্তর্ভূক্ত। এই দুই কাজের মধ্যে প্রথমটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রত্যক্ষ কাজ এবং দ্বিতীয়টি তার পরোক্ষ দায়িত্ব।

সার্থকভাবে উপরিউক্ত দায়িত্ব পালনের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে একদিকে শিশুর ব্যক্তিগত বিকাশের প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ এবং অন্যদিকে সমাজের প্রয়োজনীয় দিকসমূহ খেয়াল করতে হবে। প্রয়োজন (need) হলো কোন কিছুর অভাবজনিত অসুবিধা। যেহেতু শারীরিক শিক্ষা ছাড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক দায়িত্ব পালন সম্ভব নয় তাই এক্ষেত্রে শারীরিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্যে শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীন বিকাশ সাধনের ক্ষেত্রে শারীরিক শিক্ষার ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। তাই বর্তমান শিক্ষানীতিতে শারীরিক শিক্ষাকে পাঠ্যক্রম বহির্ভূত উদেশ্যবিহীন খেলাধূলার কার্যক্রম হিসেবে মনে করা হয় না, বরং শিশুর সুষম ব্যক্তিত্ব বিকাশের এবং সামাজিককরণের এক আবশ্যিক ও গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে গণ্য করা হয়। শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীণ বিকাশের জন্য শারীরিক শিক্ষার প্রয়োজনই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শারীরিক শিক্ষার প্রয়োজন সূচীত করে। ম্যাসলোর (Maslow) মতে শিক্ষার্থীর প্রয়োজন তিনটি স্তরে সাজানো। প্রথম স্তরে থাকে তার শারীরিক ও শারীরবৃত্তীয় প্রয়োজন (Biological need) জৈবিক অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য এ সমস্ত প্রয়োজন পূরণ হওয়া আবশ্যক। খাদ্য, পানীয়, বাসস্থান এর মতো শারীরিক ব্যায়াম ও বিশ্রাম এ বিভাগের অন্তর্গত। দ্বিতীয় স্তরে থাকে মানসিক ও আত্মিক পরিপূর্ণতার প্রয়োজন (Psychological need)। এর মধ্যে থাকে জ্ঞান ও বুদ্ধির বিকাশ, আত্মচেতনা, আত্ম উপলব্ধি ও প্রাক্ষেভিক সাম্য ইত্যাদি। তৃতীয় স্তরের প্রয়োজন হলো সামাজিক প্রয়োজন (Social need)। ব্যক্তির ব্যবাহারিক ও সামাজিক দিক এবং মূল্যবোধ এই বিভাগীয় প্রয়োজনের অন্তর্গত। এই সমস্ত প্রয়োজন পূরণের ক্ষেত্রে শারীরিক শিক্ষার ভূমিকা নিম্নরূপ।

শারীরিক ও শারীরবৃত্তীয় প্রয়োজন

শিক্ষার্থীর শারীরিক ও শারীরবৃত্তীয় প্রয়োজন পূরণে শারীরিক শিক্ষার ভূমিকা প্রত্যক্ষ যা অন্য কোনভাবে সম্ভব নয়। এ ব্যাপারে শারীরিক শিক্ষার ভূমিকা হলো:

১. শারীরিক শিক্ষা শিক্ষার্থীর দৈহিক গঠন সুন্দর ও মজবুত করে;
২. শারীরিক শিক্ষা শিক্ষার্থীর শারীরিক সক্ষমতার উন্নতি করে;
৩. শারীরিক শিক্ষা শিক্ষার্থীকে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে;
৪. শারীরিক শিক্ষা শিক্ষার্থীকে খেলাধুলার কৌশল শেখায়;
৫. শারীরিক শিক্ষা কার্যক্রম শিক্ষার্থীর দৈনন্দিন জীবন যাপনের প্রয়োজনীয় কাজকর্ম সাবলীলভাবে করার সামর্থ বাড়ায়;
৬. শারীরিক শিক্ষা শিক্ষার্থীর সুস্থ্য মনের জন্য সুস্থ্য শরীর গড়ে তোলে।

মানসিক প্রয়োজন

ব্যক্তির মানসিক বিকাশে শারীরিক শিক্ষা পরোক্ষভাবে সাহায্য করে। এ ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলি হলো:

১. শারীরিক শিক্ষাসূচী শ্রেণি কক্ষে পড়াশুনার, একঘেয়েমি দূর করে।
২. শারীরিক শিক্ষা চারিত্রিক গুণাবলীর বিকাশ ঘটায়।
৩. খেলাধূলার মাধ্যমে শিক্ষার্থী ক্রোধ, রাগ ইত্যাদি প্রবৃত্তিসমূহের সমাজ স্বীকৃতভাবে প্রকাশের শিক্ষা পায়।
৪. শারীরিক শিক্ষা শিক্ষার্থীর আত্মসচেতনতা, আত্ম নির্ভরতা, আত্ম উপলব্ধি ও আত্ম শ্রদ্ধা বাড়িয়ে তোলে।
৫. শারীরিক শিক্ষা শিক্ষার্থীকে পরিবেশের সাথে মানিয়ে নেওয়ায় সাহায্য করে।
৬. শারীরিক শিক্ষা শিক্ষার্থীর মনে সৃজনশীলতার অনুভূতি জাগ্রত করে।
৭. খেলাধুলায় অংশগ্রহণ শিক্ষার্থীকে সকল ক্ষতিকর নেশা থেকে দূরে রাখে।
৮. খেলাধুলায় অংশগ্রহণ সাধারণভাবে শিশুর কাছে আনন্দদায়ক।
৯. শারীরিক শিক্ষা শিক্ষার্থীকে খেলাধুলায় অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অবহিত করে এবং খেলাধুলার প্রতি ধনাত্মক মনোভাব গড়ে তোলে।

সামাজিক প্রয়োজন

শিশু সামাজিক হয়ে জন্মগ্রহণ করে না। জন্মের পর শিশুকে সামাজিক গুণাবলী আয়ত্ব করতে হয় বুদ্ধি বিকাশের সাথে সাথে। এ ব্যাপারে যে সকল প্রতিষ্ঠান শিশুকে সাহায্য করে তাদের মধ্যে প্রধান হলো পরিবার, সমাজ এবং শিক্ষা। শিশুর সামাজিক প্রয়োজন পূরণ করার শারীরিক শিক্ষার ভূমিকা হলো:

১. খেলাধুলায় সামাজিক সম্পর্কের প্রতিফলন ঘটে। তাই শারীরিক শিক্ষা ধনাত্মক মানবিক সম্পর্ক স্থাপনে শিক্ষার্থীকে পারদর্শী করে।
২. শারীরিক শিক্ষা শিক্ষার্থীর মধ্যে অন্তর্ভুক্তিবোধ জাগায় এবং দলের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালনে উদ্বুদ্ধ করে।
৩. শারীরিক শিক্ষা নেতৃত্বদানের ক্ষমতার বিকাশ ঘটায়।
৪. শারীরিক শিক্ষা দেশ ও সমাজের সংস্কৃতির সাথে পরিচয় ঘটায়।
৫. শারীরিক শিক্ষা মূল্যবোধে বিকাশ ঘটায় এবং জীবনাদর্শ গড়ে তোলে।
৬. শারীরিক শিক্ষা ধনী-দরিদ্র, উঁচু নীচুও জাতপাতের সামাজিক ভেদাভেদ দূরত্ব করে শিক্ষার্থীর উদার মানসিকতা সৃষ্টি করে।
৭. শারীরিক শিক্ষা শিক্ষার্থীর মধ্যে গণতান্ত্রিক মনোভাব গড়ে তোলে ও গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে তোলে।

৮. দ্বিতীয় অধ্যায়
খেলাধুলার নিয়ম কানুন ও কৌশল

খেলাধুলা বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য অপরিহার্য। খেলাধুলা শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ ঘটায় এবং সামাজিক গুণাবলি অর্জনে সাহায্য করে। তবে খেলাধুলা শিখতে হলে প্রথমে জানতে হবে নিয়ম কানুন বা আইন জানা । নিয়ম না জানলে খেলাধুলা শেখা যায় না। খেলাধুলার মূল লক্ষ্য হচ্ছে চিত্তবিনোদনের মাধ্যমে শারীরিক ও মানসিক বিকাশ সাধন। খেলাধুলা শরীর ও মনকে সতেজ রাখে এবং শরীর গঠনের সাথে সাথে সুন্দর চরিত্র গঠনে সহায়তা করে। দলীয় ও একক খেলা শিক্ষার্থীদেরকে দলীয় আনুগত্য, আইন মেনে চলা, নেতার নির্দেশ পালন করা, শৃঙ্খলাবোধ সমুন্নত রাখা ও বিভিন্ন সামাজিক গুণাবলি অর্জন করার মাধ্যমে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে সাহায্য করে।

প্রধান খেলা (মেজর গেমস্)

ফুটবল

ফুটবল খেলার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

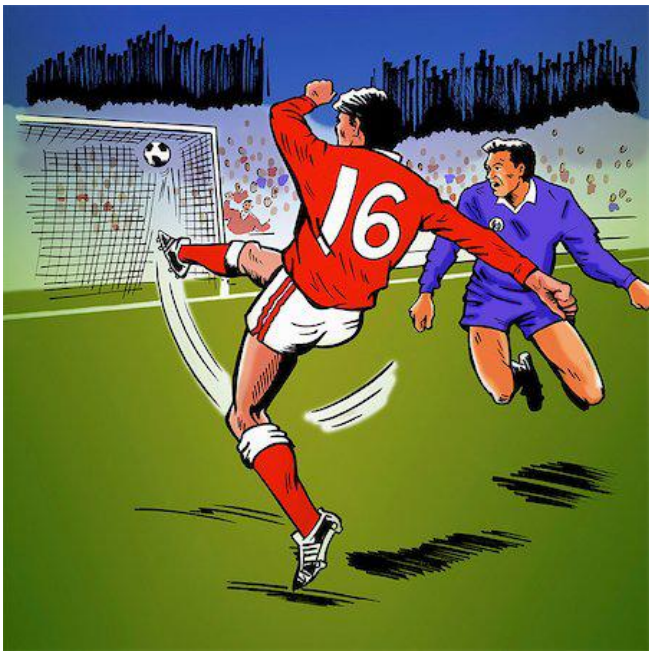

বিশ্বে সবচেয়ে জনপ্রিয় খেলা ফুটবল। এমন কোন দেশ নেই, যেখানে ফুটবল খেলা হয় না। ফুটবলের উৎপত্তির ইতিহাস নিয়ে তর্ক-বিতর্ক যতই থাকুন না কেন আধুনিক ফুটবলের রূপকার ইংল্যান্ড। ১৮৪৮ সনে প্রথমে ফুটবলের নিয়মাবলি লিপিবদ্ধ হয়। ইংরেজরা তাদের উপনিবেশ বিস্তারের সাথে সাথে বিশ্বে ফুটবল ছড়িয়ে দেয়। ১৯০৪ সালে ফুটবলের আন্তর্জাতিক সংস্থা ফিফা গঠিত হয়। ১৯০০ সালে প্যারিস অলিম্পিক গেমসে ফুটবল খেলা স্থান পায়। ১৯৩০ সালে শুরু হয় প্রথম বিশ্বকাপ ফুটবল খেলা।

বাংলাদেশে এই খেলাটি বহুল পরিচিত। রাজধানী ঢাকা থেকে শুরু করে গ্রামগঞ্জেও এই খেলাটির সমান জনপ্রিয়তা রয়েছে। বাংলাদেশে আন্ত:স্কুল,আন্ত:কলেজ, আন্ত:বিশ্ববিদ্যালয় এবং জাতীয় পর্যায়ে ফুটবল খেলার প্রতিযোগিতা হয়। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য আয়োজিত বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গমাতা জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগীতা বাংলাদেশের ফুটবলে এক নতুন অধ্যায়ের সুচনা করেছে। ফুটবল খেলার মাধ্যমে শারীরিক ক্ষমতা, ক্ষিপ্রতা, আত্মবিশ্বাস, দৃঢ়তা, দলীয় একাত্মবোধ, সমঝোতা এবং নেতৃত্বদান ক্ষমতা ইত্যাদি গুণাবলি বৃদ্ধি পায়। বিশ্ব ফুটবলের সর্বোচ্চ সংস্থা Federation International de Football Association(FIFA)বিশ্বকাপ ফুটবল আয়োজন করে থাকেন। এছাড়াও দ্যা ইউনিয়ন অফ ইউরোপিয়ান ফুটবল এসোসিয়েশণ(UEFA),এশিয়ান ফুটবল কনফেডারেশন (AFC),

দ্যা সাউথ এ্যামেরিকান ফুটবল কনফেডারেশন (CONMEBOL),ওশেনিয়া ফুটবল কনফেডারেশন (OFC) বিভিন্ন প্রতিযোগিতার আয়োজন করে থাকে।

ফুটবল খেলার নিয়ম কানুন

(১) ফুটবল খেলার মাঠ

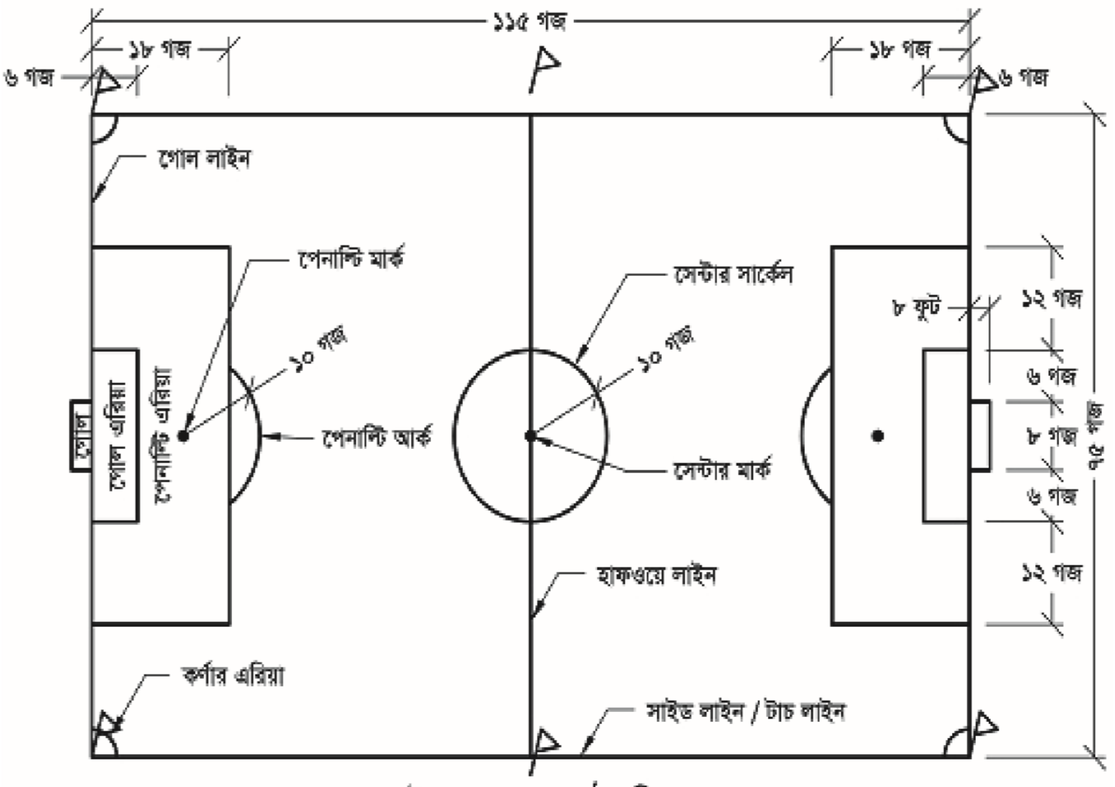

ফুটবল খেলার মাঠের চিত্র

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ফুটবল খেলার মাঠের দৈর্ঘ্য সর্বনিম্ন ১১০ গজ (১০০ মিটার), সর্বোচ্চ ১২০ গজ (১০৪ মিটার) এবং প্রস্থ সর্বনিম্ন ৭০ গজ (৬৪ মিটার), সর্বোচ্চ ৮০ গজ (৬৮.০৫ মিটার)।

ফুটবল মাঠের আন্তর্জাতিক মাপ {দৈর্ঘ্য ১২০ গজ, প্রস্থ ৮০ গজ}

{দৈর্ঘ্য ১১৫ গজ, প্রস্থ ৭৫ গজ}

{দৈর্ঘ্য ১১০ গজ, প্রস্থ ৭০ গজ}

(২) **বল**

গোলাকার। চামড়া অথবা অন্য কোন উপযুক্ত চামড়া জাতীয় পদার্থ দ্বারা তৈরি হবে। বলের পরিধি ৭০ সে.মি. (২৮ ইঞ্চি) এর বেশি এবং ৬৮ সে.মি. (২৭ ইঞ্চি) এর কম হবে না। খেলা আরম্ভের সময় বলের ওজন ৪১০ গ্রামের (১৪ আউন্স) কম এবং ৪৫০ গ্রামের (১৬ আউন্স) বেশি হবে না।

(৩) **খেলোয়াড়ের সংখ্যা**

প্রতি দল ১৬ জন খেলোয়াড়ের সমন্বয়ে গঠিত হবে। ১১ জন খেলোয়াড় একসাথে মাঠে খেলবে। এই ১১ জন খেলোয়াড়ের মধ্যে একজন গোলরক্ষক থাকবে। কোন অবস্থাতেই ৭ জনের কম খেলোয়াড় নিয়ে খেলা আরম্ভ করা যাবে না। উভয় দলের পারস্পরিক সম্মতিক্রমে সর্বাধিক ৫ জন খেলোয়াড় বদল করা যাবে।

(৪) **খেলোয়াড়ের সাজ-সরঞ্জাম**

একজন খেলোয়াড়ের মৌলিক বা বাধ্যতামূলক সাজ-সরঞ্জাম হচ্ছে: শার্ট (Shirt/Jersey), শর্টস (Shorts), মোজা (Shoks), শিনগার্ড (Shinguards), জুতা (Footwear)| অন্য খেলোয়াড়ের জন্য বিপজ্জনক হতে পারে এমন কোন বস্তু বা পোশাক পরিধান করা যাবে না।

(৫) **রেফারি**

নিয়োগ প্রাপ্ত একজন রেফারির দ্বারা প্রত্যেকটি খেলা পরিচালিত হয়ে থাকে। খেলার সাথে সম্পর্কিত আইনের বিধানাবলি প্রয়োগের ক্ষেত্রে তিনিই হচ্ছেন একমাত্র অধিকারসম্পন্ন ব্যক্তি।

(৬) **সহকারি রেফারি**

একটি খেলায় দুইজন সহকারি রেফারি নিযুক্ত থাকেন। তাঁরা আইন অনুযায়ী রেফারিকে খেলা পরিচালনায় সহযোগিতা করেন এবং মাঠের বাইরে একজন চতুর্থ অফিসিয়াল থাকেন। তিনিও খেলা পরিচালনার ব্যাপারে রেফারিকে সহযোগিতা করেন। এছাড়াও গোল লাইনে দুইজন গোল জাজ থাকেন, তারা গোল হওয়া না হওয়া সম্পর্কে রেফারিকে সহযোগিতা করেন।

(৭) **খেলার স্থিতিকাল**

প্রতি অর্ধে ৪৫ মিনিট করে দুটি অর্ধে মোট ৯০ মিনিট খেলা হবে। দুই অর্ধের মাঝে বিরতি অবশ্যই ৫ মিনিটের কম এবং ১৫ মিনিটের বেশি হবে না।

(৮) **খেলা আরম্ভ এবং পুনরারম্ভ**

টসের মাধ্যমে খেলা আরম্ভ হবে। যে দল টসে জিতবে সে দল কোন গোলে আক্রমণ করবে অর্থাৎ কোন দিকে দাঁড়াবে তা পছন্দ করবে। অপর পক্ষ কিক-অফ দিয়ে খেলা আরম্ভ করবে। উভয় দলই খেলার দ্বিতীয়ার্ধে প্রান্ত বদল করবে। খেলা আরম্ভ বা পুনরারম্ভের সময় উভয় দল নিজ নিজ অর্ধে অবস্থান করে। রেফারির সংকেতের সাথে সাথে সেন্টার সার্কেলের মধ্যে থেকে কিক-অফের মাধ্যমে খেলা আরম্ভ হয়।

(৯) **বল খেলার মধ্যে ও বাইরে**

বলের সম্পূর্ণ অংশ শূন্য দিয়ে অথবা মাটি গড়িয়ে টাচ্ লাইন অথবা গোল লাইন সম্পূর্ণরূপে অতিক্রম করলে বল খেলার বাইরে বলে ধরা হয়। অন্যদিকে বল দাগের উপরে থাকলে অথবা গোলপোস্ট, ক্রসবার, কর্নার ফ্লাগপোস্ট, রেফারি ও ডেপুটি রেফারির গায়ে লেগে মাঠের মধ্যে ফিরে আসলে বল খেলার মধ্যে গণ্য হবে।

(১০) **গোল হওয়ার পদ্ধতি**

যখন দুই গোলপোস্টের মধ্যে এবং ক্রসবারের নিচে দিয়ে বল শূন্য অথবা মাটি গড়িয়ে গোল লাইন সম্পূর্ণরূপে অতিক্রম করে যায় তখন একটি গোল হয়েছে বলে ধরা হয়। তবে শর্ত থাকে, যে পক্ষ গোল করেছে গোল হওয়ার পূর্বে তাদের দ্বারা খেলার আইন যদি ভংগ না হয়ে থাকে। খেলার সময় যে দল বেশি গোল করবে সে দল জয়ী হবে। উভয় দলের সমান সংখ্যক গোল হলে এই খেলাকে ‘ড্র’ খেলা বলে ধরা হবে। ‘ড্র’ বা অমীমাংসিত খেলার ফলাফল নির্ধারণের জন্য ৩০ মিনিট ‘অতিরিক্ত সময়’-এর পরও অমীমাংসিত থাকলে টাইব্রেকারের মাধ্যমে বিজয়ী দল নির্ধারণ করা হয়।

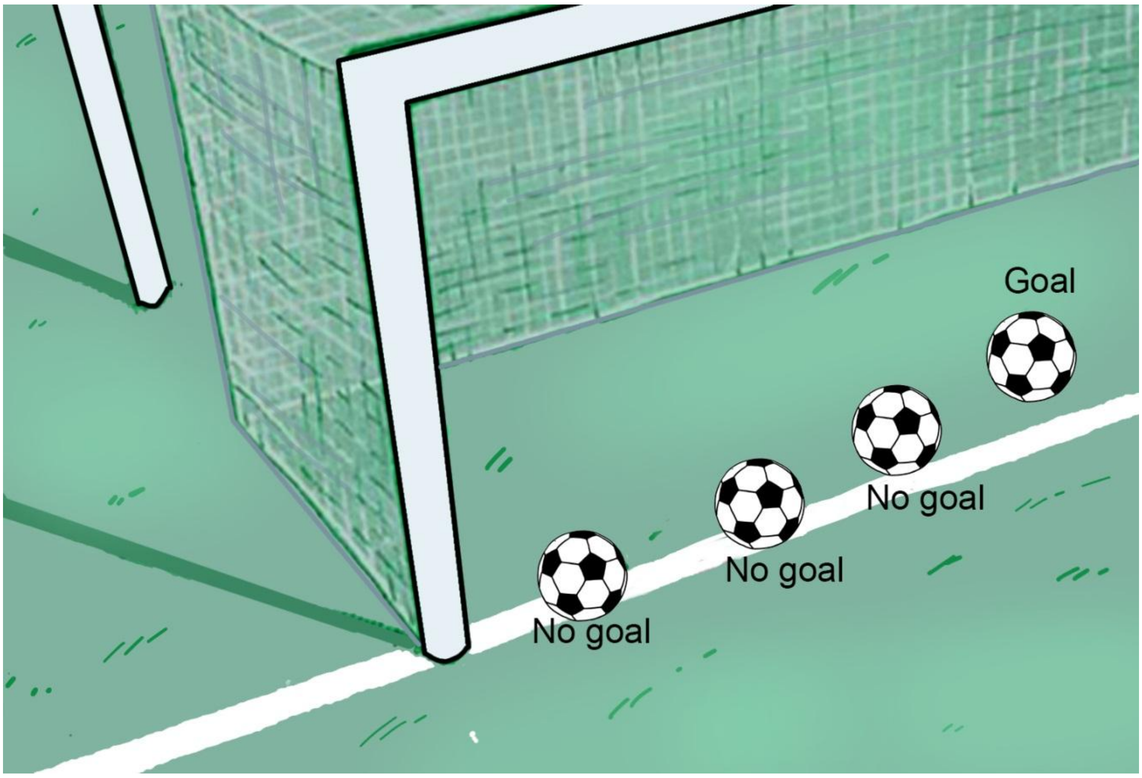

(১১) **অফসাইড**

বল ছাড়া কোন খেলোয়াড় যখন বিপক্ষের অর্ধে অবস্থান করে এবং তার সামনে বিপক্ষের কমপক্ষে ২ জন খেলোয়াড় না থাকে সে অবস্থায় যদি সে নিজ দলের খেলোয়াড়ের কাছ থেকে বল পায় তাহলে অফসাইড হবে। অফসাইড হলে রক্ষণশীল দলের খেলোয়াড় যেখানে অফসাইড হয়েছে সেখান থেকে ইনডাইরেক্ট ফ্রি-কিক গ্রহণ করবে। থ্রো-ইন, গোল কিক, কর্নার কিক থেকে সরাসরি বল পেলে অফসাইড হবে না।

(১২)　**ফাউল এবং অসদাচরণ**

ফাউল বা অসদাচরণ হলে দুই ধরনের ফ্রি কিক দেওয়া হয়।

ক　ডাইরেক্ট ফ্রি-কিক,

খ.　ইনডাইরেক্ট ফ্রি-কিক।

ক　ডাইরেক্ট ফ্রি-কিক

নিচের ১০টি অপরাধের জন্য প্রত্যক্ষ বা ডাইরেক্ট ফ্রি-কিক দেওয়া হয়–

১. বিপক্ষ খেলোয়াড়কে লাথি মারা বা লাথি মারার চেষ্টা করা;

২. বিপক্ষ খেলোয়াড়কে ল্যাং মেরে ফেলে দেওয়া বা ল্যাং মারার চেষ্টা করা;

৩. বিপক্ষ খেলোয়াড়ের উপর লাফিয়ে পড়া;

৪. বিপক্ষ খেলোয়াড়কে চার্জ বা আক্রমণ করা;

৫. বিপক্ষ খেলোয়াড়কে আঘাত করা বা আঘাত করার চেষ্টা করা;

৬. বিপক্ষ খেলোয়াড়কে ধাক্কা দেওয়া;

৭. বল খেলার পূর্বে বিপক্ষ খেলোয়াড়ের সাথে সংঘর্ষ করা;

৮. বিপক্ষ খেলোয়াড়কে আটকানো বা ধরে রাখা;

৯. বিপক্ষ খেলোয়াড়কে থুতু দেওয়া;

১০ ইচ্ছাকৃতভাবে হাত দিয়ে বল ধরা (স্বীয় পেনাল্টি এরিয়ায় গোলরক্ষকের জন্য এই নিয়ম প্রযোজ্য নয়)। অপরাধের স্থান থেকে বিপক্ষ দল একটি ডাইরেক্ট ফ্রি-কিক পাবে।

খ. ইনডাইরেক্ট ফ্রি-কিক

নিম্নের অপরাধগুলোর জন্য পরোক্ষ বা ইনডাইরেক্ট ফ্রি-কিক দেওয়া হয়–

১. বিপজ্জনকভাবে খেলা;

২. বল না খেলে বিপক্ষ খেলোয়াড়ের সম্মুখগতিতে বাধা দেয়া;

৩. গোলরক্ষক বল ছুড়ে দেয়ার সময় তাকে বাধা দেওয়া;

৪. নিজ দলের কোন খেলোয়াড়ের ইচ্ছাকৃত কিক করা বল যদি গোলরক্ষক হাত দিয়ে টাচ্ করে বা ধরে;

৫. গোলরক্ষক বল ছেড়ে দেওয়ার পর অন্য খেলোয়াড় টাচ্ করার পূর্বেই যদি সে পুনরায় বলটি ধরে;

৬. গোলরক্ষক যদি স্বীয় গোল এরিয়ার মধ্যে বিপক্ষ খেলোয়াড়কে বাধা না দিয়ে থাকে, এ অবস্থায় গোলরক্ষককে আক্রমণ করলে;

৭. নিজ দলের কোন খেলোয়াড় কর্তৃক থ্রো-ইন করা বল যদি গোলরক্ষক হাত দিয়ে টাচ্ করে বা ধরে;

৮. গোলরক্ষক বল নিয়ন্ত্রণের পর খেলার মাঠে পাঠানোর আগে যদি ৬ সেকেন্ডের বেশি সময় বল ধরে রাখে;

অপরাধের স্থান থেকে বিপক্ষ দল একটি ইনডাইরেক্ট ফ্রি-কিক পাবে।

(১৮

ফ্রি-কিক

ফ্রি-কিক দুই ধরনের হয়ে থাকে। ডাইরেক্ট ও ইনডাইরেক্ট ফ্রি-কিক। উভয় কিক নেওয়ার সময় বল অবশ্যই স্থির থাকবে এবং অন্য কোন খেলোয়াড়ের টাচ্ না হওয়া পর্যন্ত কিকার দ্বিতীয়বার বল খেলতে পারবে না। ডাইরেক্ট ফ্রিকিক থেকে সরাসরি গোল হয় কিন্তু ইনডাইরেক্ট ফ্রি-কিক থেকে সরাসরি গোল হয় না।

(১ঃ পেনাল্টি কিক

যে ১০টি অপরাধের কারণে ডাইরেক্ট ফ্রি-কিক দেওয়া হয়, গেণ ১০টি অপরাধের যে কোন একটি অপরাধ যদি কোন খেলোয়াড়ের দ্বারা তার নিজস্ব পেনাল্টি এরিয়ার ভিতরে বল খেলার মধ্যে থাকাকালীন সময়ে সংঘটিত হয় তাহলে রেফারি উক্ত দলের বিরুদ্ধে একটি পেনাল্টি কিকের নির্দেশ দিবেন (গোল কিপারের জন্য ১০ নং আইনটি প্রযোজ্য নয়)।

(১৫) থ্রো-ইন

কোন খেলোয়াড়ের সর্বশেষ স্পর্শে বলটি শূন্য দিয়ে অথবা মাটি গড়িয়ে টাচ্ লাইন সম্পূর্ণরূপে অতিক্রম করলে বিপক্ষ দল ঐ স্থান থেকে বল নিক্ষেপের মাধ্যমে খেলা শুরু করে। ঐ নিক্ষেপকে থ্রো-ইন বলে। থ্রো-ইনও খেলা পুনরারম্ভের একটি পদ্ধতি। থ্রো-ইন থেকে সরাসরি গোল হয় না।

(১৬) গোল কিক

দুই গোলপোস্ট বাদে যখন আক্রমণকারী দলের কোন খেলোয়াড়ের সর্বশেষ স্পর্শে বলটি শূন্য দিয়ে অথবা মাটি গড়িয়ে গোল লাইন সম্পূর্ণরূপে অতিক্রম করে তখন যে কিকের মাধ্যমে খেলা শুরু হয় তাকে গোল কিক বলে। এটিও খেলা পুনরারম্ভের একটি পদ্ধতি। গোল কিক থেকে কেবলমাত্র বিপক্ষ দলের বিরুদ্ধে সরাসরি গোল হয়।

(১৭) কর্ণার কিক

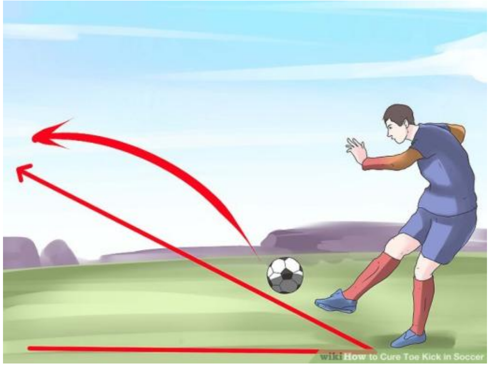

দুই গোলপোস্ট বাদে যখন রক্ষণকারী দলের কোন খেলোয়াড়ের সর্বশেষ স্পর্শে বলটি শূন্য দিয়ে অথবা মাটি গড়িয়ে গোল লাইন সম্পূর্ণরূপে অতিক্রম করে তখন যে কিকের মাধ্যমে খেলা শুরু হয় তাকে কর্নার কিক বলে। নিকটবর্তী

কর্নার ফ্লাগপোস্টের বৃত্তাংশের মধ্যে বল বসিয়ে কর্নার কিক নিতে হয়। এটিও খেলা পুনরারম্ভের একটি পদ্ধতি। কর্নার কিক থেকে সরাসরি গোল হয়।

ফুটবল খেলার কলাকৌশল

কিক করা

ক) লো ড্রাইভ কিক

জোরে নিচু দিয়ে কোন বল অল্প দূরত্বে সোজাসুজি পাঠাতে হলে বলেরদিকে সোজা দৌড়ে আসতে হবে। পায়ের পাতার উপরের অংশ দিয়ে বলের মাঝখানে সজোরে আঘাত করতে হবে। যে পা দিয়ে কিক করবে সে পায়ের হাঁটু এবং কোমর বলের উপর ঝুঁকে থাকবে। অন্য পা বলের পাশে ১৮ থেকে ২০ সে.মি. দূরে প্রায় সোজাসুজি অবস্থান করবে।

খ) হাই ড্রাইভ কিক

বল উঁচু দিয়ে দূরে পাঠাতে হলে সোজা না এসে কোনাকুনি দৌড়ে আসতে হবে এবং বলের মধ্যভাগের একটু নিচে আঘাত করতে হবে। পায়ের পাতার অগ্রভাগ সম্পূর্ণ নিম্নমুখী থাকবে না, কিছুটা বাঁকাভাবে থাকবে।

গ) ফুল ভলি কিক

উপর দিয়ে বল দূরে পাঠাবার জন্য বল মাটিতে পড়ার পূর্বেই বা মাটিতে পড়ার পর বেশ একটু উপরে উঠলে যে কিক করা হয় তাকে ফুল ভলি কিক বলে।

ঘ) হাফ ভলি কিক বল মাটিতে পড়ে ওঠার সাথে সাথে সজোরে যে কিক করা হয় তাকে হাফ ভলি কিক বলে। হাফ ভলি কিক শক্তিশালী হয়।

বল ট্রাপিং

শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ দিয়ে বিভিন্ন কায়দায় বল ট্রাপিং করা যায়।

ক) সোল ট্রাপিং (পায়ের পাতার তলদেশ থেকে বল থামানো) :

পায়ের পাতার সামনের অংশ উপর দিক করে এবং গোড়ালি মাটি থেকে ৮ থেকে ১০ সে.মি. উপরে তুলে, অনেকটা ইংরেজি অক্ষর ‘ভি’ এর মত করে বল থামানোকে সোল ট্রাপিং বলে।

খ) থাই ট্রাপিং:

মোটামুটি লম্বাভাবে আসা বলের গতি উরু উপরে তুলে থামাতে হবে এবং বল উরু স্পর্শ করার সাথে সাথে নিচের দিকে নামিয়ে আনতে হবে।

গ) শিন ট্রাপিং (হাঁটুর নিচের অংশ দিয়ে বল থামানো):

মাটিতে পড়া বল বাউন্স করে উপরে ওঠার সাথে সাথে হাঁটুর নিচের অংশ ভাঁজ করে ইংরেজি অক্ষর ‘ভি’ এর মত করে (পায়ের পাতা পিছনের দিক নিয়ে) বল থামাতে হবে।

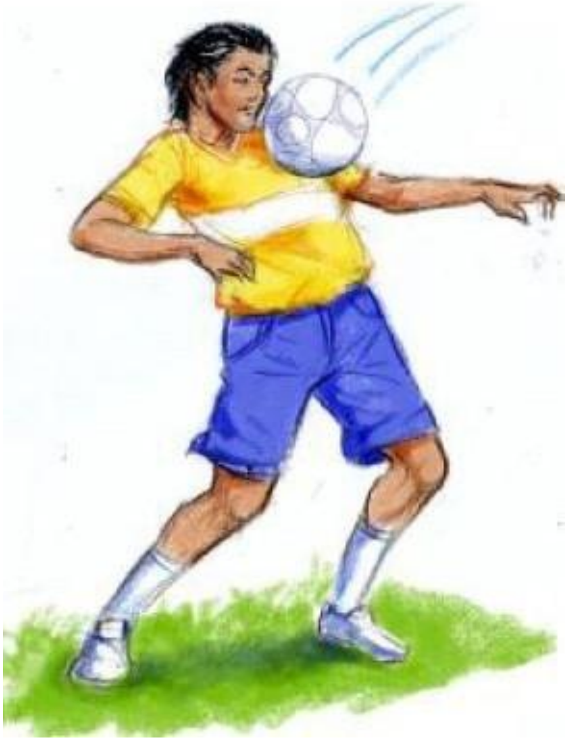

ঘ) চেস্ট ট্রাপিং:

তেরছাভাবে আসা বলের গতি বুকের যে কোন এক পার্শ্ব দিয়ে থামাতে হবে। বল বুক স্পর্শ করার সময় শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ রাখতে হবে।

ঙ) হেড ট্রাপিং:

লম্বা বা তির্যকভাবে আসা বল আস্তে করে মাথায় লাগিয়ে বলের গতি কমাতে হবে। বল মাথা স্পর্শ করার সাথে সাথে মাথা একটু পিছন দিকে নিতে হবে। এসময় ঘাড় নরম থাকবে।

৩. হেড করা

বল হেড করার সময় নিচের বিষয়গুলোর প্রতি খেয়াল রাখতে হবে–

ক) দৃষ্টি বলের দিকে থাকবে (চোখ কখনও বন্ধ থাকবে না)

খ) মাথার সম্মুখ অংশে অর্থাৎ কপাল ও চুলের সন্ধিস্থলে বল লাগাবে অর্থাৎ হেড করার জন্য এ জায়গা ব্যবহার করতে হবে

গ) ঘাড় শক্ত রেখে বলে আঘাত করতে হবে

ঘ) মাথা ঘুরিয়ে বলের দিক পরিবর্তন করতে হবে

ঙ) বল ও প্রতিপক্ষের খেলোয়াড়ের অবস্থান অনুযায়ী দাঁড়িয়ে বা লাফ দিয়ে হেড করতে হবে।

৪. গোল কিপিং

গোলরক্ষক হিসেবে যে বিষয়গুলো লক্ষ্য রাখতে হবে–

ক সব সময় বল কোথায় আছে তার দিকে দৃষ্টি রাখতে হবে

খ. নিচু বল ধরার জন্য শরীর ঠিক বলের পেছনে রাখবে এবং হাঁটু সোজা রেখে সামনে ঝুঁকে দু'হাত দিয়ে বল ধরে বুকের কাছে নিয়ে আসবে

গ. উঁচু বল ধরার জন্য দু'হাত সম্মুখে বা উপরে বাড়িয়ে দু'হাতের তালুর সাহায্যে বল ধরে নিয়ে বুকের কাছে আনবে

ঘ. অনেক উঁচু বল মুষ্টিবদ্ধ হাত দিয়ে ঘুষি মেরে দূরে সরিয়ে দিবে

ঙ একটু দূরে শূন্যের বল ডাইভ দিয়ে ধরবে

ক্রিকেট

ক্রিকেট খেলার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

বর্তমান বিশ্বে ক্রিকেট একটি জনপ্রিয় খেলা। ক্রিকেট খেলা বাংলাদেশে জনপ্রিয়তার শীর্ষে অবস্থান করছে। ক্রিকেট খেলার জন্ম হয় ইংল্যান্ডে। তাই ইংল্যান্ডেকে "ক্রিকেটের পিতৃভূমি" বলা হয়। ১৭১৯ সালে প্রথম কাউন্টি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়। এটি প্রতিদ্বন্দিতা করেন কেন্ট বনাম লন্ডন। ১৮৭৭ সালে মার্চে (১৫-১৭) মেলবোর্নে ইংল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে প্রথম টেস্ট ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়। এই খেলায় অস্ট্রেলিয়া ৪৫ রানে ইংল্যান্ডকে পরাজিত করে। ১৯৭০-৭১ সালে মেলবোর্নে ইংল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ার তৃতীয় টেস্ট বৃষ্টির কারনে পরিত্যক্ত হলে কর্মকর্তারা ঠিক করলেন সীমিত ওভারের খেলার। ফলে ১৯৭১ সালের HB অনুয়ায়ী ইংল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে প্রথম একদিনের আন্তর্জাতিক ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়।

২০০৫ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারী অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডের মধ্যে প্রথম টোয়েন্টি- টোয়েন্টি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়। ২০০৭ সাল থেকে টোয়েন্টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলা শুরু হয়েছে।

বাংলাদেশে ক্রিকেট আজ একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় খেলা। ক্রিকেট খেলা দেশ ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাংলাদেশকে নতুনরূপে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে। তাই শহর থেকে শুরু করে গ্রামেগঞ্জে এমনকি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশু-শিক্ষার্থীরা টেনিস বল ও নিজেদের তৈরি ব্যাট দিয়ে ক্রিকেট খেলে থাকে। ক্রিকেট শিশুদের মাঝে একটি আনন্দদায়ক খেলা। এই খেলার মাধ্যমে শিশুরা পারস্পরিক বোঝাপড়া, বন্ধুত্ব, নেতৃত্বদান, সময়জ্ঞান ও পর্যবেক্ষণ শক্তি ইত্যাদি গুণাবলি অর্জন করে। International Cricket Council (ICC) সংগঠনটি ক্রিকেটের নীতি নির্ধারক হিসেবে কাজ করে। টেস্ট ক্রিকেট, একদিনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ও T-২০ ক্রিকেট খেলা বর্তমানে প্রচলিত রয়েছে। বাংলাদেশে স্কুল ক্রিকেট, বয়সভিত্তিক ক্রিকেট, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ক্রিকেট খেলা হয়ে থাকে।

ক্রিকেট মাঠ

দুই প্রান্তের মাঝের স্টাম্প থেকে কমপক্ষে ৬০-৭৫ গজ ব্যাসার্ধ নিয়ে একটি অর্ধবৃত্ত আঁকতে হবে পরে দুই দাগের মাথা সোজা রেখা দ্বারা সংযোগ করে দিলেই বাউন্ডারি লাইন হয়ে যাবে। একে ওভাল সাইজ মাঠ বলে। আবার পিচের মাঝখান থেকে ৬০-৭৫ গজ ব্যাসার্ধ নিয়ে বাউন্ডারি লাইন টানা যায়। একে রাউন্ড সাইজ মাঠ বলে। মাঠের চারপাশে স্পষ্ট বাউন্ডারি রেখা থাকতে হবে।

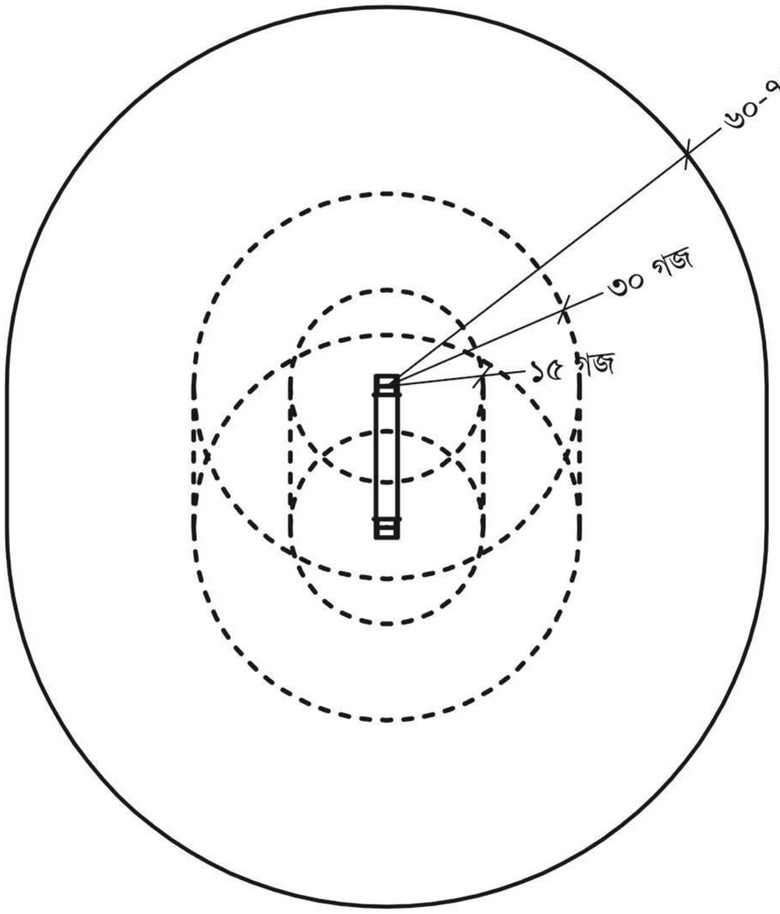

চিত্র : ক্রিকেট মাঠ

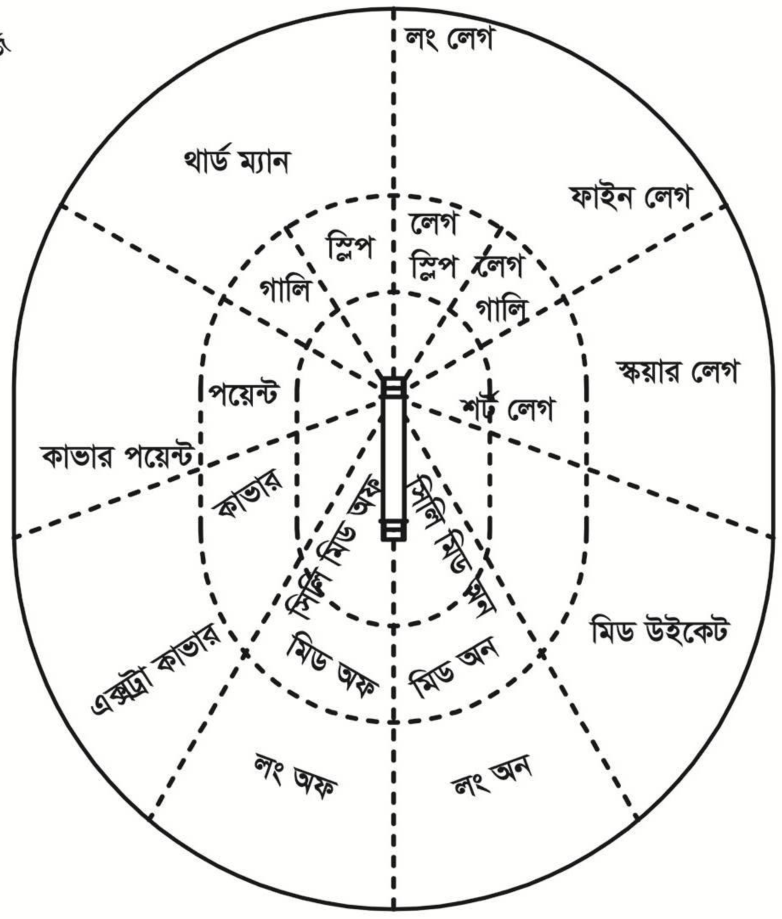

চিত্র : ফিল্ডিং পজিশন

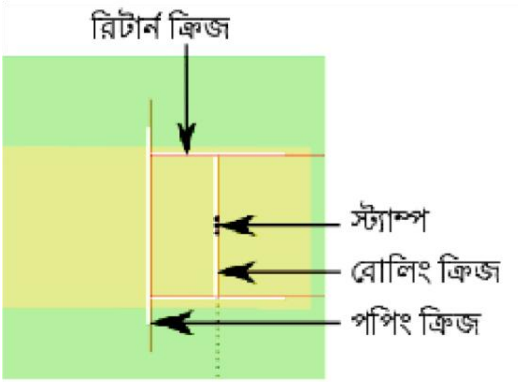

পিচ:

মাঠের মাঝখানে ২২ গজ দৈর্ঘ্য ও ৮ ফুট ৮ ইঞ্চি প্রস্থের আয়তাকার জায়গাকে পিচ বলে। টস করে ইনিংস শুরু করার আগে পর্যন্ত পিচের প্রস্তুত ও তত্ত্বাবধানের যাবতীয় দায়দায়িত্ব মাঠের কার্যকরী সংগঠনের সদস্যদের। এরপর দায়দায়িত্ব গ্রহণ করবে আম্পায়াররা। খেলা অনুপযুক্ততার জন্য পিচ বদলাতে হলে উভয় ক্যাপ্টেনের সম্মতির প্রয়োজন হবে।

উইকেট

পিচের দুই প্রান্তে তিনটি করে স্ট্যাম্প থাকে। প্রতি স্ট্যাম্পের মধ্যে দূরত্ব সমান থাকবে। তিনটি স্ট্যাম্প নিয়ে একটি উইকেট তৈরি হয় এবং তাতে দুইটি 'বেল' থাকে। মাটির উপরে উইকেটের উচ্চতা হলো ২৮ ইঞ্চ, প্রস্থ ৯ ইঞ্চি।

খেলোয়াড়

ক্রিকেট খেলা দুটি দলের মধ্যে হয়ে থাকে। প্রতি দলে বার জন খেলোয়াড় থাকে। এগার জন মাঠ খেলোয়াড় এবং একজন বদলি খেলোয়াড় বা টুয়েলভ ম্যান হিসেবে থাকে। মাঠে কোন খেলোয়াড় অসুস্থ বা আহত হলে বদলি খেলোয়াড় মাঠে নামবে। সে শুধুই ফিল্ডিং করতে পারবে। বোলিং, ব্যাটিং, উইকেটরক্ষক ও অধিনায়কের দায়িত্ব পালন করতে পারবে না।

আম্পায়ার

ক্রিকেট খেলা পরিচালনার জন্য মাঠে দুই জন আম্পায়ার থাকেন, যাঁরা আইনের প্রয়োজন সাপেক্ষে চরম নিরপেক্ষতা অবলম্বন করেন। বোলিং প্রান্তে একজন ও স্ট্রাইকিং ব্যাটসম্যান এর লেগের দিকে সোজা ৯ মিটার দূরে অন্যজনের অবস্থান। এছাড়াও মাঠের বাইরে একজন ম্যাচ রেফারি থাকেন। তিনি খেলার মধ্যে শৃঙ্খলা ভঙ্গসহ আম্পায়ার চাইলে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহযোগিতা করে থাকেন।

ব্যাট

একটি ব্যাট সর্বসাকল্যে ৩৮ ইঞ্চি দৈর্ঘ্যের বেশি হবে না। ব্যাটের চওড়া অংশ/ব্লেড কাঠ দিয়ে তৈরি করতে হবে,যা অবস্থাতেই ৪ ইঞ্চির বেশি হবে না। ব্যাটের ওজন সাধারণত ১.২০ থেকে ১.৭০ কিলোগ্রাম।

বল

ক্রিকেট বলের ওজন ১৫৬ গ্রামের কম এবং ১৬৩ গ্রামের বেশি নয়। বলের পরিধি ইঞ্চি থেকে ৯ ইঞ্চি-এর বেশি হবে না। বলের ভিতরের অংশটা হবে কর্কের এবং উপরে লাল পাতলা চামড়ার আবরণ থাকবে।

বোলিং, পপিং ও রিটার্ন ক্রিজ

বোলিং ক্রিজ স্ট্যাম্পের সঙ্গে এক লাইনে থাকবে। স্ট্যাম্পগুলোর অবস্থান এর মধ্যে রেখে লম্বায় ৮ ফুট ৮ ইঞ্চি হবে। পপিং ক্রিজ বলতে ক্রিজটির দাগের পেছনের অংশকেই বোঝায়, যেটা বোলিং ক্রিজের ৪ ফুট সামনে ও সমান্তরালভাবে টানতে হয়, যা মিডল স্ট্যাম্পের উভয় দিকে কমপক্ষে ৬ ফুট প্রসারিত। পপিং ক্রিজটি দৈর্ঘ্যে সীমাহীন বলে গণ্য হবে। রিটার্ন ক্রিজ বলিং ক্রিজের দুই প্রান্তে সমকোণে টানতে হয়। রিটার্ন ক্রিজ অন্ততপক্ষে ৪ ফুট উইকেটের পেছনে হবে এবং দৈর্ঘ্য সীমাহীন বলে গণ্য হবে। এই রিটার্ন ক্রিজটি সামনের দিকে পপিং ক্রিজ পর্যন্ত যাবে।

খেলা আরম্ভ

খেলা আরম্ভ হবার ৩০-১৫ মিনিট আগে খেলার মাঠের সীমানার মধ্যে অধিনায়কদ্বয় ইনিংস পছন্দের জন্য টস করবেন। টসে বিজয়ী অধিনায়ক খেলা শুরুর নির্ধারিত সময়ের ১০ মিনিট পূর্বে বিপক্ষ অধিনায়ককে ব্যাট করবেন, না ফিল্ডিং করবেন সে বিষয়ে তাঁর সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিবেন। কোন অবস্থাতেই এই সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করা যাবে না।

বোলার প্রান্তের আম্পায়ার ইনিংসের শুরুতে এবং কোন বিরতির পর পুনরায় খেলার শুরুতে ‘প্লেবল’ বলে খেলা শুরু করবেন।

ওভার

- সাধারণত ছয়টি শুদ্ধ বলে প্রতি ওভার নির্ধারণ করা হয়।
- ওভারের শেষ বল করার পর আম্পয়ার ওভার ঘোষণা করেন।
- নো বা ওয়াইড বল ওভারের মধ্যে গণনা করা হয় না।
- বল গণনার ক্ষেত্রে আম্পায়ারের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

ইনিংস

সংগঠনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী খেলা এক ইনিংস বা দুই ইনিংসে হয়ে থাকে। সাধারণত এক দিনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে এক ইনিংসে খেলা হয় এবং তিন বা তার চেয়ে বেশি দিনের টেস্ট দুই ইনিংসে খেলা হয়।

নো বল

বোলার নিয়মমাফিক বল না করলে নো বল হয়। নো-বলের শাস্তিস্বরূপ বলারকে একটি অতিরিক্ত বল করতে হয় এবং ব্যাটসম্যান একটি অতিরিক্ত রান পায়। নিম্নের কারণগুলোর জন্য নো বল ডাকা হয়–

ক বল ডেলিভারির সময় বোলারের কনুই ভেঙ্গে গেলে;

খ. বল ডেলিভারির পূর্বে বোলারের পা পপিং ক্রিজ সম্পূর্ণরূপে অতিক্রম করলে;
গ. বল ডেলিভারির পূর্বে বোলারের পা রিটার্ন ক্রিজের প্রসারিত অংশের বাইরে থাকলে;
ঘ. বোলার বল করার সময় উইকেটের কোন ক্ষতি করলে;
ঙ. বল পিচের অর্ধেকের এপাশে পড়লে;
চ. বল সরাসরি ব্যাটসম্যানের কাঁধের উপর দিয়ে চলে গেলে;
ছ. নিয়মমাফিক ফিল্ডার অবস্থান না করলে;
জ. বল একবারের বেশি বাউন্স করলে বা মাটিতে গড়িয়ে গেলে;
ঝ. বোলার over the wicket বল করতে করতে একই ওভারে আম্পায়ার কে না জানিয়ে Round the wicket বল করলে;
ঞ. বোলার বোলিং এর উদ্দেশ্যে রান আপ শুরু করার পর উইকেট কিপার সামনে-পিছনে অথবা সাইডে নড়াচড়া করলে;
ট. বোলার কর্তৃক ডেলিভারীকৃত বলটি ব্যাটসম্যানের উইকেট পার হওয়ার আগে উইকেট কিপার ধরলে। (এক্ষেত্রে যদি বলটি ব্যাটসম্যানের গ্লাভস, ব্যাট,প্যাড অথবা শরীরের কোন অংশে না লেগে থাকে।

নো-বলের শাস্তিস্বরূপ বোলারকে একটি অতিরিক্ত বল করতে হয় এবং ব্যাটসম্যান একটি অতিরিক্ত রান ও একটি ফ্রি হিটের সুযোগ পায়।

ওয়াইড বল

স্বাভাবিকভাবে গার্ড নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা স্ট্রাইকার ব্যাটসম্যানের নাগালের বাইরে দিয়ে উইকেটের লাইন অতিক্রম করলে ওয়াইড বল হয়। তবে টেস্ট খেলায় ও একদিনের খেলায় ওয়াইড বলের মধ্যে দূরত্বের পার্থক্য আছে। ওয়াইড বলের শাস্তিস্বরূপ বলারকে একটি অতিরিক্ত বল করতে হয় এবং ব্যাটসম্যান একটি অতিরিক্ত রান পায়।

রান হওয়ার নিয়ম

স্ট্রাইকার ব্যাটসম্যান বিধিসম্মতভাবে বল খেলার পর দৌড় দিয়ে উভয় ব্যাটসম্যান নিজেদের মধ্যে একবার স্থান পরিবর্তন করলে এক রান হবে। এভাবে দুই বা তিনবার স্থান পরিবর্তন করলে দুই বা তিন রান হবে।

ব্যাটসম্যান বল খেলার পর ফিল্ডিং দলের খেলোয়াড়দের ফাঁকি দিয়ে বল মাঠের বাইরে চলে গেলে চার রান হবে। এই বলকে বাউন্ডারি বলা হয়। ব্যাটসম্যান বল খেলার পর বল মাটি স্পর্শ না করে মাঠের বাইরে চলে গেলে ছয় রান হয়। এই বলকে ওভার বাউন্ডারি বলা হয়।

নো বল বা ওয়াইড বল হলে ব্যাটিং দল এক রান অতিরিক্ত পাবে।

জয়-পরাজয়

একদিনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ও টি টুয়েন্টি ক্রিকেট খেলায় যে দল আগে ব্যাট করে জিতবে তারা রানে জিতবে এবং যে দল পরে ব্যাট করে জিতবে তারা উইকেটে জিতবে। একজন ব্যাটসম্যান যে যে কারণে আউট হয়–

রান আউট

রান নেওয়ার সময় ব্যাটসম্যান যদি পপিং ক্রিজে পৌঁছাবার আগেণ বিপক্ষ দলের কোন খেলোয়াড় বল দ্বারা বেল ফেলে দেয় তখন সে প্রান্তের ব্যাটসম্যান রান আউটের আওতায় পড়বেন।

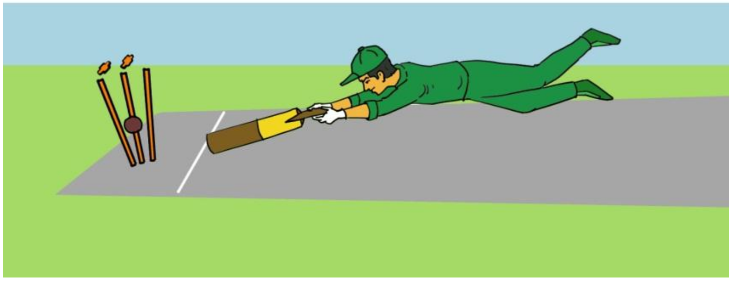

এল বি ডব্লিউ আউট

আম্পায়ার যদি মনে করেন বৈধ বলটি ব্যাটসম্যানের দেহ, পোশাক, সাজ-সরঞ্জাম বা পায়ে না লাগলে অবশ্যই উইকেটে আঘাত হানত, তখন আম্পায়ার আবেদনের প্রেক্ষিতে স্ট্রাইকার ব্যাটসম্যানকে এলবিডব্লিউ (লেগ বিফোর দ্য উইকেট) আউট দেবেন। লেগ স্টাম্পের বাইরে পিচ করা বলের ক্ষেত্রে এই নিয়ম প্রযোজ্য হবে না।

বোল্ড ত

বোলারের বৈধ বল সরাসরি অথবা ব্যাটসম্যানের ব্যাটে বা শরীরে স্পর্শ করে স্টাম্পের বেল ফেলে দিলে ঐ ব্যাটসম্যান আউট হবেন। একে বোল্ড আউট বলে।

ক্যাচ আউট

কোন বৈধ বল স্ট্রাইকার ব্যাটসম্যানের ব্যাট বা তাঁর কবজির নিচের অংশ স্পর্শ করে এবং বলটি শূন্যে থাকা অবস্থায় ফিল্ডার সম্পূর্ণভাবে মাঠের সীমানার মধ্যে অবস্থান করে বলটি তালুবন্দি করলে অথবা তাঁর পোশাকে মাটি স্পর্শ না করে কোনভাবে আটকে গেলে ওই ব্যাটসম্যান আউট হবেন। এই ধরনের আউটকে ক্যাচ আউট বলে।তাহলে ঐ ব্যাটসম্যান স্ট্যাম্পড আউট হবেন।

স্ট্যাম্পড আউট

নো বল ব্যতীত বল ব্যাটসম্যান খেলার জন্য পপিং ক্রিজ

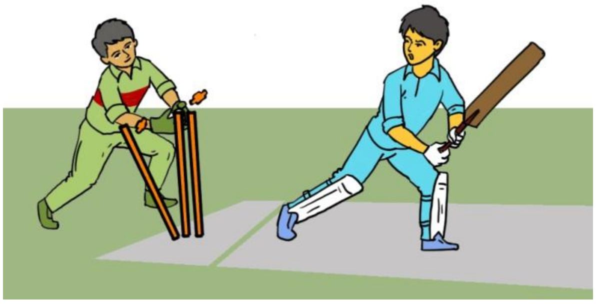

ছেড়ে বাইরে গেলে ঐ সময় কোন ফিল্ডসম্যানের বিনা

হস্তক্ষেপে উইকেট কিপার যদি বল ধরে বেল ফেলে দেন

টাইমড আউট

যদি কোন নতুন আগমনরত ব্যাটসম্যান ইচ্ছাকৃতভাবে মাঠে প্রবেশ করতে ২ মিনিটের বেশি সময় নেন তাহলে তিনি আবেদনের প্রেক্ষিতে টাইমড আউটের আওতায় পড়বেন। ২ মিনিট সময়টি উইকেট পতনের মুহূর্ত থেকে নতুন ব্যাটসম্যানের খেলার মাঠে প্রবেশ পর্যন্ত ধরা হবে। টি টোয়েন্টি খেলায় এই সময় ১ মিনিট ৩০ সেকেন্ড।

হিট উইকেট আউট

ব্যাটসম্যান বল খেলার সময় ... –সরঞ্জাম বা কোন অংশ লেগে উইকেট ভে ... হিট উইকেট আউট হোন।

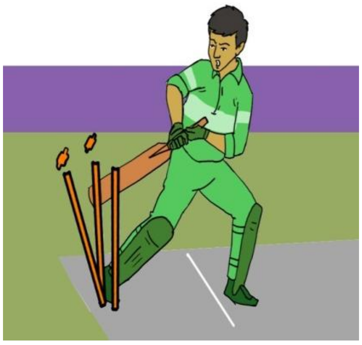

হিট দ্য বল টোয়াইস আউট

স্ট্রাইকার ব্যাটসম্যানের ব্যাটে বা শরীরে বল একবার লাগার পর ঐ ব্যাটসম্যান নিজের উইকেট রক্ষার উদ্দেশ্য ছাড়া ইচ্ছাকৃতভাবে তাঁর ব্যাট বা শরীরের যে কোন অংশ দ্বারা দ্বিতীয়বার বলে আঘাত করলে আবেদনের প্রেক্ষিতে যে আউট হন তাকে হিট দ্য বল টোয়াইস আউট বলে।

হ্যান্ডলড দ্য বল আউট

উভয় ব্যাটসম্যানের যে কেউ আবেদনের প্রেক্ষিতে হ্যান্ডলডদ্য বল আউটহবেন, যদি তিনি বিপক্ষের অনুরোধ ব্যতীত ইচ্ছাকৃতভাবে বলটিকে খেলার মেয়াদ থাকাকালীন তাঁর যে হাতে ব্যাট নেই সেই হাত দ্বারা স্পর্শ করেন।

অবস্ট্রাকটিং দি ফিল্ড আউট

ইচ্ছাকৃতভাবে কথা বা কাজের দ্বারা ফিল্ডারদের বল ধরতে বাধা প্রদান করলে আবেদনের প্রেক্ষিতে দুই ব্যাটসম্যানের যে কেউ অবস্ট্রাকটিং দ্য ফিল্ড আউট হবেন।

রিটায়ার্ড হার্ট নামে ক্রিকেটে আরো একটি আউট আছে। ব্যাটসম্যান কোন আঘাতজনিত কারণে বা অসুস্থতার জন্য অবসর নিলে তিনি যদি এই ইনিংসের মধ্যে আর ব্যাট করতে না নামেন, তবে তাঁকে আম্পায়ার আউট বলে ঘোষণা করবেন।

হ্যান্ডবল

হ্যান্ডবল খেলার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস:

বিশেষজ্ঞদের মতে হ্যান্ডবল খেলার উৎপত্তি হয়েছে জার্মানিতে। দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দীতে জার্মান গীতি কবিতায় ক্যাচবল (Catch ball) জাতীয় খেলার উল্লেখ আছে। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে ডেনমার্কের জনৈক শিক্ষক হোলজার নিয়েলগণ Hand bold নামে একটি খেলা প্রবর্তন করেন। ১৯১৭ সালে মহিলাদের ক্রীড়া শিক্ষক বার্লিনের ম্যাক্স হিসার মেয়েদের জন্য অভিনব পদ্ধতির হ্যান্ডবল খেলা প্রচলন করেন। ১৯১৯ সালে বার্লিনের অপর একজন ক্রীড়া শিক্ষক কার্ল শিলেঞ্জ এই খেলায় তার নিজস্ব পদ্ধতি সংযোজন করে এর উৎকর্ষ সাধন করেন ও আস্তে আস্তে এর প্রসার ঘটাতে থাকেন। জার্মানিতে হ্যান্ডবলের আন্তর্জাতিক সংস্থা গঠিত হয় ১৯২৮ সালে। হ্যান্ডবল খেলা ১৯৬৪ সালে প্রথম এশিয়ান গেমসে এবং ১৯৭২ সালে প্রথম অলিম্পিকে অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৯৮২ সালের ৬ জুন বাংলাদেশে হ্যান্ডবল খেলার সূচনা হয়। বর্তমানে বাংলাদেশে হ্যান্ডবল একটি জনপ্রিয় খেলা।

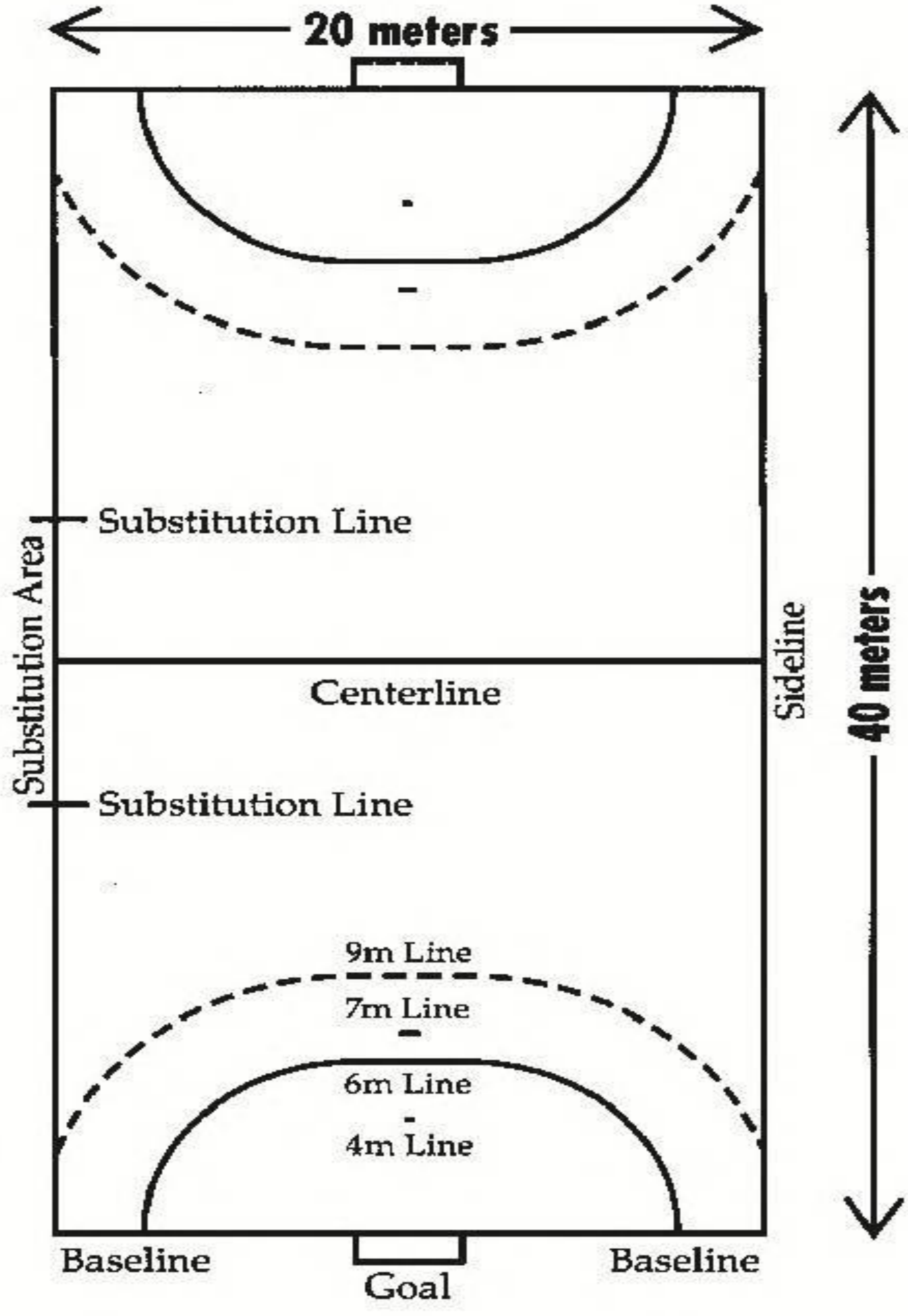
20 meters
40 meters
Substitution Line
Substitution Area
Centerline
Sideline
Substitution Line
9m Line
7m Line
6m Line
4m Line
Baseline
Goal
Baseline

সাধারণ নিয়মাবলি

- হ্যান্ডবল মাঠের দৈর্ঘ্য ৪০ মিটার এবং প্রস্থ ২০ মিটার। মাঠটি অবশ্যই আয়তাকার হবে। ৪০ মিটারের লাইনকে সাইড লাইন এবং ২০ মিটারের লাইনকে গোল লাইন বলে। ইনার গোল লাইন ব্যতীত মাঠের সকল দাগ ৫ সে.মি. চওড়া হবে।
- মাটি থেকে গোল পোস্টের উচ্চতা হবে ২ মিটার এবং এক সাইড বার থেকে অন্য সাইড বারের দৈর্ঘ্য হবে ৩ মিটার। গোল পোস্ট ও ক্রসবারের ব্যাস হবে ৮ সে.মি.।
- গোল পোষ্টের সম্মুখ বরাবর মাঠের দিকে ৬ মিটার দূরে গোল লাইনের সমান্তরালে ৩ মিটার লম্বা একটি সরলরেখা টানতে হবে। এরপর উভয় সাইড বারের পিছনের দিকে ভিতরের কোনা হতে ৬ মিটার ব্যাসার্ধের দুটি বৃত্তচাপ অংকন করে গোল লাইনের সাথে যুক্ত করে গোল এরিয়া তৈরি করতে হবে।

ফ্রি থ্রো লাইনটি ভাঙা ভাঙা অর্থাৎ ১৫ সে.মি. ভরা ও ১৫ সে.মি. ফাঁকা হবে। লাইনটি গোল এরিয়া লাইনের সমান্তরালে ৩ মিটার বাইরে হবে।

- প্রতিটি গোল লাইনের ঠিক মধ্যবিন্দু হতে মাঠের দিকে ৭ মিটার দূরে গোল লাইনের সমান্তরালে ১ মিটার লম্বা

একটি লাইন টানতে হবে। একে সেভেন মিটার লাইন বা পেনাল্টি লাইন বলে।

- খেলার সময়কাল উভয় অর্ধে ৩০ মিনিট এবং মধ্যবিরতি ১০ মিনিট (৩০+১০+৩০)।
- বলটি অবশ্যই গোলাকার এবং চামড়া বা কৃত্রিম ধাতুর তৈরি হবে। খেলা আরম্ভের সময় পুরুষদের ক্ষেত্রে বলের ওজন হবে ৪২৫ গ্রাম থেকে ৪৭৫ গ্রাম, পরিধি ৫৮ থেকে ৬০ সে.মি. এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে বলের ওজন হবে ৩২৫ গ্রাম থেকে ৩৭৫ গ্রাম, পরিধি ৫৪ থেকে ৫৬ সে. মি. ।
- প্রত্যেক দলে সর্বমোট ১২ জন খেলোয়াড় থাকে। তার মধ্যে ১ জন গোলরক্ষকসহ মোট ৭ জন খেলোয়াড় মাঠে থাকবে এবং ৫ জন বদলি খেলোয়াড় হিসেবে থাকবে। খেলার শুরুতে অবশ্যই একটি দলের কমপক্ষে ৫ জন খেলোয়াড় মাঠে থাকতে হবে।
- মাঠ খেলোয়াড়রা জার্সি বদল করে গোলরক্ষক হিসেবে খেলতে পারে।
- নির্ধারিত সময়ে খেলা অমীমাংসিত থাকলে অতিরিক্ত ৫মিনিট করে খেলা হবে।
- খেলা আরম্ভ বা বিরতির পর বা গোল হওয়ার পর 'থ্রো অফ'-এর মাধ্যমে খেলা শুরু হবে।
- গোল রক্ষার জন্য গোলরক্ষক তার গোল এরিয়ার মধ্যে শরীরের যে কোন অংশ দিয়ে খেলতে পারে। তবে গোল

এরিয়ার বাইরে গোলরক্ষকের ক্ষেত্রেও কোর্ট খেলোয়াড়ের নিয়মগুলো প্রযোজ্য হবে।

- বল পার্শ্বরেখা অতিক্রম করলে থ্রো-ইন দিয়ে খেলা শুরু হবে।
- বৈধভাবে বলটি সম্পূর্ণরূপে ইনার গোল লাইন অতিক্রম করলে গোল হয়েছে বলে ধরা হবে। বেশি গোল অর্জনকারী দলই বিজয়ী দল হিসেবে গণ্য হবে।
- খেলা পরিচালনার জন্য দুজন রেফারি, একজন সময়রক্ষক ও একজন স্কোরার থাকেন।

কোর্ট খেলোয়াড়-

ক	বাহু, মাথা, দেহ, উরু এবং হাঁটু ব্যবহার করে বলকে নিক্ষেপ করতে, ধরতে, থামাতে ও আঘাত করতে পারবে।

খ.	বলটি সর্বোচ্চ ৩ সেকেন্ডের জন্য হাতে বা মাটিতে ধরে রাখা যাবে।

গ. বল হাতে নিয়ে ৩ কদম এর বেশি দেয়া যাবে না।

ঘ.	বল মাটিতে একবার বাউন্স করে এক বা উভয় হাত দিয়ে ধরা যাবে।

ঙ.	এক হাত দিয়ে বল বারবার বাউন্স করে বা এক হাত দিয়ে বলটি মাটিতে গড়িয়ে এক বা উভয় হাতে বলটি ধরা যাবে। প্রতিপক্ষ দলকে ফ্রি থ্রো দেওয়া হবে-

প্রতিপক্ষ দলকে ফ্রি থ্রো দেওয়া হবে-

ক	ত্রুটিপূর্ণভাবে খেলোয়াড় বদলি করলে।

খ.	গোলরক্ষক নিয়ম ভঙ্গ করলে।

গ.	মাঠ খেলোয়াড় গোল সীমা আইন ভঙ্গ করলে।

ঘ.	বল খেলার সময় আইন ভঙ্গ করলে।

ঙ.	ইচ্ছাকৃতভাবে সাইড লাইন বা গোল লাইন অতিক্রম করে বল খেললে।

চ.	প্রতিপক্ষের প্রতি অবৈধ আচরণ করলে।

ছ.	ত্রুটিপূর্ণ থ্রো-অফ করলে।

জ	ত্রুটিপূর্ণ থ্রো-ইন করলে।

ঝ	ত্রুটিপূর্ণ পেনাল্টি থ্রো করলে।

ঞ	ত্রুটিপূর্ণ ফ্রি থ্রো করলে।

ট.	অখেলোয়াড়োচিত আচরণ করলে।

ঠ.	গোলরক্ষকের কাছে গোল সীমায় ব্যাক পাস করলে।

প্রতিপক্ষ দল ‘পেনাল্টি থ্রো’ পাবে–

ক	মাঠের যে কোন জায়গায় কোন খেলোয়াড় বা কর্মকর্তা আক্রমণকারী দলের একটি গোলের উজ্জ্বল সুযোগ অবৈধভাবে নষ্ট করে দিলে।

খ.	একটি নিশ্চিত গোল করার সময় যদি কোন অবৈধ বাঁশির সংকেতে তা নষ্ট হয়ে যায়।

গ.	মাঠে প্রবেশের অনুমতি নেই এমন কোন ব্যক্তির বা বস্তুর কারণে যদি একটি নিশ্চিত গোলের সুযোগ নষ্ট হয়।

ভলিবল

ভলিবল খেলার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস:

ভলিবল বর্তমান বিশ্বে একটি জনপ্রিয় খেলা। বিশ্বের প্রতিটি দেশেই ভলিবল খেলা হয়ে থাকে। যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটস অঙ্গরাজ্যের স্প্রীং ফিল্ডের ওয়াই. এম. সি. এর শারীরিক শিক্ষা বিভাগের পরিচালক উইলিয়াম জি মর্গান ১৮৯৫ সালে। এ খেলাটি আবিষ্কার করেন। ওয়াই. এম. সি. এর মাধ্যমে ইউরোপ ও এশিয়া মহাদেশে খেলাটি ব্যাপকভাবে চালু হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় মার্কিন সেনারা ইউরোপে এ খেলাটি ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেন। ১৯২৪ সালে প্যারিস অলিম্পিকে ভলিবলের প্রদর্শনী ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয। ১৯৪৭ সালে আন্তর্জাতিক ভলিবল ফেডারেশন (FIVB) গঠিত হয়। বাংলাদেশে শহর এমনকি গ্রামাঞ্চলে ভলিবল খেলা বেশ জনপ্রিয়। সহজে আয়োজন করা যায় বলে এ দেশের স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও বয়সভিত্তিক পুরুষ ও মহিলাদের মধ্যে প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। বাংলাদেশের জাতীয় ভলিবল দল এশিয়ান গেম্‌স এবং সাফ গেম্‌সে অংশগ্রহণ করে। এই খেলার মাধ্যমে শারীরিক ক্ষমতা, ক্ষিপ্রতা, আত্মবিশ্বাস, সমঝোতা, পর্যবেক্ষণক্ষমতা, নেতৃত্বদান ইত্যাদি দক্ষতাগুলো শিশুরা অর্জন করে।

ক) ভলিবল কোর্ট

ভলিবল কোর্টের দৈঘ্য ১৮ মিটার ও প্রস্থ ৯ মিটার। ভলিবল কোর্টের প্রতি অর্ধের মধ্যরেখা হতে ৩ মিটার পিছনে একটি রেখা টানতে হবে। এই ৩ মিটার অংশকে সম্মুখ জোন বলে এবং ৬ মিটার অংশকে পশ্চাৎ জোন বলা হয়। কোর্টের চারিদিকে কমপক্ষে ৩ মিটার মুক্ত এলাকা থাকবে এবং উপরের দিকে অনুভূমিক ৭ মিটার উচ্চতা মুক্ত থাকবে।

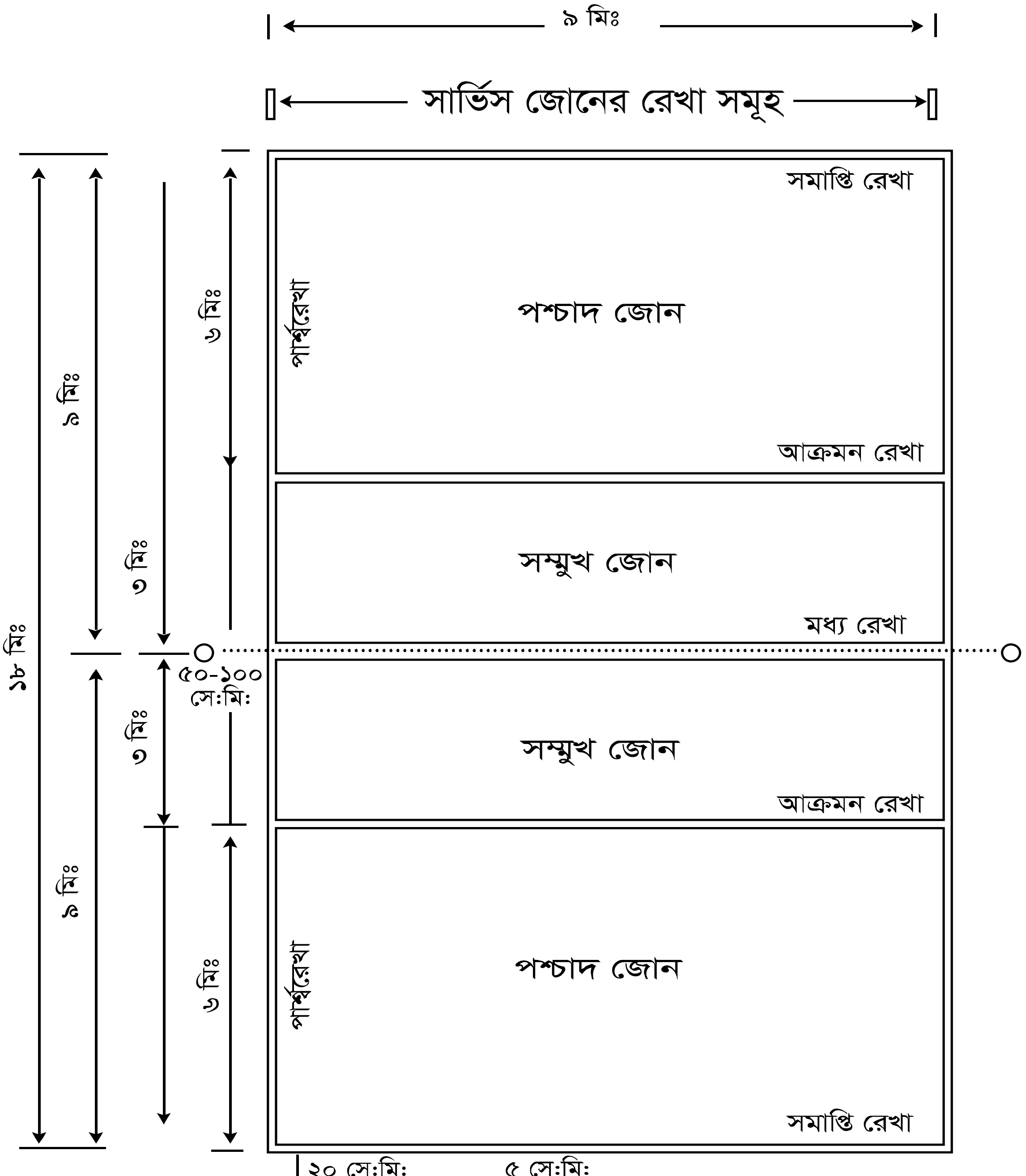

ভলিবল খেলার কোর্ট

খ) নেট বা জাল

১ মিটার চওড়া ও ৯.৫০ মিটার লম্বা ভলিবল নেটটি মধ্যরেখা বরাবর টানাতে হবে। পুরুষদের জন্য এই নেটের উচ্চতা ২.৪৩ মিটার এবং মহিলাদের জন্য উচ্চতা ২.২৪ মিটার। নেটের দুই পাশে পার্শ্বরেখা বরাবর একটি করে অ্যান্টিনা থাকবে, যার উচ্চতা হবে ১.৮০ মিটার।

গ) বল

বলটি অবশ্যই গোলাকার এবং চামড়া বা চামড়া জাতীয় পদার্থ দ্বারা তৈরি হতে হবে।

বলের পরিধি : ৬৫-৬৭ সে.মি. বলের ওজন : ২৬০-২৮০ গ্রাম

বলের ভিতর বায়ুর চাপ : ০.৩০ হতে ০.৩২৫ কেজি

ঘ) খেলোয়াড়

প্রতি দলে ১২ জন খেলোয়াড় থাকবে কিন্তু মাঠে খেলবে ৬ জন খেলোয়াড়। বাকিরা বদলি খেলোয়াড় হিসেবে মাঠে উপস্থিত থাকবে।

ঙ) জয়-পরাজয়

সেটের মাধ্যমে জয় পরাজয় নির্ধারণ করা হয়। ২৫ পয়েন্টে একটি সেট হবে। কিন্তু উভয় দলের ২৪-২৪ সমান পয়েন্ট হলে সে ক্ষেত্রে ডিউজ হবে এবং কেবলমাত্র ২ পয়েন্টের ব্যবধান হলেই সেট হবে (উদাহরণ: ২৫-২৭, ২৫-২৩ ইত্যাদি)। ৫ সেটের মধ্যে যে দল ৩ সেটে বিজয়ী হবে তাদেরকে ম্যাচ বিজয়ী বলে ধরা হবে। বেস্ট অব ফাইভ এর খেলায় যদি ৫ম সেট খেলতে হয় তবে ১৫ পয়েন্টে খেলা নিষ্পত্তি হবে। কোন দল ৮ পয়েন্ট পেলেই কোর্ট বদল

করবে।

সার্ভিস করার নিয়মাবলি

- রেফারির বাঁশির সংকেতের ৮ সেকেণ্ডের মধ্যে সার্ভিস করতে হবে;
- অবশ্যই বলটি টস করে সার্ভিস করতে হবে;
- সার্ভিস জোনের মধ্যে থেকে সার্ভিস করতে হবে;
- প্রান্তরেখা স্পর্শ বা অতিক্রম না করে সার্ভিস করতে হবে;
- বল আড়াল না করে সার্ভিস করতে হবে;
- রেফারির বাঁশির পরে বলটি বাউন্স করা যাবে না ;
- রেফারির বাঁশির সংকেতের পূর্বে সার্ভিস করলে তা বাতিল বলে গণ্য হবে এবং রেফারি পুনরায় সার্ভিসের নির্দেশ দিবেন।

নিম্নলিখিত নিয়মগুলো ভঙ্গ করলে সার্ভিস ও পয়েন্ট উভয় হারাবে

- কোন দল তিনবারের বেশি বল স্পর্শ করলে
- খেলা চলাকালীন অ্যাকশনের সময় খেলোয়াড় জাল স্পর্শ করলে

- বিপক্ষ দলের কোর্টের মধ্যে বল থাকাকালে বলে আঘাত করলে
- খেলা চলাকালীন বিপক্ষ কোর্টে প্রবেশ করলে
- ঘূর্ণন বা Rotation এর নিয়ম ভঙ্গ করলে।

অবস্থান

নেটের কাছের ৩ জন খেলোয়াড়কে সামনের সারির খেলোয়াড় বলা হবে এবং তাদের অবস্থান হবে সম্মুখের বাম প্রান্তে ৪ নং খেলোয়াড়, মধ্যে ৩ নং খেলোয়াড় ও ডানে ২ নং খেলোয়াড়। অন্য ৩ জন খেলোয়াড়কে পিছনের সারির খেলোয়াড় বলা হবে এবং তাদের অবস্থান হবে পিছনের সারির বামপ্রান্তে ৫ নং খেলোয়াড়, মাঝে ৬ নং খেলোয়াড় ও ডানে ১ নং খেলোয়াড়। পেছনের সারির খেলোয়াড়রা কখনোই সম্মুখ জোনে নেটের উপরের উচ্চতার বলে আঘাত বা ব্লক করতে পারবে না।

ঘূর্ণন

ভলিবল খেলায় খেলোয়াড়রা 'অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ' কোর্টে অবস্থান নেবে। কিন্তু যখন রিসিভিং দল সার্ভিস লাভ করবে তখন ঐ দলের সকল খেলোয়াড় 'ক্লকওয়াইজ' একবার তাদের অবস্থান পরিবর্তন করবে। একে ঘূর্ণন বা রোটেশন বলে।

নেট নেট নেট

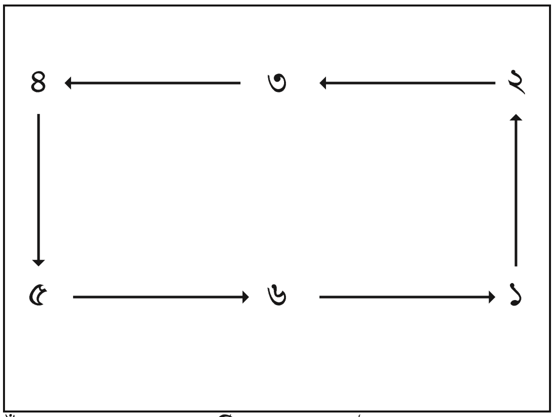

দাঁড়ানোর সময় অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ

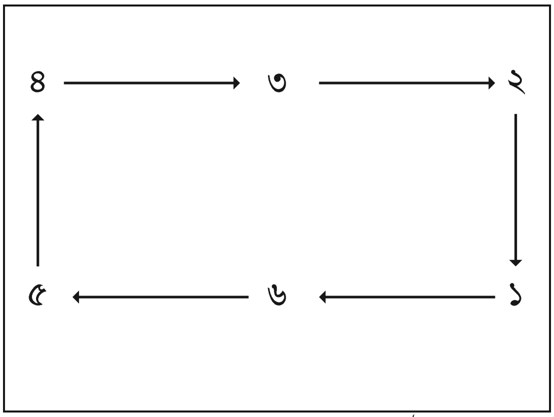

ঘোরার সময় ক্লক ওয়াইজ

লিবারো

লিবারোহচ্ছে রক্ষণভাগের খেলায় বিশেষজ্ঞ একজন খেলোয়াড়। লিবারো খেলোয়াড়ের নাম অবশ্যই স্কোরসিটে লিপিবদ্ধ থাকবে। তার নামের পার্শ্বে কথাটি উল্লেখ থাকবে। লিবারো খেলোয়াড়ের জার্সি অবশ্যই সতীর্থ অন্যান্য খেলোয়াড়ের জার্সির রং ও ডিজা্ইন হতে ভিন্ন রকমের হবে। লিবারো খেলোয়ার সার্ভিস ও সার্ভিস ব্লক করতে পারবে না। কোন অবস্থানে থেকেই নেটের উচ্চতার উপরিভাগ দিয়ে বল বিপক্ষের কোর্টে পাঠাতে পারবে না। লিবারো খেলোয়াড় পিছনের সারির যে কোন খেলোয়াড়ের সাথে বদলি হতে পারবে। এই বদলি নিয়মিত বদলি হিসেবে গণ্য হবে না এবং এই বদলি অসীমিত। লিবারো খেলোয়াড় আহত হলে তার পরিবর্তে মাঠে নামা বদলী খেলোয়াড় উক্ত ম্যাচের অবশিষ্ঠ সময়ের জন্য “লিবারো” খেলোয়াড় হিসেবে বা রক্ষণ ভাগের খেলোয়াড় হিসেবে খেলবে। লিবারো খেলোয়াড় দলীয় অধিনায়ক (Team Captain) অথবা খেলার অধিনায়ক (Game Captain) হতে পারবে না।

ভলিবল খেলার কলাকৌশল

১। সার্ভিস বা পরিবেশনঃ

ভলিবল খেলায় বিভিন্ন ধরনের সার্ভিস করা যায়, যেমন-

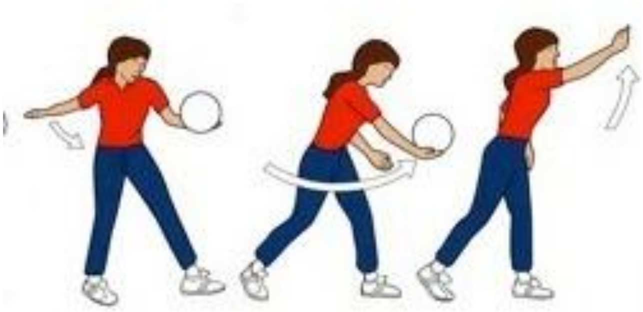

আন্ডার আর্ম সার্ভিস

এই সার্ভিসটি খুব সহজ, বাম হাতে বল নিয়ে দুই পা কিছুটা ফাঁকা করে সামনের দিকে হাঁটু কিছুটা ভাঁজ করে দাঁড়াতে হবে। বলটি টস করে ডান হাত দিয়ে আঘাত করতে হবে এবং সাথে সাথে সামনের দিকে অগ্রসর হতে হবে।

• ওভার হ্যান্ড বা টেনিস সার্ভিস

প্রতিযোগিতামুলক কোন খেলায় এই সার্ভিস করা হয়। কঠিন হলেও এই সার্ভিসের দ্বারা লক্ষ্যস্থলে বল পৌছানো সহজ। দুই পা সামান্য ফাঁকা করে দাঁড়িয়ে বল উচুতে নিক্ষেপ করে নিম্নগামী হওয়ার সাথে সাথে ডান হাতের মুষ্টি বা তালুর গোড়ালি দিয়ে আঘাত করতে হবে। সার্ভিস করার সাথে সাথে সামনে অগ্রসর হতে হবে।

২। পাসঃ **ভলিবল খেলায় বিভিন্ন ধরনের পাস করা যায়, যেমন–**

আপার হ্যান্ড পাস

বলকে সব সময় আঙুলের প্রথম গাঁট ও শেষ প্রান্তের মাঝখানের অংশ দ্বারা স্পর্শ করতে হবে। কনুই দুটো কাঁধ বরাবর রাখতে হবে, যাতে ঠিক কপালের সামনে থেকে খেলা যায়। হাঁটু সামান্য ভেঙে দুই পায়ের উপর ভর রেখে সামনের দিকে সামান্য ঝুঁকে দাঁড়াতে হবে। বলের ঠিক পেছনে ও নিচের দিকে আঘাত করে সামনে উপরের দিকে ঠেলে দিতে হবে এবং হাঁটু সোজা করে দাঁড়াতে হবে।

আন্ডার আর্ম পাস

বুড়ো আঙুল বাদে বাম হাতের অন্যান্য আঙুলগুলোর উপর ডান হাতের আঙুলগুলো রেখে তার উপর দুই হাতের বুড়ো আঙুল দুটোকে পাশাপাশি রাখতে হবে। কনুই দুটোকে এমনভাবে রাখতে হবে, যাতে কনুই থেকে কব্জি পর্যন্ত হাতের অংশটা পাশাপাশি থাকে। দুই হাঁটু সামান্য ভেঙে কোমর নিচু করে শরীরকে বলের নিচে নিয়ে যেতে হবে। কনুই এর কিছুটা সামনে থেকে কব্জি পর্যন্ত অংশ দিয়ে বলকে উপরে ওঠাতে হবে এবং শরীর সোজা করতে হবে।

এক হাতের নিচে দিয়ে বল পাস বলের এমন অবস্থা যাতে মনে হয় বলটি মাটিতে পড়ে যাবে। কোন রকম দুই হাত ব্যবহার করা যাবে না। এমতাবস্থায় এক বাহু মুষ্টিবদ্ধ করে বল ঠেকাবার চেষ্টা করা বা এক হাতে বল পাস করা।

৩। বল স্ম্যাশ করা ভলিবল খেলায় যিনি চাপ মারেন বা স্ম্যাশ করেন তাঁর ভূমিকা একটু বেশি। লম্বা খেলোয়াড়রা চাপ মারতে কুশলী হয়। যে খেলোয়াড়রা লাফ দিয়ে উঠতে পারে তারা চাপ মারতে পারে। এক পায়ে ভর করে লাফ দিয়ে জালের উপর থেকে মুষ্টিবদ্ধ হাত বা হাতের গোড়া থেকে সজোরে আঘাত করতে হবে।

৪। ব্লক করা

লম্বা খেলোয়াড় হলে চাপের বল বাধা দিতে সুবিধা হয়। সময়মত লাফ দেওয়া ব্লকিং এর জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ। চাপ দানকারী যখন বলে আঘাত করার জন্য লাফ দিবেন তার কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে আপনি লাফ দিন। আপনার দুই হাত জালের উপরে তুলে দিন। আঙুলগুলো খোলা অবস্থায় বাধা দিন। ব্লক একাকী বা দুই/তিন জনে দেওয়া যায়।

ব্যাডমিন্টন

ব্যাডমিন্টন খেলার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস:

ব্যাডমিন্টন খেলার উৎপত্তি নিয়ে বহুমত থাকলেও অধিকাংশের ধারণা এ খেলার জন্ম হয়েছে ভারতের পুণাতে। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে পুনায় অবস্থিত ইংরেজ সেনারা স্থানীয লোকজনদেরকে শাটল কর্ক ও ছোট ব্যাট দিয়ে খেলতে কৌতুহল বোধ করেন। তারা স্থানীয় লোকজনদেরকে কাছ থেকে ঐ খেলা শিখে ছুটিতে ইংল্যান্ডে যেয়ে খেলাটি প্রচলন করেন।

ভারতে কর্মরত ইংরেজ সেনারা ছুটিতে বাড়ী গেলে ১৮৭০ সালে ইংল্যান্ডের বোফোর্টের ডিউক গ্লসেস্টারসায়রের অন্তর্গত তার নিজ বাড়ীতে (যার নাম ব্যাডমিন্টন) এক ভোজ সভায় দেশে ফেরা ঐসব গৈণ্য বিভাগের কয়েকজন অফিসারকে নিমন্ত্রণ করেন ও পুণা থেকে শিখে আসা খেলাটি প্রদর্শনীর অনুরোধ করেন। অনেক অতিথিদের উপস্থিতিতে গণ ভোজ সভায় খেলাটি প্রদর্শিত হয়। সে থেকেই বো ফোর্ট ডিউকের বাড়ীর নামানুসারে ব্যাডমিন্টন খেলার নামকরণ হয়।

আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ব্যাডমিন্টন খেলা সুপরিচিতি থাকায় এশিয়ায় বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। ১৯৫৭ সালে এশিয়ান ব্যাডমিন্টন ফেডারেশন গঠিত হয়। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে জাতীয় ব্যাডমিন্টন ফেডারেশন গড়ে উঠে। এ ছাড়াও স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং গ্রামগঞ্জে ছোট ছোট সংগঠনের মাধ্যমে ব্যাডমিন্টন খেলার প্রচলন রয়েছে। সাধারণত জিমনেসিয়ামে উডেন ফ্লোরে জাতীয় বা আন্তর্জাতিক পর্যায়ের ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা হয়ে থাকে। এই খেলার মাধ্যমে শিশুদের বিভিন্ন রকম সামাজিক দক্ষতা অর্জিত হয়। যেমন–শৃঙ্খলাবোধ, পারস্পরিক সহযোগিতা, নেতৃত্ববোধ, সহমর্মিতা ইত্যাদি।

(ক) খেলোয়াড়

সাধারণত ব্যাডমিন্টন একক বা দ্বৈত খেলা হয়। একক খেলায় একজনের প্রতিপক্ষ একজন করে মোট দু'জন খেলে এবং দ্বৈত খেলায় দুইজনের প্রতিপক্ষ দুইজন করে মোট চারজন খেলে।

(খ) ব্যাডমিন্টন কোর্ট

একক কোর্টের দৈর্ঘ্য ৪৪ ফুট, প্রস্থ ১৭ ফুট এবং দ্বৈত কোর্টের দৈর্ঘ্য ৪৪ ফুট, প্রস্থ ২০ ফুট।

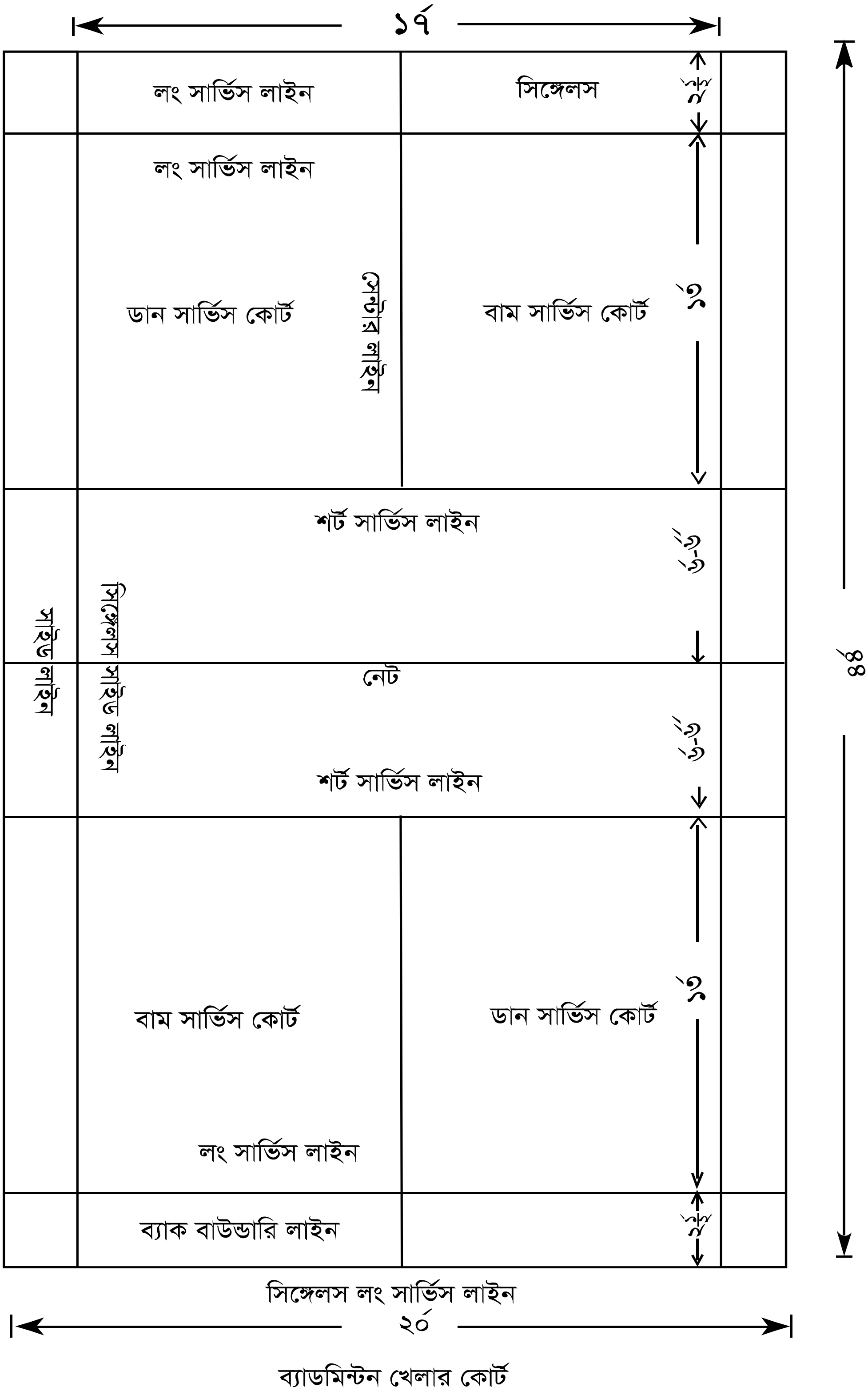

ব্যাডমিন্টন খেলার কোর্ট

ক) নেট বা জাল ও দন্ড বা পোস্ট

মাটির উপরে পোস্ট বা দন্ড টি ৫-১´´ হবে। এই দন্ডের উপরে নেটকে বেঁধে রাখতে হবে। এবং নেটের মাঝখানের উচ্চতা হবে ৫ ফুট, নেটের উপরি অংশে ৭৫ মিলিমিটার সাদা টেপ বা ফিতা দিয়ে এঁটে দিতে হবে, যা পোস্টের উপরের দিকে থাকবে।

খ) খেলা আরম্ভ

বিজয়ী দলনেতা সার্ভিস বা সাইড পছন্দ করতে পারেন। ডান সার্ভিস কোর্ট দিয়ে কোনাকুনি সার্ভিসের মাধ্যমে ব্যাডমিন্টন খেলা শুরু হয়।

গ) ফলাফল

সিঙ্গেলস(একক) এবং ডাবলস (দ্বৈত) খেলায় ২১ পয়েন্টে গেম সম্পন্ন হয়। কিন্তু ২ পয়েন্টের ব্যবধান থাকতে হবে। যেমন–২০-২২, ২১-২৩ ইত্যাদি। উভয় দলের পয়েন্ট সমান হওয়াকে ডিউস বলে। সর্বোচ্চ ৩০ পয়েন্টের মধ্যে অবশ্যই গেম শেষ করতে হবে অর্থাৎ খেলা চলতে চলতে যখন উভয় দলের পয়েন্ট ২৯ হবে তখন যে বা যে দল আগে ৩০ পয়েন্ট পাবে সে বা সে দল গেম জিতবে । তৃতীয় সেটে ১১ পয়েন্ট হলে প্রান্ত বদল করতে হবে। তিনটি গেমের মধ্যে যে বা যে দল দুইটি গেম জিতবে, সে দল বিজয়ী হবে।

ঘ) খেলা পরিচালনা

ব্যাডমিন্টন খেলা পরিচালনার জন্য ১ জন আম্পায়ার, ১ জন রেফারি, ১ জন স্কোরার, ২ থেকে ৪ জন লাইন্সম্যান এবং আলাদাভাবে ২ জন পরিবেশক বিচারক রাখা হয়।

ব্যাডমিন্টন খেলার কৌশল

র‍্যাকেট ধরা (Grip)

র‍্যাকেট সঠিকভাবে ধরার উপরই ব্যাডমিন্টন খেলা অনেকটা নির্ভর করে। র‍্যাকেটের মাথা লম্বাভাবে উপর দিক করে ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি ও তর্জনী দিয়ে র‍্যাকেটের হাতল এমনভাবে ধরতে হবে, যেন ইংরেজি ‘ভি’ অক্ষরের মত দেখায়। হাতের তালুর গোড়ালির সাথে র‍্যাকেটের প্রান্ত আটকে থাকবে।

পরিবেশন বা সার্ভিস করা

সাধারণত দুই ধরনের সার্ভিসের কৌশল জানলেই হয়। যথা–

হাই ড্রাইভ সার্ভিস

যখন ২০ ফুট বা তার চেয়ে উঁচু দিয়ে শাটলটি খাড়াভাবে বিপক্ষ কোর্টের বেইজ লাইনের কাছে ফেলা হয় তখন তাকে হাই ড্রাইভ সার্ভিস বলা হয়।

শর্টসার্ভিস

শাটলটি যখন খুব নিচু দিয়ে নেট পার করে বিপক্ষের সার্ভিস এলাকার শট সার্ভিস লাইন সংযুক্ত কোনায় ফেলা হয় তখন একে শট সার্ভিস বলে।

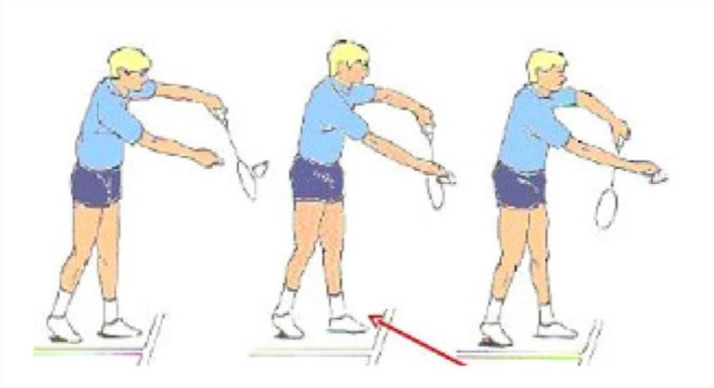

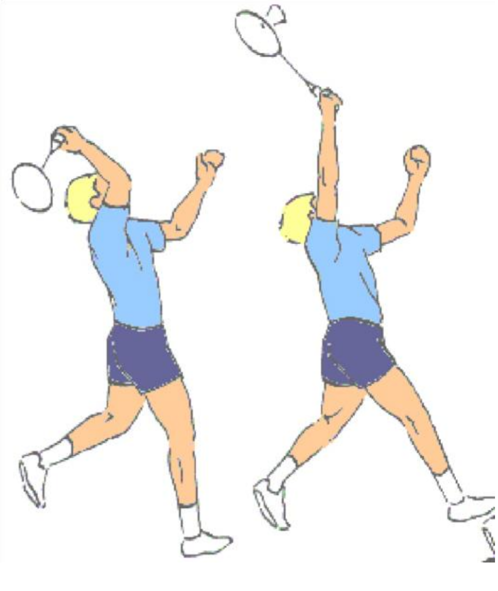

স্ট্রোক বা আঘাত করা

স্ট্রোক বা আঘাত করার কৌশলগুলোকে মোটামুটি চার ভাগে ভাগ করা যায়। যথা–

ফোরহ্যান্ড স্ট্রোক

শরীরের ডান পাশ দিয়ে শাটলে আঘাত করতে হবে। র‍্যাকেট পিছন দিকে নেওয়ার সময় ডান পায়ের উপর শরীরের ভর থাকবে। আঘাত করার সাথে সাথে শরীরের ভর ডান পা থেকে বাম পায়ের উপর চলে আসবে।

ব্যাকহ্যান্ড স্ট্রোক ডান পা ও কাঁধ নেটের দিকে থাকবে, শরীরের বাম পাশ দিয়ে শাটলে আঘাত করতে হবে। র‍্যাকেট পিছন দিকে নেওয়ার সময় বাঁ পায়ের উপর শরীরের ভর থাকবে। আঘাত করার সাথে সাথে শরীরের ভর ডান পায়ের উপর চলে আসবে।

ড্রপ স্ট্রোক

বাঁ পা আগে দিয়ে ডান পায়ের উপর শরীরের ভর রাখতে হবে। শরীর সামান্য পিছনে ঝুঁকিয়ে র‍্যাকেট মাথার উপর উঠিয়ে চাপ মারার ভান করে অকস্মাৎ গতি কমিয়ে শাটল বিপক্ষের কোর্টে নেটের কাছে ফেলতে হবে। আঘাত করার সাথে সাথে শরীরের ভর বাম পায়ের উপর চলে আসবে।

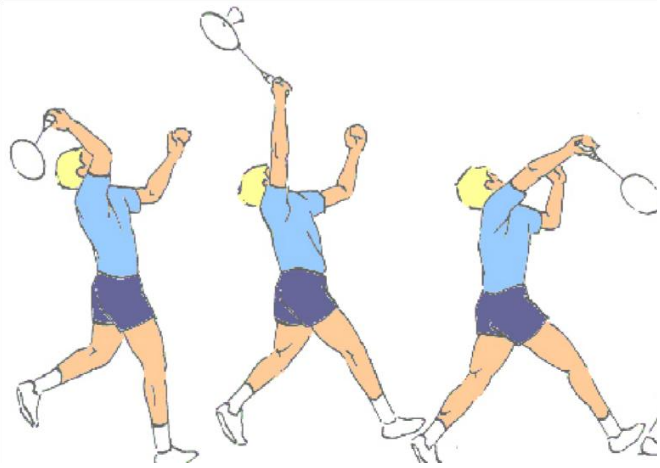

ওভারহ্যান্ড স্ট্রোক

ডান পায়ের উপর শরীরের ভর রাখতে হবে। শরীর সামান্য পিছনে ঝুঁকিয়ে মাথার উপর দিয়ে পিছন দিক থেকে র‍্যাকেট তুলে শাটলে আঘাত করতে হবে। আঘাত করার সাথে সাথে শরীরের ভর বাম পায়ের উপর চলে আসবে।

স্বল্প পরিসর খেলা (স্মল এরিয়া গেম)

কাবাডি

কাবাডি খেলার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস:

দক্ষিন এশিয়ার একটি জনপ্রিয় প্রাচীনতম খেলার নাম হল কাবাডি। বাংলাদেশে এ খেলাটি হা-ডু-ডু নামেও পরিচিত। অনেকেই মনে করেন বাংলাদেশের ফরিদপুর কিংবা ময়মনসিংহে এ খেলার উৎপত্তি হয়েছে। বাংলাদেশ কিংবা ভারতের প্রাচীন জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত সমতল ভূমিতে, পরবতীতে ক্রমবিবর্তনের ফলে নাম হয়েছে কাবাডি। ভারতীয় অলিম্পিক এ্যাসোসিয়েন ১৯৩৮ সালে কলকাতায় টালী পার্কে জাতীয় কাবাডি প্রতিযোগিতার আয়োজন করে বিশ্বব্যাপী এর বিস্তৃতি ঘটায়।

কাবাডি বাংলাদেশেরই প্রাচীনতম খেলা বিধায় অনেক আগে থেকেই এদেশে এ খেলার পরিচালনা হত। বাংলাদেশে কাবাডি খেলার জাতীয় সংগঠন রয়েছে। বাংলাদেশ কাবাডি ফেডারেশন এর উদ্যোগে বাংলাদেশ জাতীয় কাবাডি প্রতিযোগিতা, প্রিমিয়াম বিভাগ কাবাডি লীগ, যুব কাবাডি, বৈশাখী কাবাডি এবং স্বাধীনতা দিবস কাবাডি প্রতিযেগিতা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। বাংলাদেশ কাবাডি ফেডারেশন এই খেলাকে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে নেওয়ার জন্য ভারতের সাথে একত্র হয়ে কাজ করে যাচ্ছে। এরই মধ্যে এশিয়ার বিভিন্ন দেশে এই খেলার প্রচলন ঘটেছে। কাবাডি খেলার মাধ্যমে শিশুদের বুদ্ধিমত্তার বিকাশ, দৈহিক শক্তি, ক্ষিপ্রতা, দেহের বিভিন্ন অঙ্গের সমন্বয় সাধন ইত্যাদি দক্ষতা বৃদ্ধি পায়।

মাঠ

কাবাডি খেলার মাঠ সমতল ও আয়তাকার হতে হবে। পুরুষ, মহিলা, জুনিয়র গ্রুপ এবং মিনি বালক ও বালিকাদের জন্য মাঠের মাপ আলাদা হয়ে থাকে।

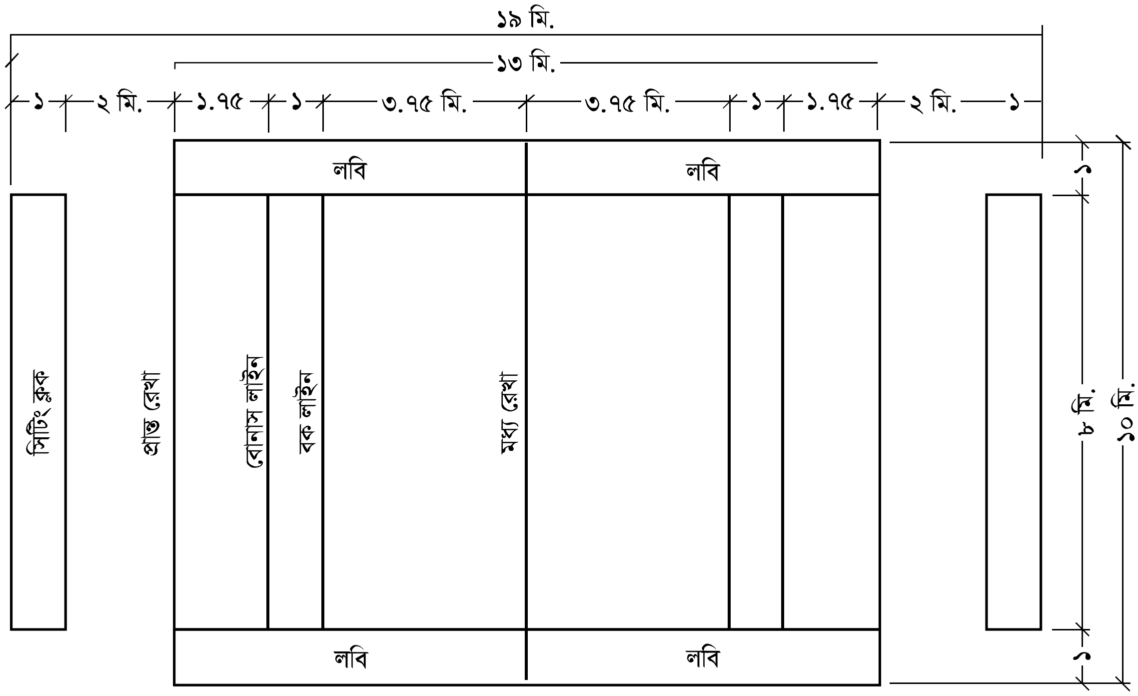

কাবাডি খেলার মাঠ

খেলোয়াড়

কাবাডি খেলায় প্রতি দলে ১২জন খেলোয়াড় থাকে, মাঠে খেলে ৭ জন বাকিরা বদলি খেলোয়াড় হিসেবে মাঠে থাকেন।

সময়

পুরুষদের ৫ মিনিট বিরতিসহ ৪৫ মিনিট, মহিলা ও জুনিয়র গ্রুপ, ৫ মিনিট বিরতিসহ ৩৫ মিনিট; মিনি বালক ও বালিকা, মহিলা ও জুনিয়র গ্রুপের সময়সীমার ন্যায় খেলতে হবে।

পয়েন্ট হওয়ার নিয়ম

রেইডার রেইড দিয়ে বা দম নিয়ে বিপক্ষ দলের যতজনকে স্পর্শ করে নিজের কোর্টে ফিরে আসবে তার প্রতিজনের জন্য ১ পয়েন্ট করে পাবে বা রেইডার বিপক্ষ কোর্টে ধরা পড়লে বিপক্ষ দল ১ পয়েন্ট পাবে।

জয়-পরাজয় নির্ধারণ

নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যে দল বেশি পয়েন্ট অর্জন করবে সে দলকে রেফারি বিজয়ী বলে ঘোষণা করবেন। উভয় দলের পয়েন্ট সমান হলে অতিরিক্ত ১০ মিনিট খেলাতে হবে। অতিরিক্ত সময়ে কোন বিরতি থাকবে না। তবে ৫ মিনিট পর উভয় দল কোর্ট বদল করবে। যদি এর পরও টাই থাকে তবে যে দল ‘লিডিং পয়েন্ট’ সংগ্রহ করেছিল তারাই জয়ী হবে। খেলায় যে দল প্রথম পয়েন্ট সংগ্রহ করে তাকে ‘লিডিং পয়েন্ট’ বলে।

অফিসিয়াল: সাধারণত ৬ জন অফিসিয়াল দিয়ে কাবাডি খেলা পরিচালিত হয়–একজন রেফারি, দুইজন আম্পায়ার, একজন স্কোরার ও দুইজন সহকারী স্কোরার।

কাবাডি খেলার নিয়মাবলি

১। রেফারি দুই অধিনায়কের সামনে টস করবেন। টসে জয়ী অধিনায়ক ‘দম’ বা কোর্ট পছন্দ করে নিতে পারে।

২। কোন খেলোয়াড়ের দেহ বা দেহের কোন অংশ কোর্টের বাইরের ভূমি স্পর্শ করলে সে আউট বলে বিবেচিত হবে। তবে স্ট্রাগল বা ধস্তাধস্তির সময় কোর্টের বাইরের ভূমি স্পর্শ করলেও আউট হবে না।

৩। খেলা চলাকালীন কোন খেলোয়াড় মাঠের বাইরে গেলে তাকে আউট বলে গণ্য করা হবে।

৪। খেলার মাঠে স্ট্রাগল শুরু হলে লবি মাঠের অন্তর্ভুক্ত হবে। স্ট্রাগলের পরে খেলোয়াড়গণ মাঠে প্রবেশের সময় লবি ব্যবহার করতে পারবে।

৫। রেইডার ক্যান্ট দেবার সময় কাবাডি শব্দটি জোরে উচ্চারণ করতে হবে। নতুবা রেফারি বা আম্পায়ার রেইডারকে নিজ কোর্টে ফেরত পাঠিয়ে সতর্ক করে দিবেন এবং অন্য দলকে ক্যান্ট দিবার সুযোগ দিবেন।

৬। রেইডার বিপক্ষ কোর্ট স্পর্শ করার আগে ক্যান্ট আরম্ভ করবে।

৭। একজন রেইডার তার নিজের কোর্টে পৌঁছাবার পর অথবা বিপক্ষ কোর্টে আউট হবার পর, বিপক্ষ দলকে ৫ সেকেন্ডের মধ্যে রেইড দিতে হবে। এভাবে খেলা শেষ না হওয়া পর্যন্ত চলতে থাকবে।

৮। বিপক্ষ কোর্টে একই সময় একজনের বেশি রেইড দিতে পারবে না।

৯। পক্ষ বা বিপক্ষ দলের কোন খেলোয়াড়ই একজন অন্যজনকে ইচ্ছাকৃতভাবে কোর্টের বাইরে ধাক্কা দিয়ে ফেলতে পারবে না।

১০। খেলোয়াড়গণ যে ক্রমানুসারে আউট হবে, সে ক্রমানুসারে বিপক্ষ দলের খেলোয়াড় আউট হওয়ার পরিবর্তে জীবিত হবে।

১১। যখন একটি দল বিপক্ষ দলের সকল খেলোয়াড়কে আউট করতে পারবে তখন তারা একটি লোনা পয়েন্ট পাবে। লোনার জন্য চলতি পয়েন্টের সাথে অতিরিক্ত দুই পয়েন্ট যোগ হবে।

আঞ্চলিক খেলা-দাড়িয়াবাঁধা

আঞ্চলিক খেলাগুলোর মধ্যে দাড়িয়াবাঁধা অন্যতম। বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে দাড়িয়াবাঁধা খেলাটি অত্যন্ত সুপরিচিত। বিশেষ করে শীতের বিকেলে শিশুরা দল বেঁধে এই খেলায় মেতে ওঠে। কচিকাঁচা শিশুরা এই খেলায় অংশগ্রহণ করে প্রচুর আনন্দ পায়, আর এই আনন্দের মাঝে শিশুদের শারীরিক শক্তি বৃদ্ধি, শৃঙ্খলা ও ক্ষিপ্রতা বৃদ্ধি পায় এবং এই খেলার মধ্যে গ্রামবাংলার ঐতিহ্য ফুটে ওঠে। দাড়িয়াবাঁধা খেলাটি গ্রামাঞ্চলের মানুষের নিজস্ব সৃষ্টি। আর এর নিয়ম-কানুন নিজেদের তৈরি। তাই এই খেলাটির প্রতি গ্রামবাংলার মানুষের আগ্রহ একটু বেশি।

মাঠ

দাড়িয়াবাঁধার খেলায় মাঠকে সাধারণত কোর্ট বলা হয়। এর দৈর্ঘ্য ৮৩ ফুট এবং প্রস্থ হবে ২১ ফুট। কোর্টের মাঝখান দিয়ে ১ ফুট চওড়া শেষ প্রান্ত বরাবর লাইন থাকবে। আড়াআড়িভাবে ১ ফুট চওড়া দাগ কেটে ১১ ফুট অন্তর একটা করে ঘর করতে হবে। এই ঘরগুলোকে দুর্গ বলা হয়।

খেলোয়াড়

প্রতি দলে ৭ থেকে ৯ জন খেলোয়াড় থাকবে। তবে কোর্ট কম-বেশি হলে খেলোয়াড়ও কম বা বেশি হতে পারে।

খেলার সময়

৫ মিনিট বিরতিসহ ২৫+২৫ মিনিট করে ৫৫ মিনিট খেলা হবে। সাধারণত দাড়িয়াবাঁধা ইনিংসে খেলা হয়ে থাকে। প্রতি অর্ধে তিন ইনিংসে খেলা হবে।

খেলার সাধারণ নিয়ম

দাড়িয়াবাঁধা খেলায় দুটি দল থাকে। একটিকে বলে আক্রমণকারী দল অন্যটি হলো রক্ষণকারী দল। রক্ষণকারী দল তাদের দুর্গে আড়াআড়ি ও লম্বা লাইনে অবস্থান করবে এবং আক্রমণকারী দল কোর্টের শুরু থেকে শেষ কোর্ট পর্যন্ত যাবে এবং পুনরায় আবার তারা উপরে উঠতে শুরু করবে। এভাবে শুরুর স্থান বা স্টার্টিং পয়েন্টে ফিরে আসতে পারলে একটি গেম হবে। তবে রক্ষণকারী দলের কোন খেলোয়াড় আক্রমণকারী দলের খেলোয়াড়কে ছুঁয়ে দিতে পারলে সবাই মারা যাবে বা আউট হবে। এরপর রক্ষণকারী দল হবে আক্রমণকারী।

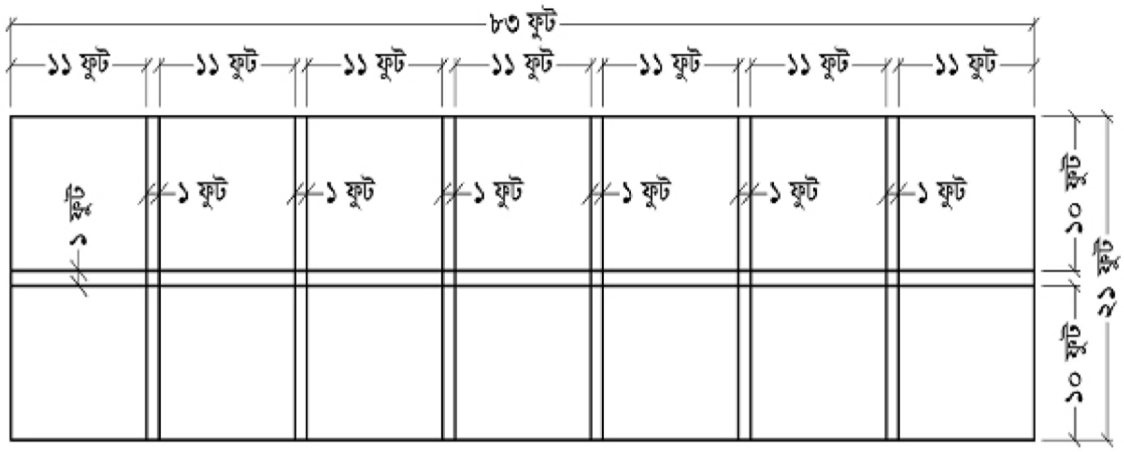

গোল্লাছুট

আঞ্চলিক খেলাধুলার মধ্যে গোল্লাছুট অন্যতম। খোলা মাঠ বা বাগানে এই খেলা হয়ে থাকে। এই খেলা মূলত দুটি দলে হয়ে থাকে। প্রতি দলে চারজন থেকে আটজন খেলোয়াড় থাকতে পারে। খেলার আগে দুই দলে মিলে খেলার সীমানা নির্ধারণ করে থাকে। একটি ছোট গর্ত খেলার কেন্দ্রস্থল। কিছুটা দূরে খানিকটা ইট, পাথর বা একটা গাছের গুঁড়ি দিয়ে সীমানা বা নিশানা নির্দিষ্ট করে নেওয়া হয়। গর্তটাকে গোল্লা বলা হয়। গোল্লা থেকে ছুটে গিয়ে খেলোয়াড়দের এই সীমানায় গাছ কিংবা অন্য চিহ্ন ছোঁয়াই এই খেলার মূল উদ্দেশ্য। গ্রামবাংলার মানুষের তেমন বিনোদনের ব্যবস্থা নাই। আঞ্চলিক খেলাগুলোর মাধ্যমে তারা বিভিন্ন রকম আনন্দ লাভ করে। এছাড়াও এই খেলার মাধ্যমে শিশুদের শারীরিক, মানসিক, নৈতিক ও সামাজিক দক্ষতাগুলো অর্জিত হয়।

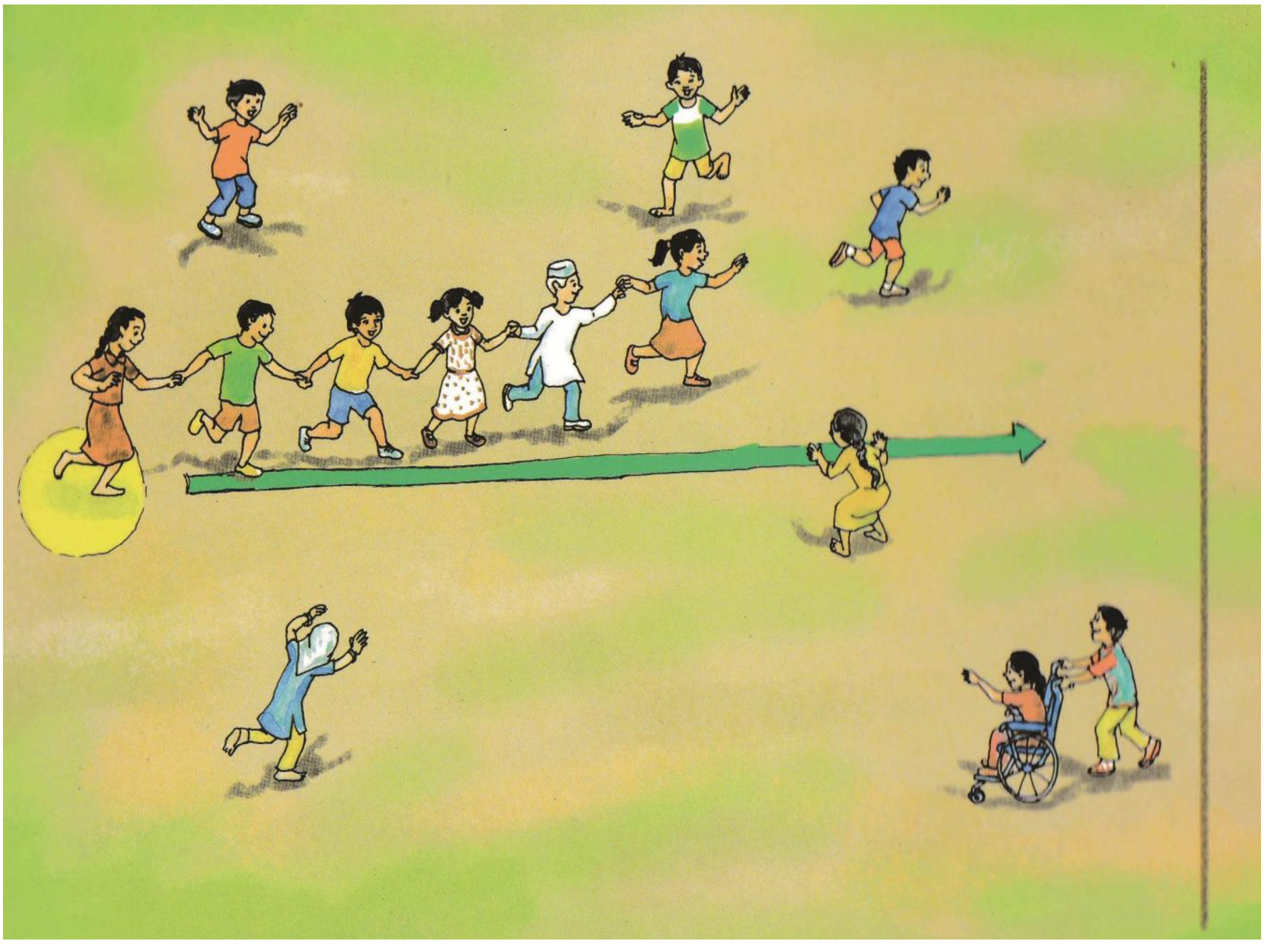

চিত্রঃ গোল্লাছুট খেলার মাঠ (সূত্রঃ খেলতে খেলতে শেখা, ব্রিটিশ কাউন্সিল, বাংলাদেশ)

খেলার নিয়ম

দান পাওয়া দলটির প্রধান বা দলনেতা গোল্লায় এক পা রেখে দাঁড়াবে। দলের বাকি খেলোয়াড়রা হাত ধরাধরি করে গোল্লার হাত ধরে ঘুরতে থাকবে। বিপক্ষ দলের খেলোয়াড়রা চারপাশে ছড়িয়ে ওত পেতে থাকবে, যাতে গোল্লা দলের কোন খেলোয়াড় তাদের ফাঁকি দিয়ে সীমানায় পৌঁছতে না পারে। গোল্লাদলের খেলোয়াড়রা হাত ধরাধরি করে ঘুরতে

ঘুরতে এক সময় গোল্লা থেকে ছিটকে বেরিয়ে গিয়ে তীব্র বেগে ছুটে লক্ষ্যস্থলে বা সীমানায় গিয়ে পৌঁছানোর চেষ্টা করবে। বিপক্ষ দলের খেলোয়াড়রা চেষ্টা করবে লক্ষ্যস্থলে পৌছার আগে তাদের ছুঁয়ে দিতে বা ধরে ফেলতে। ছুঁয়ে দেওয়া বা ধরে ফেলাকে 'মরা' বলে। কিন্তু গোল্লা যদি নিশানায় পৌছে যায়, তবে তাদের দল জিতেছে বলে ধরা হয়। গোল্লাদলের কোন খেলোয়াড়ই যদি লক্ষ্যস্থলে পৌঁছার আগে 'মরা' হয়ে যায়, তাহলে তাদের দান শেষ হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হয়। তখন যে দল প্রতিপক্ষ ছিল তারা গোল্লা দখল করে নতুনভাবে খেলা শুরু করবে।

এই প্রসংগে বলা যায়, যারা মাঠ আগলাবে তাদের দলের খেলোয়াড়রাও 'মরা' বা আউট হতে পারে। গোল্লা দলের খেলোয়াড়রা হাত ধরাধরি করে ঘুরতে ঘুরতে বিপক্ষের কোন খেলোয়াড়কে ছুঁয়ে ফেলতে পারলে ফিল্ডিং দলের বা সীমানা আগলানো দলের গেণ খেলোয়াড়টি 'মরা' বা আউট হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হয়। মরা খেলোয়াড়টি আর মাঠে অংশগ্রহণ করতে পারে না।

এ্যাথলেটিকস

এ্যাথলেটিকস সারা বিশ্বে তথা বাংলাদেশের জনপ্রিয় খেলাগুলোর অন্যতম। আমাদের দেশে সর্বত্র এ্যাথলেটিকস প্রতিযোগিতা হয়ে থাকে। বিশেষ করে স্কুলগুলোতে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার ইভেন্টগুলো হলো এ্যাথলেটিকসের অংশ। আমাদের দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আন্ত:স্কুল, আন্ত: কলেজ, আন্ত:বিশ্ববিদ্যালয়ে এ্যাথলেটিকস প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়াও জাতীয় পর্যায়ে এ্যাথলেটিকস প্রতিযোগিতা হয়ে থাকে। আধুনিক অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় এখনও সেরা ইভেন্ট হলো এ্যাথলেটিকস আর এ্যাথলেটিকসের এই বিষয়গুলোর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন ধরনের দক্ষতা অর্জন করে। যেমন–দৈহিক শক্তি, গতি, ক্ষিপ্রতা, বুদ্ধিমত্তা, শৃঙ্খলাবোধ, সহিষ্ণুতা ইত্যাদি।

এ্যাথলেটিকস

পৃথিবীতে যত প্রকার খেলাধুলা চালু আছে তার মধ্যে দৌড়, ঝাঁপ ও নিক্ষেপই সবচেয়ে প্রাচীন। খেলাধুলার ক্ষেত্রে দৌড়, ঝাঁপ ও নিক্ষেপকে এক কথায় এ্যাথলেটিকস বা ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ড ইভেন্ট বলা হয়।

অ্যাথলেটিকসের ইভেন্টসমূহকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে–

এ্যাথলেটিকস

ট্র্যাক ইভেন্টস

দৌড় সমূহ

০১। ১০০ মি. স্প্রিন্ট
০২। ২০০ মি. স্প্রিন্ট
০৩। ৪০০ মি. স্প্রিন্ট
০৪। ৮০০ মি. দৌড়
০৫। ১৫০০ মি. দৌড়
০৬। ৫০০০ মি. দৌড়
০৭। ১০০০০ মি. দৌড়
০৮। ৪X১০০ মি. রিলে দৌড়
০৯। ৪X৪০০ মি. রিলে দৌড়
১০। ১০০ মি. হার্ডলস
১১। ১১০ মি. হার্ডলস
১২। ৪০০ মি. হার্ডল
১৩। ৩০০০ মি. স্টিপল চেজ (২৮ বার হার্ডলস অতিক্রম ও ৭ বার পানিতে লাফাতে হয়।
১৪। ম্যারাথন দৌড় (২৬ মাইল ৩৮৫ গজ)
১৫। ২০ কি.মি. হাঁটা
১৬। ৫০ কি.মি. হাঁটা
১৭। ২০০০ মি.টিপলচেজ (১৮ বার হার্ডলস অতিক্রম ও ৫ বার পানিতে লাফ)।

ফিল্ড ইভেন্টস

লাফসমূহ

১। দীর্ঘ লাফ
২। উচ্চ লাফ
৩। ট্রিপল জাম্প
৪। পোলভল্ট

নিক্ষেপসমূহ

১। লৌহ গোলক নিক্ষেপ
২। চাকতি নিক্ষেপ
৩। বর্শা নিক্ষেপ
৪। হ্যামার নিক্ষেপ

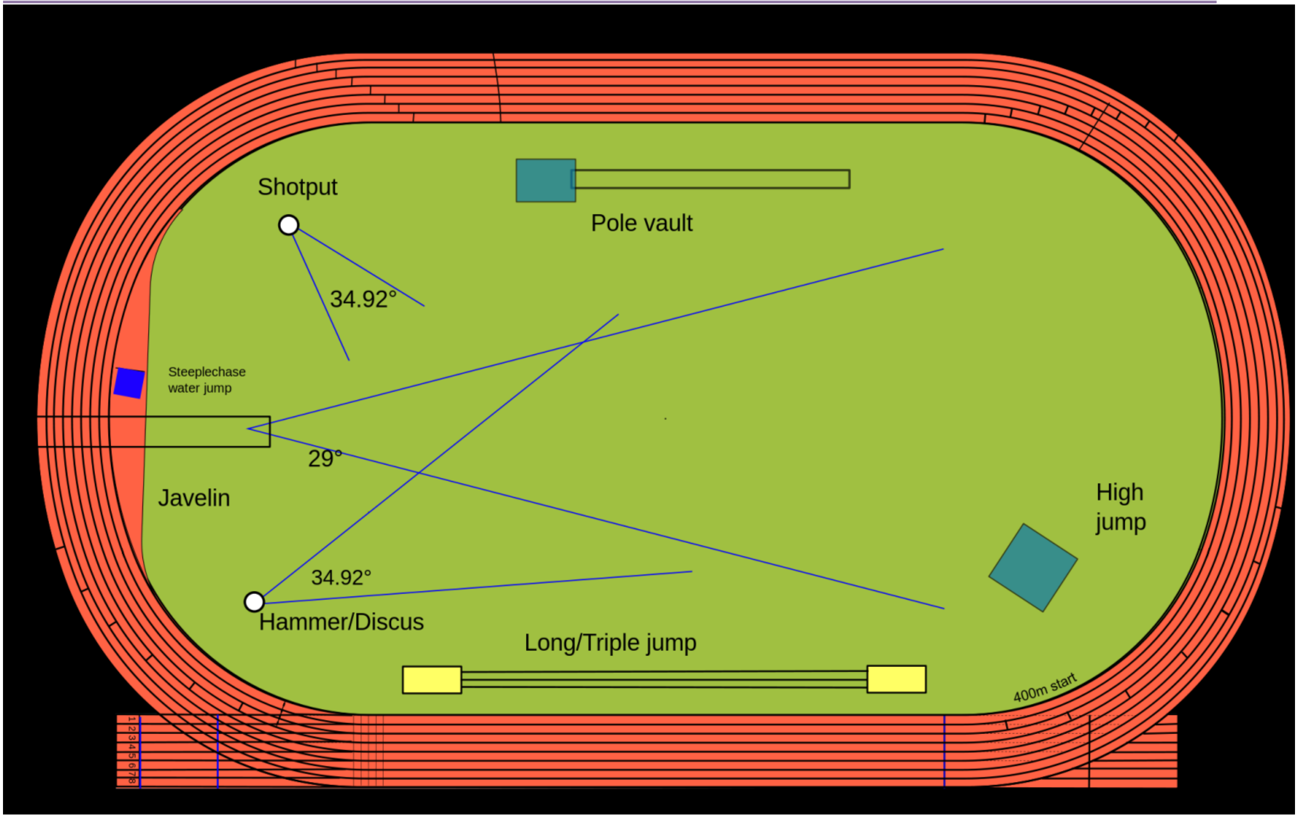

দৌড়ের শ্রেণিবিভাগ

তিনভাগে-

- স্বল্প দূরত্বের দৌড় (Sprints)
- মধ্যম দূরত্বের দৌড় (Middle Distance Run)
- দীর্ঘ দূরত্বের দৌড় (Long Distance Run)
- স্বল্প দূরত্বের দৌড়- ১০০ মি:, ২০০মি:, ১১০ মি:, হার্ডেলস পুরুষ, ১০০ মি: হার্ডেল মহিলা, ৪×১০০ মি: রিলে, ৪০০ মি: হার্ডেল।
- মধ্যম দূরত্বের দৌড়- ৮০০ মি:, ১৫০০ মি:, ৪×৪০০ মি: হার্ডেল।
- লম্বা বা দীর্ঘ দূরত্বের দৌড় ৩০০০ মিটার, ৩০০০ মি: ষ্টিপল চেজ, ৫০০০ মি: রান, ১০,০০০ মি: রান, ম্যারাথন দৌড় ও হাঁটাসমূহ।

ম্যারাথন দৌড়ের উৎপত্তি ও দূরত্ব

ম্যারাথন দৌড়ের নামকরণ হয়েছে গ্রীসের বিখ্যাত যুদ্ধক্ষেত্রে ম্যারাথনের নামানুসারে। খ্রী: পূর্ব ৪৯০ অব্দে গ্রীসের ম্যারাথন যুদ্ধক্ষেত্রে গ্রীকরা পারস্যে বাহিনীকে পরাজিত করে। এই যুদ্ধ বিজয়ের সংবাদ বহন করে আনেন এক গ্রীক দূত ফিডিপাইডিস। এই অসম সাহসী যুবক দীর্ঘ সমতল ও বন্ধুর পথ পদব্রজে অতিক্রম করে এথেন্সের রাজপুরুষদের কাছে এই জয়ের সংবাদ পৌঁছায়ে দেন। ‘নেনিকে কামান’ আমরা যুদ্ধে জয় লাভ করেছি এই কথা বলার পর যুবকটি মাটিতে লুটায়ে পড়েন এবং মৃত্যু মুখে পতিত হন। এরপর হতে এই যুবকের সম্মানে ম্যারাথন যুদ্ধক্ষেত্রের নামানুসারে

এই দূর পাল্লার দৌড় শুরু হয়। এই দৌড়ের দূরত্ব ২৬ মাইল ৩৮৫ গজ। ১৮৯৬ সালের অলিম্পিকে এই দূরত্ব ছিল ২৫ মাইল ২৬০ গজ।

রিলে রেইস (যুক্ত দৌড়)

যখন কোন নির্দিষ্ট দূরত্বে সাধারণত ৪ জন প্রতিযোগী একের পর এক দৌড় শেষ করে তাকে রিলে রেইস বা যুক্ত দৌড় বলে। একটি কাঠি বদলের মাধ্যমে প্রতিযোগীরা যোগাযোগ রক্ষা করে। ৪×১০০, ৪×৪০০ মিটার দূরত্বের রিলে রেইস বা যুক্ত দৌড় হয়ে থাকে।

হার্ডলস (বেড় দৌড়)

বেড় দৌড়কে ইংরেজিতে হার্ডল রেস বলে। প্রতিটি লেনে ১০টি বেড় বা হার্ডলস অতিক্রম করে এ দৌড় সম্পন্ন করতে হয়। হার্ডল রেস ২ প্রকার। পুরুষ-১১০ মি. ও ৪০০ মি.এবং মহিলা-১০০ মি. ও ৪০০ মি.।

স্টিপল চেজ

হার্ডল জাম্প ও ওয়াটার জাম্পের সমন্বয়ে যে দৌড় সম্পন্ন করতে হয় তাকে স্টিপল চেজ বলে।

- ৩০০০ মিটার স্টিপল চেজে ৩৫টি জাম্প দিতে হয় (২৮টি হার্ডল জাম্প এবং ৭টি ওয়াটার জাম্প)
- ২০০০ মিটার স্টিপল চেজে ২৩টি জাম্প দিতে হয় (১৮টি হার্ডল জাম্প এবং ৫টি ওয়াটার জাম্প)

কলা কৌশল

ছোট দৌড় বা স্প্রিন্ট দৌড়

প্রতিযোগিতা শুরুর কিছুটা পূর্বে ওয়ার্ম-আপ করে নিবেন। অন ইওর মার্ক বলার সাথে সাথে স্টার্টিং ব্লক ও স্টার্টিং লাইনের কাছে আপনি যে অবস্থায় স্টার্ট নিতে চান সেভাবে পা রাখুন। সেট বলার সাথে সাথে শরীরের পিছনের অংশ তুলে সামনের দিকে দৃষ্টি রেখে পুরোপুরি প্রস্তুত হয়ে যান। ২ বা ৩ সেকেন্ডেই বাঁশি বা বন্দুকের আওয়াজে দৌড় শুরু করুন। খেয়াল রাখতে হবে যাতে ফলস স্টার্ট না হয়। দৌড়ের সময় হাত মুষ্টিবদ্ধ করা যাবে না। হাতের কনুই সামান্য শরীরের পিছনে যাবে, পায়ের আঙুলের উপর ভর করে দৌড়াবেন। দৌড় ফিনিশিং এর সময় গতি কমাবেন না। লাফ দিয়ে বা হাত দিয়ে ফিতা ধরে দৌড় সমাপ্ত করা যাবে না। সমাপ্তি রেখায় টর্সো (নাভি থেকে গলকণ্ঠ পর্যন্ত)

স্পর্শ করুন।

মধ্যম দূরত্বে দৌড়

যারা ছোট দৌড়ে ভাল করতে পারে না তারা ৮০০ মিটার বা মধ্যম দূরত্বের দৌড়ে ভাল করে। সেমিক্রস স্টার্টে দৌড় শুরু করুন। শরীর ঢিলা রাখুন ও দৌড়ানোর শক্তি সমবন্টন করুন। যখন কাউকে অতিক্রম করতে চান তার ডান পাশ দিয়ে সোজা লাইনে থাকার সময় অতিক্রম করুন, বাঁকা লাইনে নয়।

লম্বা দূরত্বের দৌড়

ক্রসকান্ট্রি দৌড়বিদ ছাড়া বড় দূরত্বের দৌড়বিদ পাওয়া কষ্টকর। তবে দীর্ঘদিনের নিয়মিত অনুশীলন ও সাধনার দ্বারা বড় দূরত্বের দৌড়বিদ তৈরি করা সম্ভব। পায়ের গতি, শ্বাস-প্রশ্বাস ক্ষমতা এবং পেইস জাজমেন্ট যাদের ভাল তারা বড় দূরত্বের দৌড়ে ভাল করতে পারে। বড় দৌড়ের সময় পায়ের পাতার উপর দৌড়াবেন না। দৌড়ের জন্য কেউ 'বলহিল-বল' পদক্ষেপ, কেহ 'হিল-বল-হিল' পদক্ষেপ সুপারিশ করেন। তবে প্রতিযোগী তাঁর সুবিধামত যে কোনটা বেছে নিতে পারেন। দৌড়ের সময় দীর্ঘ পদক্ষেপ না নিয়ে স্বাভাবিক পদক্ষেপ নিলেই চলে। এই দৌড়ের ফলাফল নির্ভর করবে শেষ শক্তি প্রয়োগের যথার্থ সময় ও দূরত্বের উপর।

দীর্ঘ লাফ

কোন নির্দিষ্ট জায়গায় এক পা ফেলে ঐ পায়ের উপর ভর দিয়ে যতদূর সম্ভব সামনের দিকে লাফিয়ে যাওয়াকেই দীর্ঘ লাফ বলে। দীর্ঘ লাফকে ইংরেজিতে লং জাম্প বলে। সাধারণত যারা ভাল স্প্রিন্টার তারা দীর্ঘ লাফে ভাল করে। একজন ভাল লং জাম্পার হতে হলে তার শক্তি ও গতি প্রয়োজন, যা স্প্রিন্টারের মধ্যে আছে।

দীর্ঘ লাফের কৌশল

দীর্ঘ লাফের কৌশলকে চারভাগে ভাগ করা হয়েছে–ক) অ্যাপ্রোচ রান (দৌড়ে আসা), খ) টেক অফ (মাটিতে ভর দিয়ে উপরে ওঠা), গ) ফ্লাইট (শূন্যে ভাসা), ঘ) ল্যান্ডিং (মাটিতে অবতরণ)।

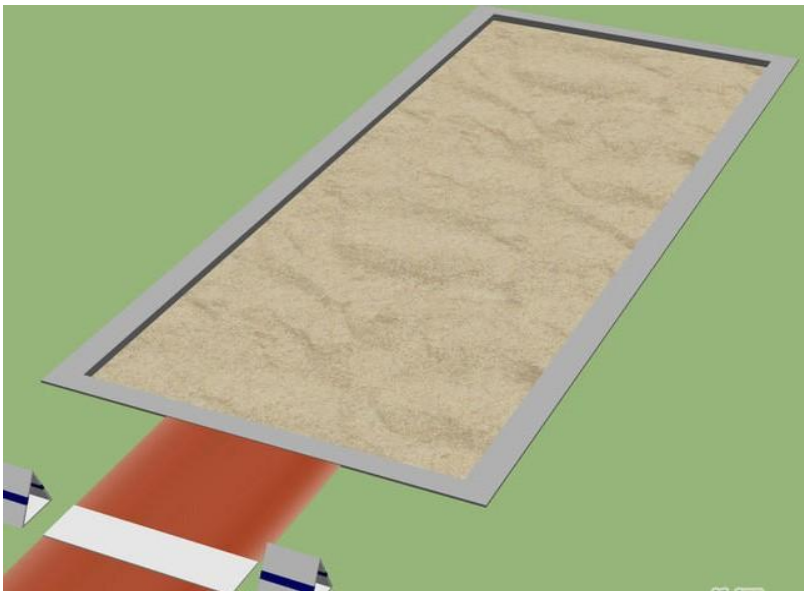

- লাফ দেওয়ার জন্য ৫০-৮০ ফুট দূর থেকে দৌড়ে আসতে হবে। শেষের পদক্ষেপগুলো খুব দ্রুত নিতে হবে।
- টেক অফ বোর্ডটি ৪ ফুট লম্বা, ৮ ইঞ্চি চওড়া ও ৪ ইঞ্চি গভীর হয়। এর উপরিভাগে সাদা রং থাকে। এর উপর পা দিয়ে শূন্যে ওঠাকে টেক অফ বলে। যার টেক অফ যত ভাল হবে সে তত দূরত্ব অতিক্রম করবে।
- টেক অফ বোর্ড ত্যাগ করার পর থেকে জাম্প পিটে অবতরণের পূর্ব পর্যন্ত শূন্যে বা বাতাসে অবস্থানকে ফ্লাইট বলে।

- মাটিতে অবতরণের সময় প্রথমে গোড়ালি দুটি মাটি স্পর্শ করবে এবং সেই সাথে দুই হাঁটু ভেঙে শরীরের ভর পায়ের পাতায় নিয়ে আসতে হবে। তারপর সামনের দিকে গড়িয়ে পড়তে হবে।

উচ্চ লাফ

কোন নির্দিষ্ট জায়গায় এক পা ফেলে ঐ পায়ের উপর ভর দিয়ে যতদূর সম্ভব উপরের দিকে লাফ দিয়ে উঠে ক্রসবার অতিক্রম করাকে উচ্চ লাফ বলে। উচ্চ লাফকে ইংরেজিতে হাই জাম্প বলে। উচ্চ লাফের ল্যান্ডিং এরিয়ার দৈর্ঘ্য ৫ মিটার, প্রস্থ ৫ মিটার এবং উচ্চতা ৬০ সেন্টিমিটার। ক্রসবারের দৈর্ঘ্য ৩.৯৮–৪.০২ মিটার, ওজন ২ কেজি এবং ব্যাস ২৯–৩১ মিলিমিটার।

উচ্চ লাফের কৌশল সাধারণত উচ্চ লাফের জন্য অনেকগুলি কৌশল আছে। যেমন–

সিজার (Scissors)

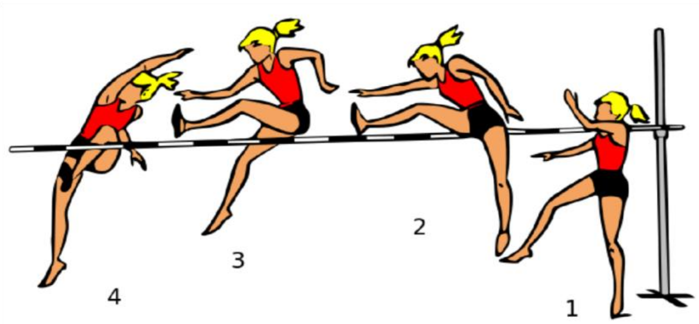

ওয়েস্টার্ন রোলের জন্য অ্যাপ্রোচের জায়গা খুব একটা বেশি প্রয়োজন হয় না। সাধারণত সাত পদক্ষেপ দৌড়ে এসে লাফ দিতে হয়। শেষের তিনটি পদক্ষেপ দ্রুত এবং অপেক্ষাকৃত লম্বা দিতে হয়। যে পায়ে টেক অফ নিবে সেই পায়ের গোড়ালি থেকে পাতার উপর সম্পূর্ণ শরীরটাকে এনে পাকে সোজা করে মাটি ছেড়ে উপরে উঠতে হবে। যে পায়ে টেক অফ নিবে সেই পায়ের হাঁটু ভেঙে উপরে তুলতে হবে। ক্রসবারের উপর কাঁধকে খাড়াভাবে রেখে ক্রসবার অতিক্রম করতে হবে। যে পায়ে টেক অফ নিবে সেই পা ও দুই হাতের উপর ভর করে ল্যান্ডিং করতে হবে।

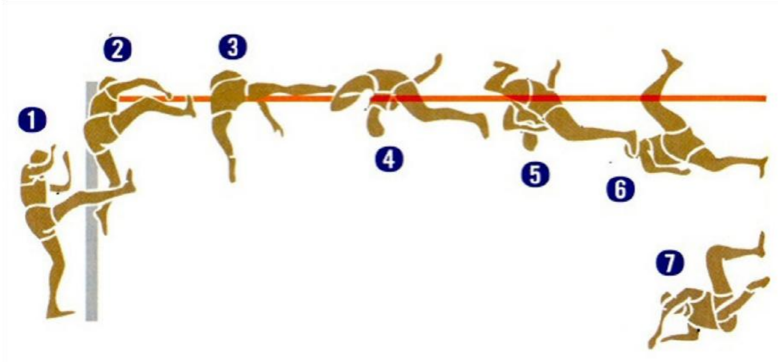

বেলি রোল

ওয়েস্টার্ন রোল এবং বেলি রোলের কলাকৌশল মোটামুটি একই রকম। প্রতিযোগী বেলি রোলের জন্য ৩০ ডিগ্রি কৌণিক দূরত্ব হতে আট বা নয় পদক্ষেপের পর ভূমি থেকে টেক অফ নিয়ে বার অতিক্রম করবে।

ফস্‌ বেরি ফ্লপ (Fos Bury Flop)

এই পদ্ধতির বিশেষত্ব হল, পিঠ দিয়ে ক্রসবার অতিক্রম করতে হয়। ফস্‌ বেরি ফ্লপ স্টাইলে টেক অফ এর কাজটি অর্ধবৃত্তাকারে নিতে হয়। এই পদ্ধতির সবচেয়ে সুবিধা হল,

শরীরের ওজন ভূমি থেকে খুব অল্প তুলেই ক্রসবারকে অনায়াসে অতিক্রম করা যায়।

এ

এই লাফকে ট্রিপল জাম্প বলা হয়। এই জাম্পের অ্যাপ্রোচ প্রায় দীর্ঘ লাফের মতই। দৌড় শুরু করে যে পায়ে টেক অফ নিবে সেই পায়েই হপ, বিপরীত পায়ে স্টেপ নিবেন এবং পরে দীর্ঘ লাফের মত শূন্যে বাতাসে ভেসে উভয় পায়ে অবতরণ করবেন।

গোলক নিক্ষেপ

গোলকটি লোহা, তামা বা পিতলের তৈরি হবে, এটি অবশ্যই গোলাকার হবে। পুরুষদের জন্য ওজন−৭.২৬ কেজি এবং মহিলাদের জন্য ওজন ৪ কেজি। ২.১৩৫ (± ৫ মি:মি:) মিটার বৃত্তের ব্যাস নিয়ে ৩৪.৯২ ডিগ্রি কোণে গোলক নিক্ষেপ করতে হবে। নিক্ষেপকারী প্রতিযোগীকে প্রতিবার নিক্ষেপ করার পর বৃত্তের পিছনের অংশ থেকে বের হতে হবে। বৃত্তের সামনের অংশ দিয়ে বের হলে ঐ নিক্ষেপটি বাতিল হবে। নিক্ষেপের সময় বৃত্তের দাগ স্পর্শ করলে নিক্ষেপটি বাতিল হবে।

চাকতি নিক্ষেপ

চাকতির ভিতরের অংশ কাঠের এবং বাইরে লোহা বা লোহা জাতীয় পদার্থ দ্বারা তৈরি হবে। পুরুষদের জন্য চাকতির ওজন ২ কেজি এবং মহিলাদের জন্য ওজন হবে ১ কেজি । ২.৫০ (± ৫ মি:মি:) মিটার বৃত্তের ব্যাস নিয়ে ৩৪.৯২ ডিগ্রি কোণে চাকতি নিক্ষেপ করতে হবে।

বর্শা নিক্ষেপ

বর্শা সাধাণত কাঠের তৈরি লম্বা হয়। এর মাথার সামনের অংশ সুচালো লোহার বা মেটাল দিয়ে তৈরি হয়।

- পুরুষদের জন্য বর্শার ওজন ৮০০ গ্রাম এবং দৈর্ঘ্য ২.৬০ মিটার থেকে ২.৭০ মিটার।

মহিলাদের জন্য বর্শার ওজন ৬০০ গ্রাম এবং দৈর্ঘ্য ২.২০ মিটার থেকে ২.৩০ মিটার পর্যন্ত। বর্শা নিক্ষেপের জন্য ৩০ মিটার থেকে ৩৬.৫ মিটার দৈর্ঘ্য ও ৪ মি: প্রস্থ রানওয়ে থাকে। নিক্ষেপকৃত বর্শাটি মাটিতে আঁচড় বা গেঁথে যেতে হবে, অন্যথায় নিক্ষেপটি বাতিল বলে গণ্য হবে।

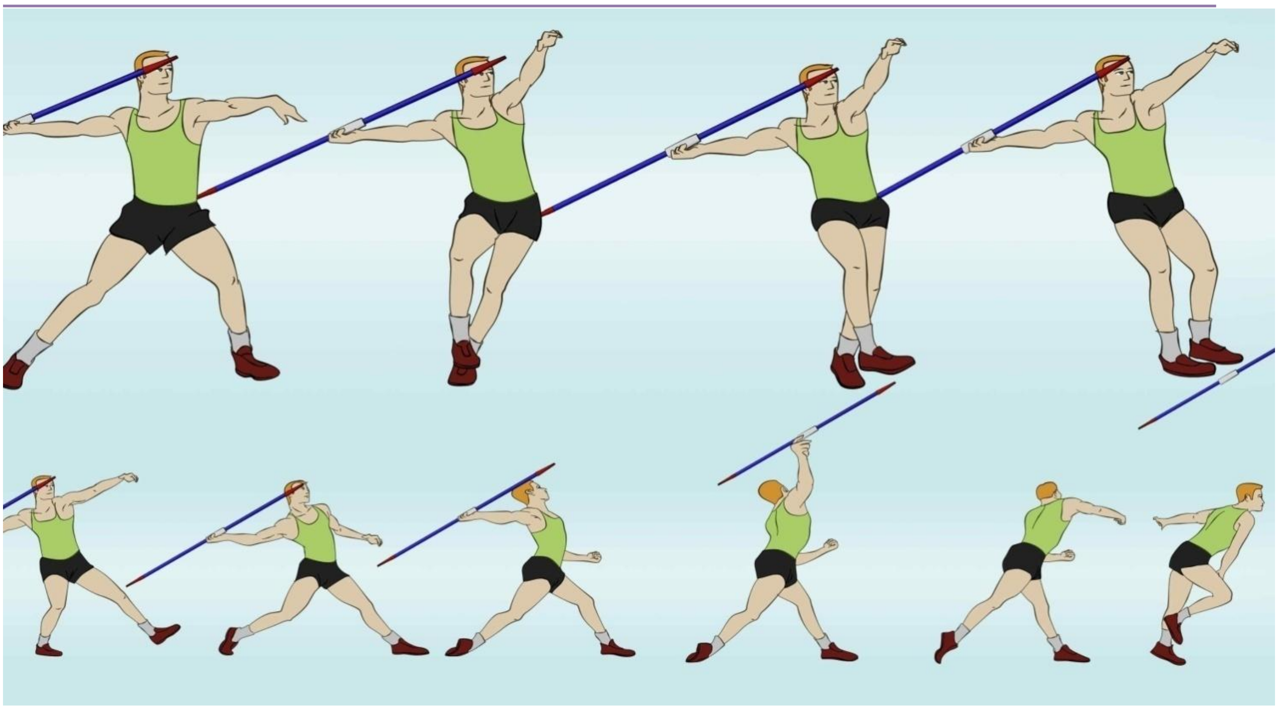

456

সাঁতার

সাঁতারের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস:

বাংলাদেশ নদী-নালা, খাল-বিল, ঝিল-হাওরের দেশ। জন্মের পর হতেই এদেশের গ্রামাঞ্চলের শিশু-কিশোররা নদী, পানি এবং সাঁতারের সাথে পরিচিতি লাভ করে থাকে। বাংলাদেশের মত নদী-নালা, খাল-বিল ও জলাশয়পূর্ণ দেশে স্বাস্থ্য, জীবন রক্ষা, ক্রীড়া ও আনন্দের জন্য সকলেরই অতি ছোটবেলা থেকে সাঁতার শিখে নেওয়া প্রয়োজন। সাঁতার শেখার জন্য নির্দিষ্ট কোন সময় নেই। পানি শিশুর জীবনে একটা চ্যালেঞ্জ। একে যত তাড়াতাড়ি মোকাবেলা করা যায় ততই উত্তম।

বর্তমানে আমরা যে ধরনের সাঁতার দেখতে পাই, সে সাঁতার প্রথমে ইংরেজরা শুরু করেন। Swimming ইংরেজি শব্দ সুইমিন থেকে এসেছে। ১৮৩৭ সালে লন্ডনে প্রথম প্রতিযোগিতামূলক সাঁতার অনুষ্ঠিত হয়। ১৯০৮ সালে সাঁতারের আন্তর্জাতিক সংস্থা FINA (Federation International de Nation Amateur) গঠিত হয়। ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ সুইমিং ফেডারেশন প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বাধীনতা উত্তর এদেশের সাঁতার প্রশিক্ষণের জন্য কোন সংগঠন ছিল না। কিন্তু ১৯৭৩ সালে এ্যামেচার সুইমিং ফেডারেশন গঠিত হলে সাঁতার প্রশিক্ষণে এ দেশের সাঁতারুরা বহুদূর এগিয়ে যায়। যার ফলশ্রুতিতে এ দেশের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সাঁতারুরা এশিয়ান গেমস, সাফ গেমস, কমনওয়েলথ গেমসসহ অন্যান্য বিশ্ব সাঁতার প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পেরেছে। ১৯৫৮ এবং ১৯৬১ সালে পর পর ৬ বার ইংলিশ চ্যানেল বিজয়ী মি. দাশ ঢাকারই কৃতিসন্তান। বাংলাদেশ সাঁতারের জগতে এমন কৃতিত্ববান শ্রেষ্ঠ প্রতিভাধর সাঁতারুর জন্ম দিয়ে সত্যিই এক বিরল গৌরবঅর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। সাঁতারের সাহায্যে দেহের সকল অঙ্গের ব্যায়াম হয় বলে একে পূর্নাঙ্গ ব্যায়াম বলা হয়।

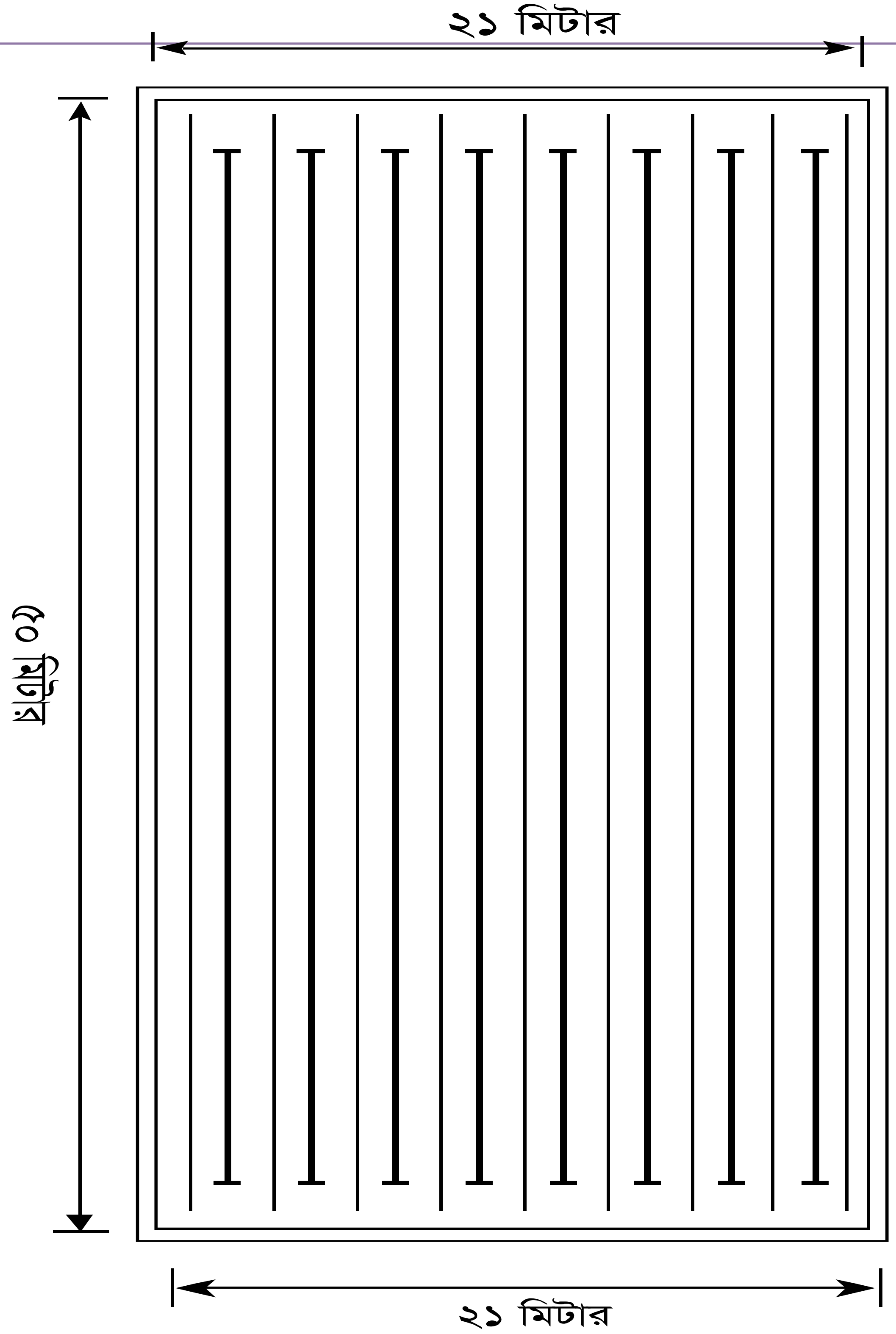

- সুইমিং পুল।

সাঁতার শেখার সহায়ক জিনিসপত্র

সাঁতার শেখার জন্য সাধারণত নিম্নলিখিত জিনিসগুলো সহায়ক হিসেবে ব্যবহার করা হয়। যথা-

- জীবন রক্ষার জন্য বয়া
- মোটর গাড়ির চাকার টিউব
- কলাগাছ
- ভাসমান কাঠ বা বাঁশ
- বড় শোলা।

সাঁতার অনুশীলনের সময় সতর্কতা

- আবর্জনা ও বিপদজনক দ্রব্য মুক্ত করে সাঁতারের জায়গা নিরাপদ করা।
- অল্প পানির জায়গা বেছে নেওয়া।
- কেউ ডুবে যেতে লাগলে তাঁকে তুলে আনতে পারে এমন একজন অভিজ্ঞ সাঁতারুকে কাছে রাখা।
- ভাসমান বস্তু কাছে রাখা।
- আহার করার দেড় ঘণ্টার মধ্যে বা খালি পেটে সাঁতার অনুশীলন না করা।
- সম্ভব হলে লাইফ বোট বা লাইফ জ্যাকেট কাছে রাখা।
- লম্বা, মোটা ও শক্ত দড়ি বা বাঁশ কাছে রাখা।
- পোশাক পরিবর্তনের কক্ষ ও বাথরুমের ব্যবস্থা করা।

প্রতিযোগিতামূলক সাঁতার চার প্রকার। যথা–

ক. মুক্ত সাঁতার (Freestyle swimming) খ. চিৎ সাঁতার (Back Stroke)

গ. বুক সাঁতার (Breast Stroke) ঘ. প্রজাপতি সাঁতার (Butterfly swimming)

বিভিন্ন প্রকার সাঁতার কলাকৌশল

ক) মুক্ত সাঁতার

মুক্ত সাঁতারকে Free Style সাঁতার বলে। এ স্টাইলে খুব দ্রুত সাঁতার কাটা যায়।

শরীরের অবস্থান

* চুল এবং চোখের মধ্য রেখা বরাবর পানির সমতায় শরীর উপুর (Horizontal) হয়ে থাকবে।

* মাথা দিয়ে পানি কেটে এবং পা দিয়ে পানির ভিতরে কেটে দেহকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

* সম্মুখের বাহুর সাথে লম্বভাবে শরীরকে গড়িয়ে (Roll) সামনে দিকে অগ্রসর হবে।

বাহু চালনা (Arm Stroke)

* হাতকে ভেঙ্গে সোজা সামনের দিকে নিয়ে যাবে।

* পানি কেটে ভাঙ্গা হাতকে সোজা করবে

* ভাঙ্গা কনুই (Elbow) এবং বাহু পানির উপরে কিছুক্ষণ থামবে।

* বাহু সামনের দিকে গেলে খোলা হাত বাহির মুখী হয়ে ৪৫° কোনে বাঁকানো থাকবে।

* হাতের আঙ্গুলগুলো লাগানো অবস্থায় শরীরের সাথে আড়াআড়িভাবে সামনের বাহুকে ঘুরিয়ে শক্তি দিয়ে পানিকে টানতে হবে।

পায়ের অবস্থান (Leg Position)

* উভয় হাত সোজা রেখে পা দুটোকে পিছনের দিকে সম্পূর্ণভাবে প্রসারিত করতে হবে।

* পানির নিচে লাথি মারা সোজা হবে কিন্তু পা-কে শক্ত করে মারা যাবে না।

* পা-কে পিছনের দিকে উঠানোর সময় অবশ্যই সোজা থাকতে হবে।

শ্বাস-প্রশ্বাস (Breathing)

* পানিকে টানা শেষ হলে, পার্শ ফেরা (Side) অবস্থায় শ্বাস গ্রহণ করবে।

* মুখ দিয়ে সরাসরি শ্বাস গ্রহণ করবে।

* বাতাস বাহির (Exhale) করার কাজ নাক ও মুখ দিয়ে একই সাথে করবে।

* শ্বাস গ্রহণ ও বাহির করার কাজটি বিরতিহীভাবে (Constantly) করতে হবে।

খ) চিৎ সাঁতার (Back Stroke)

শরীরের অবস্থান (Body Position)

* চিৎ সাঁতারে নিতম্বের (Hip) উপর শরীরকে সোজা এবং প্রসারিত করে চিৎ অবস্থায় ৬ থেকে ৮ ইঞ্চি পানির নিচে রাখতে হবে।

* মাথাকে পানির ভিতর রাখতে হবে।

* দৃষ্টি পায়ের গোড়ালির দিকে ও থুতনিকে (Chin) ঠেলে রাখতে হবে।

* শরীরের সমান্তরালে যখন হাত চালনা করবে তখন মাথাকে স্থির রেখে ৪৫° কোনে শরীরকে ঘুরাতে হবে।

বাহু চালনা (Arm Stroke)

* শরীরের বিপরীত দিকে হাত চালনা করবে।

* হাত পানিতে প্রবেশ করবে ঘড়ির পয়েন্ট ১১.০০ এবং ১.০০ টার স্থান হতে।

* হাত ৮ থেকে ১২ ইঞ্চি পানির নিচে যাওয়ার সাতে সাথে শরীরকে ঘুরিয়ে আগাতে শুরু করবে।

* কনুই ৯০° কোনে বাঁকাতে হবে।

পায়ের অবস্থান এবং শ্বাস-প্রশ্বাস (Leg position and Breathing)

* ব্যাক স্ট্রোক সাঁতারে একবার (১) হাত চালানোর (একের পর এক) মধ্যে ছয় (৬) বার পা চালনা করবে।

* নিচে ও উপরে পা চালনা করতে হবে এবং চালানার মাঝে পা থাকবে সোজা এবং হাটু সামান্য ভাজ করা অবস্থায় থাকবে।

* শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজটি বিরতিহীনভাবে এবং যে হাত চালানোর সময় শ্বাস গ্রহণ করবে, ঠিক পরবর্তী শ্বাস গ্রহণ করবে সেই হাত পূর্বের অবস্থায় যখন ফিরে আসবে।

বুক সাঁতার (Breast Stroke)

* সাঁতারু পানির নিচে সোজা উপুর হয়ে থাকবে।

* নিতম্ব উঠা নামা করার সাথে শরীর সামান্য বাঁকিয়ে যাবে।

* মাথা স্থির রেখে, নিতম্বকে নিচের দিকে নামিয়ে উপর থেকে শ্বাস গ্রহণ করতে হবে।

* শ্বাস গ্রহণ করার পর বাহুকে পূর্বের অবস্থায় নিয়ে যাওয়ার জন্য হাতকে প্রসারিত করতে হবে।

বাহু চালনা (Arm Stroke)

* হাত সোজা অবস্থায় কনুই বাঁকিয়ে হাতের তালুকে কোনাকোনি রেখে পানিকে টানতে হবে।

* হাত ভিতরের দিকে কোনা-কোনিভাবে সামনের দিকে এগিয়ে মুখ উপরে তুলে শ্বাস গ্রহণ করতে হবে।

পা চালনা (Leg Stroke)

* শরীরকে সোজা রেখে পায়ের গোড়ালীকে উচু করে নিতম্বের দিকে টেনে ব্যাঙের মত পানিকে ধাক্কা দিতে হবে।

* পানিকে ধাক্কা দেয়ার সময় নিতম্ব এবং হাটু নমনীয় অবস্থায় থাকবে।

* যখন হাত দ্বারা পানি টানবে তখন বিপরীতে পা দ্বারা পানিকে লাথি মারা শেষ করতে হবে।

শ্বাস গ্রহণ (Breathing)

* মাথাকে পানি থেকে উপরে তোলার সময় মুখ পানির সমতার উপরে থাকা অবস্থায় শ্বাস গ্রহণ করবে।

* পানির নিচে মাথাকে ডুবানোর পর শ্বাস ছাড়তে হবে এবং হাতকে থুতনীর নিচ থেকে সামনের দিকে প্রসারিত করতে হবে।

প্রজাপতি সাঁতার (Butterfly Swimming)

শরীরের অবস্থান (Body Position)

* প্রজাপতি সাঁতারে শরীর পানির সমতায় সোজা থাকবে।

* দুই পা জোড়া করে একই সাথে এবং হাতকে প্রসারিত করতে হবে।

* মাথা এবং চোখকে পানির নিচের দিকে পুলের তলদেশে তাকাতে হবে।

বাহু চালনা (Arm Stroke)

* সাঁতারের শুরুতে মাথার উপরে হাতকে সোজা রাখতে হবে।

* হাতের কনুইকে বাঁকা এবং উঁচু করে নিচের দিকে এবং বাহির মুখী করে পানিকে চাপ দিতে হবে।

* বুকের দুই পাশ থেকে শরীরকে ঘুরিয়ে বুকের নিচে হাতকে নিয়ে আসতে হবে।

পায়ের অবস্থান (Leg Position)

* সাঁতারু সামনের দিকে অগ্রসর হওয়ার সময় কাঁধের উপর ভর করে ঢেউ খেলানোর ভঙ্গিতে পা'কে সামনের দিকে নিয়ে যেতে হবে।

* সাঁতারুর গোড়ালীকে পানির উপর তুলতে এবং নিতম্বকে পানির ভিতর ডুবাতে হবে, সে সময় হাটু বাঁকানো অবস্থায় থাকবে।

* পুনরায় নিতম্ব উঁচু করে পায়ের গোড়ালীকে নিচু করতে হবে। এভাবে পূর্বের অবস্থায় চলে যেতে হবে।

শ্বাস-প্রশ্বাস (Breathing)

* মাথাকে উপরে তোলা অবস্থায় শ্বাস গ্রহণ করতে হবে।

* পুনরায় মাথাকে পানির ভিতর নেয়ার সময় শ্বাস ছাড়তে হবে। এ সময় থুতনীকে বুকের সাথে লাগাতে হবে।

মাইনর গেমস (মজার খেলা)

শুধু ব্যায়াম শিশুমনে একঘেয়েমি ও নিরানন্দ ভাব নিয়ে আসে। খেলাধুলার আগ্রহ ও আনন্দ বাড়াবার জন্য মাঝে মাঝে মাইনর গেমস পাঠের মধ্যে থাকা উচিত। সরঞ্জামবিহীন বা ছোট ছোট সরঞ্জামসহ যে কোন পরিসরে, যে কোন সংখ্যক খেলোয়াড় নিয়ে, নিয়ম-কানুনের তেমন কোন কড়াকড়ি ছাড়া যে সমস্ত খেলাধুলার আয়োজন করা হয় তাকে মাইনর গেমস বলে। নানা ধরনের মাইনর গেমস আছে। কতগুলো একটু পরিশ্রমসাধ্য। এগুলো পাঠের শুরুতেই দেওয়া যায়। কম পরিশ্রমসাধ্য খেলাগুলো পাঠের শেষে দেওয়া হয়ে থাকে। শিশুরা আনন্দ, উৎসাহ ও প্রতিযোগিতার মধ্যে এগুলো খেলবে এবং সাথে সাথে শরীরকে পরবর্তী কাজের জন্য উপযুক্ত করে তুলবে।

১. নেতা খুঁজে বের করা

খেলার স্থান	:	খেলার মাঠ বা খোলা জায়গা/শ্রেণিকক্ষে
খেলোয়াড়ের সংখ্যা	:	১৫ থেকে ২০ জন
সরঞ্জাম	:	প্রয়োজন নাই

খেলা আরম্ভ

সকল খেলোয়াড় একটি বৃত্ত তৈরি করবে। শুধুমাত্র একজন খেলোয়াড় বৃত্তের বাইরে থাকবে। বৃত্তের মধ্যে যারা থাকবে তাদের মধ্য থেকে একজনকে নেতা বানানো হবে, নেতা যে কোন একটা কার্যকলাপ দিয়ে খেলা শুরু করবে। তারপর বৃত্তের বাইরের লোকটিকে বলা হবে নেতা খুঁজে বের করার জন্য। নেতা যে অঙ্গভঙ্গি করবে বৃত্তের অন্য খেলোয়াড়রাও তা-ই করবে। নেতা তার আচরণ পরিবর্তন করার সঙ্গে সঙ্গে বৃত্তের অন্য খেলোয়াড়রাও আচরণ পরিবর্তন করবে। নেতা খুঁজে বের করার জন্য তাকে অনেকক্ষণ সময় দিতে হবে। নেতা খুঁজে বের করতে পারলে সে নেতার জায়গায় যাবে এবং নেতা বৃত্তের বাইরে চলে যাবে। আবার শিক্ষক বাঁশি দিলে পুনরায় খেলা শুরু হবে। আর যদি নেতাকে খুঁজে বের করতে ব্যর্থ হয় তাহলে আনন্দপূর্ণ শাস্তি দিয়ে অন্য একজনকে নেতা খোঁজার জন্য দায়িত্ব দিয়ে খেলা আবার শুরু করবে। এভাবে খেলা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত চলতে থাকবে।

২. রুমাল চোর

খেলার জায়গা	: খেলার মাঠ বা খোলা জায়গা
খেলোয়াড়ের সংখ্যা	: ১৫ থেকে ২০ জন
সরঞ্জাম	: একটি রুমাল

খেলা আরম্ভ

সকল খেলোয়াড় বৃত্তাকারে বসবে। এদের মধ্য থেকে একজন রুমাল চোর হবে। সে বৃত্তের বাহির দিয়ে রুমাল নিয়ে দৌড়াবে। দৌড়াতে দৌড়াতে যে কোন খেলোয়াড়ের পিছনে রুমালটি ফেলে রাখবে। যার পিছনে রুমালটি ফেলে রেখেছে সে বুঝে উঠার আগে রুমাল চোর বৃত্ত ঘুরে এসে তার পিঠে আলতো করে থাবা বা ধাক্কা দিবে। এই সময় ধাক্কাকৃত খেলোয়াড়টি তার পিছনের রুমালটি নিয়ে বৃত্তের বাহির দিয়ে দৌড়াতে থাকবে। এবং অন্য একজনের পিছনে রুমালটি ফেলে রাখবে। এভাবে খেলাটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত চলতে থাকবে।

৩ । জাপানি নাচ

খেলার স্থান : খেলার মাঠ বা খোলা জায়গা

খেলোয়াড়ের সংখ্যা : ৪০ থেকে ৫০ জন

সরঞ্জাম : প্রয়োজন নাই

খেলা আরম্ভ

খেলোয়াড়দের কয়েকটি দলে সমান ভাগে ভাগ করতে হবে। প্রতিটি দলে একজন করে দলনেতা থাকবে। খেলা শুরু হওয়ার পর একটি করে দল সামনে আসবে এবং তাদের দলনেতার নাচের মাধ্যমে খেলা শুরু হবে। নেতা যেভাবে নাচবে, দলের বাকি খেলোয়াড়দেরকেও দলের নেতাকে অনুসরণ করে নাচতে হবে। এভাবে একটি দল শেষ হবার পর অন্য দল নাচবে। নেতার সাথে মিল করে যে দল ভাল নাচবে তারাই প্রথম হবে। এভাবে দ্বিতীয়, তৃতীয় স্থান নির্ধারণ করা হবে।

৪। গুপ্তধন লুকানো

খেলার স্থান : খেলার মাঠ বা খোলা জায়গা

খেলোয়াড়ের সংখ্যা : ২০ থেকে ২৫ জন

সরঞ্জাম : টেবিল টেনিস বল বা ছোট অন্য কোন বস্তু

খেলা আরম্ভ

খেলোয়াড়রা দুটি সমান দলে বিভক্ত হয়ে পাশাপাশি বসবে। ১৫ থেকে ২০ হাত দূরে একদল অন্য দলের মুখোমুখি বসবে, দুই দলের দুই জন দলনেতা থাকবে। নেতাদের কাছে গুপ্তধন থাকবে। প্রত্যেক নেতা তার নিজ দলের কাছে অর্থাৎ তার দলের একজনের কাছে তার গুপ্তধন লুকিয়ে রাখবে। গুপ্তধন লুকানোর সময় সে তার দলের প্রত্যেকের কাছে যাবে। এরপর অপর দলের যে কোন একজনকে বলতে হবে গুপ্তধন কার কাছে আছে। যদি সে সঠিক ভাবে বলতে পারে, তাহলে তার দল একটি পয়েন্ট পাবে। অনুরূপভাবে অন্য দলও তাদের দলের যে কোন একজনের কাছে গুপ্তধন লুকিয়ে রাখবে এবং অন্য দলকে বলতে হবে গুপ্তধন কার কাছে আছে। সঠিকভাবে বলতে পারলে তারাও এক পয়েন্ট পাবে। এভাবে কিছুক্ষণ খেলা চলতে থাকবে। খেলা শেষে যারা বেশি পয়েন্ট পাবে তারা জয়ী হবে।

৫। “লেগ টু লেগ ক্রিকেট”

খেলার সরঞ্জাম	: বল, ষ্ট্যাম্প
খেলোয়াড় সংখ্যা	: ১১ জন
খেলার স্থান	: মাঠ বা খোলা জায়গা
খেলার সময়	: অনির্দিষ্ট

নিয়মাবলি: টস এর পর একদল ব্যাটিং করবে অবশ্যই পা দিয়ে। বোলার বল করবে নির্দিস্ট জায়গা হতে পা দিয়ে। ১ ওভারে বল হবে ৩টা। এ খেলার ক্রিকেটের মত সব আইন প্রযোজ্য। বিচারকের নির্দেশ মতে নির্দিষ্ট ওভার ধরে খেলা চলবে। যে দল রান বা উইকেটের দিক থেকে বিপক্ষ দলের চাইতে এগিয়ে থাকবে সেই দল বিজয়ী হবে।

৬। “জাল ও মাছ”

খেলার সরঞ্জাম	: বাশিঁ ও চুন
খেলোয়াড় সংখ্যা	: অনির্দিষ্ট সংখ্যক
খেলার স্থান	: মাঠ বা খোলা জায়গা
খেলার সময়	: ২০ মিনিট

নিয়মাবলি: খেলোয়াড়ের সংখ্যানুযায়ী দল ভাগ করতে হবে। খেলোয়াড়ের সংখ্যা অনুযায়ী একটি আউটার সার্কেল তৈরি করতে হবে। টর্চের মাধ্যমে ঠিক করতে হবে কোনো দল নেট হবে এবং কোনো দল মাছ হবে। যে দল নেট হবে, তারা এক অপরের হাত ধরে নেট বানাবে। তবে তিনজনের অধিক মিলে নেট বানাতে পারবে না। মাছ দলের সবাই মুক্ত থাকবে। আরম্ভ সংকেতের সঙ্গে সঙ্গে নেট মাছদের তাড়া করে নেটে আটকাতে চেষ্টা করবে। মাছ দল নিজেদের নেট হতে মুক্ত রাখতে চেষ্টা করবে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নেট দল যতটি মাছকে আটকাতে পারবে তত পয়েন্ট পাবে। সকল মাছকে আটকাতে পারলে অতিরিক্ত তিন পয়েন্ট পাবে। নেট দলের সময় শেষ হলে নেট দল মাছ ও মাছ দল নেট হবে। এভাবে খেলা চলবে। (নেট দিয়ে মাছ আটকানোর সময় সতর্ক থাকতে হবে যেন কারো গায়ে আঘাত না লাগে)

৭। “ফুটবল ফুট টাচ”

খেলার সরঞ্জাম	: ১টি ফুটবল
খেলোয়াড় সংখ্যা	: অনির্দিষ্ট সংখ্যক
খেলার স্থান	: মাঠ বা খোলা জায়গা
খেলার সময়	: ২০ মিনিট

নিয়মাবলী : প্রথমে জোড় বিজোড় ২টি দল গঠন করতে হবে। এর পরে ১০-১৫ মিটার করে ১টি বৃত্ত অঙ্কন করতে হবে। একটি দল বৃত্তের ভেতরে এবং অপর দল বৃত্তের বাইরে চার পাশে অবস্থান নিবে। এরপর বৃত্তের বাইরের দল ১টি ফুটবল নিয়ে পা দিয়ে বৃত্তের ভেতরে অবস্থানরত খেলোয়াড়ের হাঁটুর নিচে পায়ে পারবে। যদি হাঁটুর নিচে বল লাগে সে খেলোয়াড় আউট বলে গণ্য হবে এবং সে খেলোয়াড় বৃত্তের বাইরে চলে যাবে। ১০ মিনিট পরে বৃত্তের বাইরের দল বৃত্তের ভেতরে এবং ভেতরের দল বৃত্তের বাইরে অবস্থান নিয়ে অনুরূপভাবে খেলা শুরু করবে। উভয় দলের জন্য একই নিয়ম প্রযোজ্য। যে দলের কম সংখ্যক খেলোয়াড় আউট হবে সেই দল বিজয়ী হবে।

৮। "মিনি ও বাড়ি যাও"

খেলার স্থান : খেলার মাঠ বা খোলা জায়গা

খেলোয়াড়ের সংখা : ২৫ থেকে ৩০ জন

সরঞ্জাম : প্রয়োজন নাই

খেলা আরম্ভ

একজন বাদে অন্য সকল শিক্ষার্থী বৃত্ত করে ভিতরে মুখ করে দাঁড়াবে। বাইরে থাকা খেলোয়াড় অন্যদের কাছে গিয়ে নানা রকমের কথা, শব্দ বা বিভিন্ন রকমের ভঙ্গিমা করে তাদের হাসাতে চেষ্টা করবে। অন্যরা কিছুতেই হাসবে না বরং তাকে বলে দিবে, "মিনি ও বাড়ি যাও"। যে মিনির কথা বা আচরণে হাসি সংবরণ করতে অসমর্থ হবে সে মিনি হয়ে যাবে এবং মিনি তার জায়গা দখল করবে। এভাবে খেলাটি চলবে।

৯। নানা তুমি কোথায়

খেলার জায়গা : খেলার মাঠ বা খোলা জায়গা

খেলোয়াড়ের সংখ্যা : ১৫ থেকে ২০ জন

খেলার সরঞ্জাম : রুমাল

খেলা আরম্ভ

খেলোয়াড়রা বৃত্ত আকারে দাঁড়াবে। এদের মধ্যে একজন নানা হবে আর একজন নাতি হবে। নানা এবং নাতি উভয়েই বৃত্তের মধ্যে থাকবে। নানার চোখ রুমাল দিয়ে বাঁধা থাকবে। নানা বলবে, নাতি তুমি কোথায়? নাতি বলবে, নানা আমি এখানে। তখন নানা নাতিকে ধরার জন্য ছুটাছুটি করবে। যদি ধরতে পারে তাহলে নাতি নানার ভূমিকা পালন

করবে এবং তার চোখ বেঁধে দেওয়া হবে। এভাবে পর্যায়ক্রমে সকল খেলোয়াড়কে নানা-নাতি তৈরি করে খেলাটি চলতে থাকবে।

১০। "রিং বাস্কেট

খেলার সরঞ্জাম : রিং এবং কাঠি

খেলোয়াড় সংখ্যা : ৯/১১ জন

খেলার স্থান : মাঠ বা খোলা জায়গা

খেলার সময় : অনির্দিষ্ট

নিয়মাবলি: ৪০ মিটার দৈর্ঘ্য এবং ২০ মিটার প্রস্থ একটি মাঠ হলে ভাল হয়। মাঠের দুই পার্শ্বে ২টি গোল রেখা থাকবে। প্রত্যেক দলের গোল কিপার একটি লম্বা কাঠি হাতে নিয়ে বিপরীত গোল বারে দাঁড়াবে। বিচারক বাঁশি দিলে রিং ছোড়া শুরু হবে এবং খেলোয়াড়রা পাসের মাধ্যমে ছুড়ে দেওয়া রিং গোল কিপার কাঠির ভেতর ঢুকাতে চেষ্টা করবে এবাবে নির্দিস্ট সময় ধরে খেলা চলবে। যে দল বেশি রিং কাঠির ভেতর ঢুকাতে পারবে সেই দল বিজয়ী হবে।

১১। "রশি টানা টানি"

খেলার সরঞ্জাম : একটি রশি

খেলোয়াড় সংখ্যা : প্রতি দলে ৭/৮ জন

খেলার স্থান : মাঠ বা খোলা জায়গা

খেলার সময় : অনির্দিষ্ট

নিয়মাবলী: ছাত্র-ছাত্রীদের সমান দু'দলে ভাগ করতে হবে। একটি শক্ত রশির দু'প্রান্ত ধরে তারা দাঁড়াবে। রশির মাঝখানে চিহ্ন দেয়া থাকবে। চিহ্নের ঠিক বরাবর মাটিতে ও একটি চিহ্ন দেয়া থাকবে। দু'টি চিহ্ন বরাবর করে বিচারক বাঁশি বাঁজালে উভয় দল রশি টানাটানি আরম্ভ করবে। যে দল রশির চিহ্ন নিজ সীমায় আনতে পারবে সে দল জয়ী হবে। তবে খেয়াল রাখতে হবে যেন রশিটি টানাটানিতে ছিড়ে না যায়।

তৃতীয় অধ্যায়

খেলাধুলার সংগঠন

খেলাধুলা পরিচালনা পদ্ধতি

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নানা ধরনের খেলাধুলার আয়োজন করা হয়। এই খেলাধুলা পরিচালনার জন্য বিভিন্ন ধরনের পরিচালনা পদ্ধতি রয়েছে। বর্তমানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গমাতা আন্ত: প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ছোট-বড়, দেশ-বিদেশে যত প্রকার খেলাধুলা বর্তমান বিশ্বে প্রচলিত রয়েছে তার পরিচালনার পদ্ধতি এক রকম নয়। বিভিন্ন প্রকার খেলাধুলা পরিচালনার জন্য বিভিন্ন রকম পদ্ধতি রয়েছে। সমস্ত খেলাধুলাকে প্রধানত চারটি পদ্ধতির মাধ্যমে পরিচালনা করা হয়। যা নিম্নে আলোচনা করা হল–

১) লিগ (League)

২) নক-আউট (Knock- out)

৩) যুক্ত (Combination) পদ্ধতি এবং

৪) মিট (Meet)

১। লিগ পদ্ধতি

প্রত্যেক খেলোয়াড় প্রত্যেক খেলোয়াড়ের সাথে বা প্রত্যেক দল প্রত্যেক দলের সাথে যে পদ্ধতিতে খেলার সুযোগ পায় তাকে লিগ পদ্ধতি বলে। লিগ পদ্ধতিতে সাধারণত ফুটবল, ক্রিকেট, ভলিবল, বাস্কেটবল ও হ্যান্ডবল ইত্যাদি খেলা হয়ে থাকে। লিগ পদ্ধতিতে কোন দল জয় পেলে ৩ পয়েন্ট পাবে এবং খেলায় সমতা হলে উভয় দল ১ পয়েন্ট করে পাবে। তবে পরাজিত হলে কোন পয়েন্ট পাবে না।

লীগ পদ্ধতিতে খেলার সুবিধা ও অসুবিধা:

সুবিধা-

- খেলোয়াড়গণ অনেক বার খেলার সুযোগ পায় বিধায় দক্ষতা বাড়ানোর সুযোগ পায়।
- একটি ভাল দল দুর্ভাগ্য বশত হেরে গেলেও পুনরায় খেলায় ফিরে আসার সুযোগ থাকে।
- খেলোয়াড় বাছাই করতে সুবিধা হয়।
- দুর্বল দল সবল দলের সাথে খেলার সুযোগ পায়।
- অনেক বার খেলার সুযোগ পায় বলে দলের কোনো জায়গায় দুর্বলতা থাকলে তা বের করে পূরণ করা সম্ভব হয়।
- দলীয় সমঝোতা বৃদ্ধি করে।

অসুবিধা-

- প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয় যা সাধারণত/শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে যোগানো সম্ভব নয় এবং ছোট ছোট দলগুলো ব্যয়ভার বহন করতে অসমর্থ হয়ে পড়ে।

- একই খেলা অনেকদিন একই মাঠে চললে অন্য খেলাগুলোর অসুবিধা হয় কারণ আমাদের দেশে মাঠের সমস্যা রয়েছে।
- দীর্ঘ দিন চলে বলে আবহাওয়া অনুকূল থাকে না কারণ ঝড় ও বৃষ্টির সময় এসে পড়ে।
- অনেক দিন ধরে চলে বলে প্রতিযোগিতার আকর্ষণ, খেলোয়াড় ও কর্মকর্তাদের ভেতর উৎসাহের অভাব পরিলক্ষিত হয়।

মোট খেলা বের করার সূত্রঃ

ক (ক−১) ÷২ = মোট খেলা। এখানে ঘঅর্থহল Number of Teams

বাংলায়-

ক(ক-১)÷২ = মোট খেলা

এখানে 'ক' হল প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণকারী দলের সংখ্যা।

মনে করি ৫টি দল, তাহলে সুত্রানুযায়ী-

৫(৫-১)÷২ = মোট খেলা

৫(৪)÷২ = মোট খেলা

৫×৪÷২ = মোট খেলা

২০÷২ = ১০টি খেলা

অর্থাৎ ৫টি দলের মোট খেলা হবে ১০টি।

১টি দলের মোট খেলা হবে (ঘ −১) অর্থাৎ ৫-১ = ৪টি খেলা।

উপরের সূত্র ছাড়াও নিম্নের নিয়মানুসারেও মোট খেলা বের করা যায়−

৫টি দল হলে ১+২+৩+৪=১০টি

অর্থাৎ দলের সংখ্যা পর পর সাজিয়ে লিখে সর্বশেষ সংখ্যাটি বাদ দিয়ে বাকিগুলো যোগ দিলে মোট খেলা পাওয়া যাবে।

সিড ও বাই

দলের সংখ্যাকে ২ এর শক্তিতে মিলানোর জন্য বাই দেয়া হয়। এবং বাই শুধু ১ম রাউন্ডেই বসে। সিড ১ম রাউন্ড হতে সেমিফাইনাল পর্যন্ত যে কোন রাউন্ড দেয়া যেতে পারে। ভাল বা বিদেশী দল বা পূর্বের চ্যাম্পিয়ন বা রানার আপ দলকে সাধারণত সিড দেয়া হয়। অনেক সময় দূরবর্তী দলকেও সিড দেওয়া হয়।

লিগ খেলার ফিকচার তৈরি

বিভিন্ন ধরনের পদ্ধতিতে লিগ খেলার ফিকচার তৈরি করা যায়। যে কোন একটি পদ্ধতি ব্যবহার করে একটি প্রতিযোগিতার ফিকচার তৈরি করতে হয়।

- ঘূর্ণন পদ্ধতি (Rotation Method)
- ছক পদ্ধতি (Graph Method)
- সিঁড়ি পদ্ধতি (Staircase Method)
- টেবুলার (Tabular Method)

(ক) ঘূর্ণন পদ্ধতি

এই পদ্ধতিতে ফিকচার তৈরি খুব সহজ। বিজোড় সংখ্যার দল হলে একটি বাই দিয়ে জোড় সংখ্যায় দলকে পরিণত করতে হবে। রাউন্ড করার সময় মনে রাখতে হবে। যতটি দল থাকবে রাউন্ড তার চেয়ে ১টি কম হবে। ডান দিকের উপরের সংখ্যাকে ফিক্সড (Fixed) রেখে ঘুরাতে হবে। মনে করি ৫টি দল এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করছে। এখন কিভাবে ফিকচার তৈরি হবে তা দেখানো হলো :

৫ - বাই	৪ - বাই	৩ - বাই	২ - বাই	১ - বাই
৪- ১	৩ - ৫	২ - ৪	১ - ৩	৫ - ২
৩- ২	২ - ১	১ - ৫	৫ - ৪	৪ - ৩

প্রথমে ৫টি দলকে ১টি ‘বাই’ দিয়ে দলের সংখ্যাকে ৬-এ উন্নীত করা হয়েছে। তারপর বাইকে Fixed রেখে বাকি দলগুলোকে ঘুরানো হয়েছে। এখানে বাই শুধু দলের জোড়া মিলানোর জন্য ব্যবহার করা হয়েছে।

ক) সিঁড়ি পদ্ধতি

এই পদ্ধতিতে ফিকচার তৈরি খুব সহজ। এখানে বিজোড় সংখ্যার দলের জন্য কোন বাই প্রয়োজন হয় না। নিম্নে ৫টি দলের একটি ফিকচার তৈরি করে দেখানো হলো–

১ বনাম ২			
১ বনাম ৩	২ বনাম ৩		
১ বনাম ৪	২ বনাম ৪	৩ বনাম ৪	
১ বনাম ৫	২ বনাম ৫	৩ বনাম ৫	৪ বনাম ৫

এই ছকটি সিঁড়ির মত দেখতে বলে একে সিঁড়ি বা সোপান পদ্ধতি নাম দেওয়া হয়েছে। এবার এখান থেকে ২টি দল নিয়ে সময়, তারিখ ও স্থান উল্লেখ করে ফিকচার তৈরি করতে হবে। মনে রাখতে হবে, সব দল যেন সমান বিরতি পায়।

লীগ খেলায়→ সিঁড়ি পদ্ধতিতে

৫টি দলের লীগ খেলার ফিকচার।

ক্রমিক নং	তারিখ	খেলা দল বনাম দল	সময়	খেলার স্থান
১	০১/০৩/২০১৭	১ বনাম ২	৪.০০	স্কুল মাঠ/ স্টেডিয়াম
২	০২/০৩/২০১৭	৩ বনাম ৪	৪.০০	স্কুল মাঠ/ স্টেডিয়াম
৩	০৩/০৩/২০১৭	১ বনাম ৫	৪.০০	স্কুল মাঠ/ স্টেডিয়াম
৪	০৪/০৩/২০১৭	২ বনাম ৩	৪.০০	স্কুল মাঠ/ স্টেডিয়াম
৫	০৫/০৩/২০১৭	১ বনাম ৪	৪.০০	স্কুল মাঠ/ স্টেডিয়াম
৬	০৬/০৩/২০১৭	৩ বনাম ৫	৪.০০	স্কুল মাঠ/ স্টেডিয়াম
৭	০৭/০৩/২০১৭	২ বনাম ৪	৪.০০	স্কুল মাঠ/ স্টেডিয়াম
৮	০৮/০৩/২০১৭	১ বনাম ৩	৪.০০	স্কুল মাঠ/ স্টেডিয়াম

৯	০৯/০৩/২০১৭	২ বনাম ৫	৪.০০	স্কুল মাঠ/ স্টেডিয়াম
১০	১১/০৩/২০১৭	৪ বনাম ৫	৪.০০	স্কুল মাঠ/ স্টেডিয়াম

২। নক-আউট (Knock out) পদ্ধতি

যে পদ্ধতিতে কোন দল বা কোন খেলোয়াড় একবার পরাজিত হলে প্রতিযোগিতায় আর অংশগ্রহণ করতে পারে না তাকে নক-আউট পদ্ধতি বলে। অর্থাৎ Survival of Fittest, যে উপযুক্ত সে টিকে থাকবে। প্রতিযোগিতায় দল বেশি হলে সাধারণত এই পদ্ধতিতে খেলা হয়। এই পদ্ধতিতে খেলার সময় কম লাগে। কারণ কোন দল বা খেলোয়াড় একবার পরাজিত হলে প্রতিযোগিতা থেকে বাদ পড়ে যায়।

এই পদ্ধতিতে ফিকচার তৈরি করতে নিম্নলিখিত নিয়মগুলো অনুসরণ করতে হয়–

- অংশগ্রহণকারী খেলোয়াড় বা দলের নাম দাখিল করার ধারাবাহিকতা অনুযায়ী।
- লটারির সাহায্যে। 'বাই' না থাকলে দুটি করে দল টেনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ঠিক করা। 'বাই' প্রয়োজন হলে 'বাই'গুলো যথাস্থানে বসিয়ে নিয়ে না দেখে একটি করে দল টেনে ধারাবাহিকভাবে ফিকচারে বসিয়ে দেওয়া।
- পূর্বের জানা দক্ষতা অনুযায়ী ভাল দল বা খেলোয়াড়দের অর্ধেক ফিকচারের উপরের অংশে এবং বাকি অর্ধেক নিচের অংশে দেওয়া।

নক-আউট পদ্ধতিতে সাধারণত তিন ধরনের প্রতিযোগিতা হয়ে থাকে।

ক) একক-বহিষ্করণ
খ) দ্বৈত-বহিষ্করণ
গ) সান্ত্বনা পদ্ধতি।

ক) একক (Straight) বহিস্করণ পদ্ধতি

এ পদ্ধতির সাহায্যে Fixture তৈরি করতে সাধারণত নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ রাখতে হয়–

(ক) কতটি দল প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করছে তার সংখ্যা জানা।

(খ) অংশগ্রহণকারী দলের সংখ্যাকে ২-এর শক্তিতে (Power) আনতে হবে। যেমন- $2\times2= 4$, $2\times2\times2= 8$, $2\times2\times2\times2= 16$, $2\times2\times2\times2\times2= 32$ প্রভৃতি।

(গ) মোট দলকে দুই ভাগে ভাগ করতে হবে।

(ঘ) যদি বিজোড় সংখ্যক দল হয় তাহলে কম সংখ্যক দল নিচের দিকে রাখতে হবে।

(ঙ) 'বাই' প্রয়োজন হলে প্রথম 'বাই' নিচের অংশে বসবে ও পরেরটা উপরের অংশে বসবে। এভাবে নিচে-উপরে 'বাই' বসাতে হবে।

(চ) বন্ধনী দিতে হবে।

(ছ) যদি ‘বাই’ বেশি দিতে হয় তাহলে দলগুলোকে চার ভাগে ভাগ করে ‘বাই’ বসাতে হবে।

(জ) Fixture–এ তারিখ, সময়, স্থান ও কোন মাঠে খেলা হবে তা উল্লেখ করতে হবে।

নিম্নে ১২টি দলের একটি ফিকচার তৈরি করে দেখানো হলো–

এখানে দেখা যাচ্ছে ক ও ট উভয় গ্রুপ থেকে বিজয়ী হয়ে ফাইনালে উন্নীত হয়েছে। ফাইনালে ক, ট কে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। নিম্নের সূত্র অনুযায়ী মোট খেলার সংখ্যা বের করা যায়ঃ

ঘ–১ = মোট খেলা, এখানে ঘ অর্থ Number of Team
বাংলায়ঃ ক-১ = মোট খেলা

এখানে ক হলো অংশগ্রহণকারী দলের সংখ্যা অর্থাৎ অংশগ্রহণকারী দলের সংখ্যা যত, মোট খেলা হবে তার চেয়ে ১টি কম। যেমন–১২টি দল অংশগ্রহণ করলে খেলা হবে ১২-১= ১১টি

নকআউট (একক বহিঃস্বরণ) পদ্ধতিতে ১২টি দলের Fixture (প্রথম)

	গ্রুপ	ক্রমিক নং	তারিখ	খেলা দল বনাম দল	সময়	খেলার স্থান
প্রথম পর্ব	এ	০১	০১/০৪/২০১৭	খ বনাম গ	৪.০০	স্কুল মাঠ/ স্টেডিয়াম
	বি	০২	০২/০৪/২০১৭	ঙ বনাম চ	৪.০০	স্কুল মাঠ/ স্টেডিয়াম
	সি	০৩	০৩/০৪/২০১৭	ছ বনাম জ	৪.০০	স্কুল মাঠ/ স্টেডিয়াম
	ডি	০৪	০৪/০৪/২০১৭	ঞ বনাম ট	৪.০০	স্কুল মাঠ/ স্টেডিয়াম
কোয়ার্টার ফাইনাল	এ	০৫	০৫/০৪/২০১৭	খ ও গ এর জয়ী দল বনাম ক	৪.০০	স্কুল মাঠ/ স্টেডিয়াম
	বি	০৬	০৬/০৪/২০১৭	ঙ, চ এর জয়ী বনাম ঘ	৪.০০	স্কুল মাঠ/ স্টেডিয়াম
	সি	০৭	০৭/০৪/২০১৭	ছ , জ এর জয়ী বনাম ঝ	৪.০০	স্কুল মাঠ/ স্টেডিয়াম
	ডি	০৮	০৮/০৪/২০১৭	ঞ, ট এর জয়ী বনাম ঠ	৪.০০	স্কুল মাঠ/ স্টেডিয়াম
সেমি ফাইনাল		০৯	১০/০৪/২০১৭	এ গ্রুপ জীয় বনাম বি গ্রুপ জয়ী	৪.০০	স্কুল মাঠ/ স্টেডিয়াম
		১০	১১/০৪/২০১৭	সি গ্রুপ জয়ী বনাম ডি গ্রুপ জয়ী	৪.০০	স্কুল মাঠ/ স্টেডিয়াম
ফাইনাল		১১		গ্রুপ এ, বি জয়ী দল বনাম গ্রুপ সি, ডি জয়ী দল	৪.০০	স্কুল মাঠ/ স্টেডিয়াম

নকআউট (একক বহিঃস্করণ) পদ্ধতিতে ১২টি দলের **Fixture** (দ্বিতীয়)

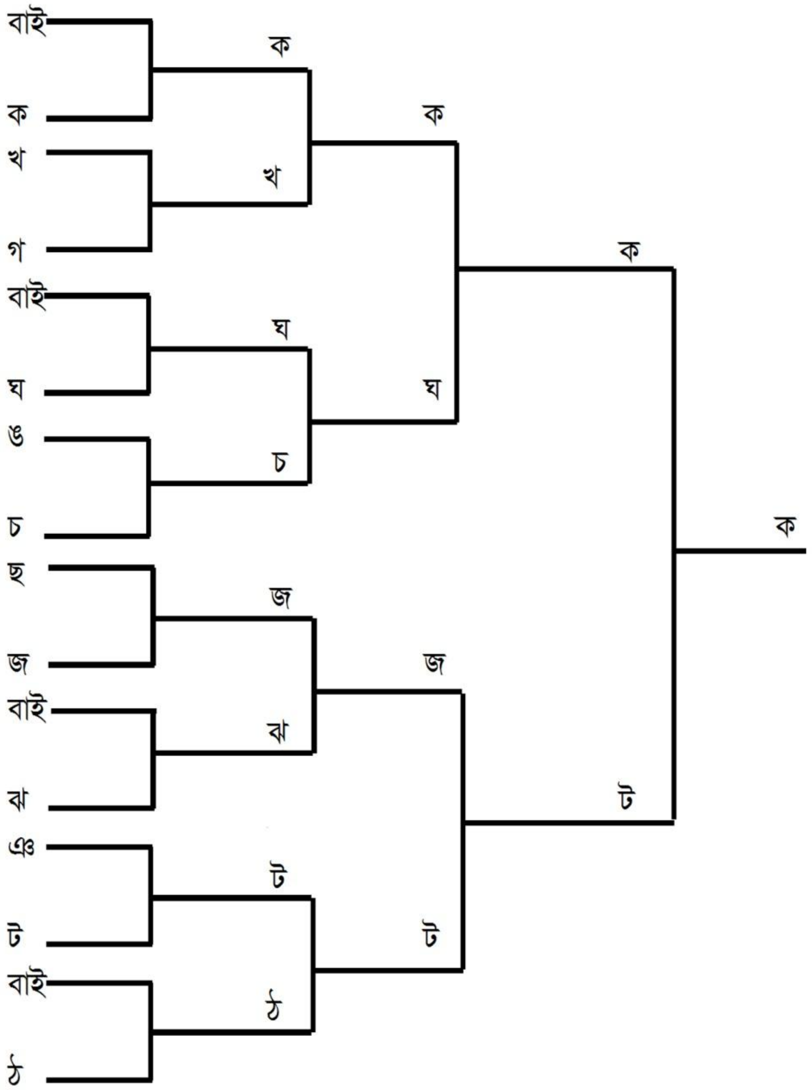

খ) দ্বৈত বহিস্করণ পদ্ধতি

একটি দল যখন দুইবার পরাজিত হয় তখন সে প্রতিযোগিতা হতে বাদ পড়ে যায় সেজন্য একে দ্বৈত বহি:স্করণ পদ্ধতি বলা হয়।

গ) সান্ত্বনা পদ্ধতি

এ পদ্ধতিতে খেলা হলে কোন দল পরাজিত হলেও প্রতিযোগিতা থেকে বাদ যাবে না। পুনরায় পরাজিত দলগুলো নিয়ে পৃথকভাবে প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়।

৩। যুক্ত পদ্ধতি

এই পদ্ধতি আলাদা কোন পদ্ধতি নয়। এটি নক-আউট ও লিগ খেলার মিলিত পদ্ধতি। লিগের সাথে নক-আউট, লিগের সাথে লিগ, নক-আউটের সাথে নক-আউট ও নক-আউটের সাথে লিগ মিলিত হয়ে যখন কোন প্রতিযোগিতা হয় তখন এই পদ্ধতিকে যুক্ত পদ্ধতি বলে। এই পদ্ধতির মাধ্যমে ফুটবল, ক্রিকেট, ভলিবল, ব্যাডমিন্টন ইত্যাদি

খেলা হয়ে থাকে।

৪। মিট পদ্ধতি

অনেকগুলো ইভেন্ট সম্বলিত খেলা যা, দুই-তিন দিন ধরে চলে বা অল্প সময়ের ভিতর অনেকগুলো ইভেন্টের চূড়ান্ত ফলাফল পাওয়া যায় তাকে মিট পদ্ধতি বলে। মিটের অন্তর্ভুক্ত খেলাগুলো হলঃ অ্যাথলেটিকস, সাঁতার, মুষ্টিযুদ্ধ, জিমন্যাস্টিকস্, কুস্তি ইত্যাদি।

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সাধারণত বিভিন্ন রকম প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে, তার মধ্যে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অন্যতম। জাঁকজমকপূর্ণভাবে এই প্রতিযোগিতা হয়ে থাকে। বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা পরিচালনার জন্য বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, সহকারী শিক্ষক (প্রয়োজনে একাধিক), খেলাধুলা পছন্দ করে এমন এসএমসির সদস্য এবং স্থানীয় গন্যমান্য ব্যক্তিদের সমন্বয়ে ৫ বা ৭ সদস্য বিশিষ্ট একটি নির্বাহী কমিটি গঠন করতে হয়। এ কমিটি বাজেট তৈরি, সময় নির্ধারণ এবং প্রধান অতিথি নির্বাচন–এই ধরনের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলো নিয়ে থাকে। যেহেতু বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা কয়েক দিনের চেষ্টার এবং বহুমুখী কাজের সমন্বয়ের ব্যাপার, তাই এর যাবতীয় কাজ সময়মত, সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনার উদ্দেশ্যে কাজগুলোকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা হয়। যেমন–

- প্রতিযোগিতার পূর্বের কাজ
- প্রতিযেগিতা চলাকালীন কাজ এবং
- প্রতিযোগিতার শেষের কাজ।

প্রতিযোগিতা পূর্বের কাজ

খেলাধুলা শুরু হওয়ার পূর্বে যে কাজগুলো করতে হয় তাকে প্রতিযোগিতর পূর্বের কাজ বলে। সাব-কমিটি গঠন: দ্রুত ক্রীড়া অনুষ্ঠানের কাজ সুসম্পন্ন করার জন্য বেশ কয়েকটি সাব-কমিটি গঠন করতে হয়। যেমন–

ক) অর্থ কমিটি

খ) দাওয়াত ও প্রচার কমিটি

গ) অভ্যর্থনা কমিটি

ঘ) মাঠ প্রস্তুত কমিটি

ঙ) প্যান্ডেল ও আসণ ব্যবস্থাপনা কমিটি

চ) পুরস্কার ক্রয় কমিটি

ছ) ক্রীড়া সরঞ্জাম কমিটি

জ) ক্রীড়া পরিচালনা কমিটি

ঝ) আপ্যায়ন কমিটি

ঞ) প্রাথমিক চিকিৎসা কমিটি

ট) শৃঙ্খলা রক্ষা কমিটি

ঠ) আপিল কমিটি।

ক্রীড়া প্রতিযোগিতা শুরু হওয়ার ৪ বা ৫ দিন পূর্বেই সাব-কমিটিকে তাঁদের দায়িত্ব বুঝিয়ে দিতে হবে। প্রতিযোগিতার গুরুত্ব অনুসারে সাব-কমিটির সংখ্যা বাড়ানো বা কমানো যেতে পারে।

প্রতিযোগিতা চলাকালীন কাজ

যে সমস্ত কাজ প্রতিযোগিতার সময় করতে হয় সেগুলোকে প্রতিযোগিতা চলাকালীন কাজ বলে। যেমন-শিডিউল অনুযায়ী ক্রীড়া প্রতিযোগিতা শুরু করা, মাঠের শৃঙ্খলা রক্ষা করা, বিচারকদের নাম ঘোষণা করা এবং তাঁদের হাতে স্কোর সিট পাঠানো, ইভেন্ট অনুযায়ী বিজয়ীদের নাম ঘোষণা করা, ফলাফল রের্কড শিটে সংরক্ষণ করা ইত্যাদি।

প্রতিযোগিতা শেষের কাজ

বিজয়ীদের পুরস্কার দেওয়া, ক্রীড়া সরঞ্জাম সংরক্ষণ করা, অতিথিদের আপ্যায়ন করানো, প্রতিযোগিতায় যারা সহযোগিতা করছে তাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা, সর্বশেষে খরচের যথাযথ হিসাব কমিটি কর্তৃক পাস করিয়ে ফাইলে সংরক্ষণ করে রাখা।

প্রতিযোগিতা উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

- অতিথিদের অভ্যর্থনা জ্ঞাপন (পুষ্পস্তবক অর্পণ ও ব্যাজ পরিধান)
- পবিত্র ধর্ম গ্রন্থ থেকে পাঠ
- জাতীয় সংগীত পরিবেশনের সাথে জাতীয় পতাকা ও ক্রীড়া পতাকা উত্তোলন
- জাতীয় পতাকার প্রতি সম্মান প্রদর্শন
- প্রতিযোগিদের 'মার্চ পাস্ট; ও অভিবাদন প্রদান
- প্রধান অতিথি কর্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন ঘোষণা।

অতিথিগণের সাথে– ক) বেলুন উড়ানো খ) পায়রা উড়ানো

- মশাল প্রজ্জলন ও মাঠ প্রদক্ষিণ
- ক্রীড়া শপথ গ্রহণ।

শপথ-

"আমি শপথ করিতেছি যে জাতীয় পর্যায়ে আন্তঃ প্রাথমিক বিদ্যালয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতার সকল বিধিবিধান মানিয়া চলিব এবং প্রকৃত খেলোয়াড়সুলভ মনোভাবের পরিচয় দিয়া নিজ নিজ বিদ্যালয় ও খেলাধুলার গৌরব অক্ষুণ্ন রাখিব"- আমিন।

- অতিথিদের আসন গ্রহণ;
- প্রতিযোগীদের মাঠ ত্যাগ।

প্রাত্যহিক সমাবেশ

প্রাত্যহিক সমাবেশ সব ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আবশ্যকীয় কর্মসূচীর অন্তর্ভূক্ত বলে অবশ্যই পরিগণিত হবে। প্রাথমিক সমাবেশে সকলের উপস্থিতি ও অংশগ্রহণ আইনের দ্বারা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। প্রতিদিন শ্রেণি কার্যক্রম শুরু হওয়ার পূর্বে নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট স্থানে সকল শিক্ষক শিক্ষার্থীর সম্মিলিত যে কর্মসূচী শৃঙ্খলার সাথে ধারাবাহিকভাবে পালন করা হয় তাকে প্রাত্যহিক সমাবেশ বলে। সাধারণত শুষ্ক মৌসুমে বিদ্যালয়ে উন্মুক্ত প্রাঙ্গনে এবং বর্ষামৌসুম, গ্রীষ্মের প্রখরতাপ ও প্রতিকূল আবহাওয়ায় বিদ্যালয়ে মিলনায়তন, বারান্দা কিংবা শ্রেনীকক্ষেও প্রাত্যহিক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হতে পারে। বিদ্যালয়ের শারীরিক শিক্ষার শিক্ষক/দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষকসহ সকল শিক্ষকগণ পর্যায়ক্রমে সমাবেশ পরিচালনা করবেন। প্রাত্যহিক সমাবেশের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের নানাবিধ গুনাবলী অর্জিত হয়ে থাকে। এর মধ্যে শিশুর একতা, শৃংঙ্খলা, দায়িত্ববোধ, নেতৃত্বদান, ধর্মীয় অনুভূতি ও সম্প্রীতি, নৈতিকতা, আধ্যাত্মিকতা, দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধ জাগ্রত হয়।

সমাবেশে দাঁড়ানো

সমাবেশের ধারাবাহিক কার্যক্রম

০১) জাতীয় পতাকা উত্তোলন: প্রথমে প্রতিষ্ঠানের প্রধান জাতীয় পতাকা উত্তোলন করবেন। পতাকা উত্তোলনের সময় সকলে সাবধান হয়ে থাকবে।

০২) জাতীয় পতাকাকে সম্মান প্রদর্শন: প্রতিষ্ঠান প্রধান জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে এক পদক্ষেপ পেছনে এসে পতাকাকে অভিবাদন করবেন। সাথে সাথে অন্য সকলে সাবধান অবস্থায় হাত তুলে পতাকাকে অভিবাদন করবে।

০৩) পবিত্র ধর্মগ্রন্থ থেকে পাঠ: পবিত্র কোরআন থেকে পাঠ (অন্যান্য ধর্মের শিক্ষার্থী থাকলে তাঁদের ধর্মগ্রন্থ থেকেও পাঠ করা যেতে পারে) একজন পাঠ করবে, অন্য সকলে শুনবে। তেলাওয়াতের সময় সকলে আরামে ধর্মীয় রীতি অনুযায়ী দাঁড়াবে।

০৪)শপথ গ্রহণ: একজন শপথ বাক্য পাঠ করবে। বাকী সকলে তার সঙ্গে বলবে। শপথের সময় সাবধান হয়ে ডান হাত সম্মুখে কাঁধ বরাবর তুলে দাঁড়াবে।

০৫) জাতীয় সংগীত: সকলে সমস্বরে জাতীয় সংগীত গাইবে। এ সময় সকলে 'সাবধান' অবস্থায় থাকবে।

০৬) প্রতিষ্ঠান প্রধানের বক্তব্য: প্রতিষ্ঠান প্রধানের ভাষণ (প্রয়োজনবোধে)।

০৭) পি.টি. অনুশীলন: শারীরিক শিক্ষার শিক্ষক/দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ৫ মিনিটের জন্য শরীরচর্চা (পি.টি) অনুশীলন করাবেন। এখানে উল্লেখ্য যে এমন ধরনের ব্যায়াম করানো যাবে না যাতে শিক্ষার্থীদের হাতে বা জামা কাপড়ে মাটি লাগার সম্ভাবনা থাকে।

০৮) সমাবেশ শেষে: শিক্ষার্থীরা শৃঙ্খলার সাথে ফাইলবদ্ধ অবস্থায় নিজ নিজ শ্রেণিকক্ষে ফিরে যাবে।

প্রাত্যহিক সমাবেশ সম্পর্কীত নির্দেশনা:

- লাইন: পাশাপাশি দাঁড়ানো অর্থাৎ একজনের বামপাশে একজন তার বামপাশে আর একজন এভাবে পর্যায়ক্রমে দাড়াঁনোকে লাইন বলে।
- ফাইল: পিছে-পিছে দাড়ানো অর্থাৎ একজনের পিছে একজন এভাবে পর্যায়ক্রমে দাড়ানোকে ফাইল বলে।
- পরিচালনাকারীর আদেশ: অভিবাদনের সময়- ১ বললে হাত পাশ দিয়ে প্রশস্তভাবে উঠবে, ২ বললে হাত সামনে দিয়ে সংকুচিতভাবে নামবে। ১ ও ২ এর মাঝে ৩ সেকেন্ডের বেশি বিরতি থাকবে না।
- শপথের সময় সকলে হাত মুষ্টি বদ্ধ বা খোলা (যে কোন ১টি) অবস্থায় রাখতে হবে। সাধু এবং চলিত এর যে কোন ১টি রীতিতে শপথ বাক্য পাঠ করবে। আমিন বললে হাত নামবে।

(ক্রো – “ক

শপ : আমি শপথ করিতেছি যে, মানুষের সেবায় নিজেকে নি
একতা ও সংহতি বজায় রাখিবার জন্য সচেষ্ট থাকিব। হে
করিতে পারি, বাংলাদেশ ।বে গড়িয়া তুলিতে

সূত্র : বাঃ স – ৭৬/ –৩০৭৫ –১০ হাজার তা

(শপথ সাধু অথবা চলিত যে কোন একটি ভাষায় পাঠ ব

চতুর্থ অধ্যায়

ব্যায়াম ও প্রাথমিক প্রতিবিধান

মুক্তহস্ত ব্যায়াম

ব্যায়াম মানুষের মন, শরীরকে মজবুত ও নীরোগ রাখে। সরঞ্জামবিহীন বা ছোট ছোট সরঞ্জামের সাহায্যে প্রায় একই স্থানে থেকে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের যে ব্যায়াম করা হয় তাকে মুক্তহস্ত ব্যায়াম বলে। শরীরের বিশেষ বিশেষ প্রধান অঙ্গ, যেমন–হাত, পা, পিঠ, ধড়, তলপেট ইত্যাদিকে কর্মক্ষম ও উপযুক্ত রাখার জন্য এই ব্যায়াম চর্চা করা হয়ে থাকে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশুরা এই ব্যায়াম পূর্ণ অনুশীলন করলে তাদের শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো যথাযথ বৃদ্ধি পাবে এবং শরীর ও মন সুস্থ থাকবে।

পায়ের ব্যায়াম

- পা কিছুটা ফাঁক করে কোমরে দুই হাত দিয়ে দাঁড়ান। এবার পা দুটো সামনে-পিছনে নিয়ে লাফ দিন। এভাবে বেশ কয়েকবার বাঁশির সাহায্যে তালে তালে ব্যায়ামটি করুন।
- কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়ান। দুই পা পাশে ফাঁক করে পরে একত্র করে লাফান। বাঁশির সাহায্যে বা সংখ্যা দিয়ে তালে তালে ব্যায়ামটি করুন ।
- সোজা হয়ে দাঁড়ান। এর পর বাম পা ভাজ করে দু হাত দিয়ে হাটুর নিচে ধরে বুকে লাগানোর চেষ্টা করেন। পরে ডান পাঁ, এভাবে ব্যামটি প্রত্যেক পাঁ তিন-চার বার করেন।
- সোজা হয়ে দাঁড়ান। এবার বাম-ডান করে পা উঠা-নামা করান। এভাবে বাঁশির সাহায্যে তালে তালে ব্যায়ামটি করুন।
- সোজা হয়ে দাড়ান। এবার হাতদুটি সামনে প্রসারিত করে চেয়ারে বসার মত করে বসেন, পরে ওঠেন। বাঁশির সাহায্যে তালে তালে ব্যায়ামটি আট-দশ বার করা যেতে পারে।

বাহু ও কাঁধের ব্যায়াম

- পা কিছুটা ফাঁক করে দুই হাতের কনুই ভাঁজ করে হাতের আঙ্গুলগুলো কাঁধের উপরে রাখুন। এবার ডান হাত কাঁধ বরাবর সোজা করুন, আবার ভাঁজ করে কাঁধে আঙ্গুল রাখুন। এভাবে ডান হাতের পর বাম হাতের ব্যায়ামটি করুন।
- পা কিছুটা ফাঁক করে দাঁড়ান। এবার ডান হাত মাথার উপরে নিন, পরে বাম হাত মাথার উপরে নিয়ে তালি দিন এবং ডান হাত নিচে নিয়ে আসুন। এই ব্যায়ামটি বাঁশির সাহায্যে তালে তালে করা যেতে পারে।
- পা কিছুটা ফাঁক করে দাঁড়ান। এবার দুই হাত একত্রে মাথার উপরে নিয়ে তালি দিন এবং নামিয়ে আনুন। এই ব্যায়ামটি বাঁশির সাহায্যে তালে তালে কয়েকবারে করা যায়।

- পা কিছুটা ফাঁক করে সোজা হয়ে দাড়ান। এর পর দুহাত দু পাশে প্রস্তারিত করেন, পরে মাথার উপর তালি দিন, পরে আবার দু পাশে প্রসারিত করেন, এরপর দুই থাই এর পাশে হাত নামান। এভাবে বাঁশির সাহায্যো তালে তালে ব্যায়ামটি করা যেতে পারে।
- পা কিছুটা ফাঁক করে দাঁড়ান। এরপর দু হাত একসঙ্গে সামনের দিক নিয়ে ঘোরান, পরে দুহাত একসঙ্গে উল্টা/পিছন দিয়ে ঘোরান। ব্যায়ামটি বাঁশির সাহায্যে পর্যায়ক্রমে সামনে-পিছনে এভাবে করা যেতে পারে।

মাথা ও ঘাড়ের ব্যায়াম

- হাত কোমরে রেখে পা ফাঁক করে দাঁড়ান। ঘাড় ও মাথাসহ শরীরের উপরের অংশ তালে তালে বামে ও ডানে ঘুরান। এভাবে ব্যায়ামটি কয়েকবার করা যেতে পারে।
- সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বামে ও ডানে ঘাড় ঘুরিয়ে ঘাড়ের পিছনের অংশ দেখার চেষ্টা করুন।
- দুই পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে দুই হাত বুকের কাছে নিয়ে এবার হাতের কনুই সোজা রেখে বাম হাত যতদূর সম্ভব পিছনে নিন। একই সাথে ঘাড় ডান দিকে ঘুরিয়ে ঘাড়ের পিছনের দিক দেখতে চেষ্টা করুন।
- পা কিছুটা ফাঁক করে সোজা হয়ে দাড়ান, এরপর ডান হাতের তালু মাথার উপর দিয়ে নিয়ে বাম পাশে রেখে ডান দিকে আস্তে আস্তে চাপদিন, একই ভাবে বাম হাত দিয়ে করেন, এরপর দুহাত শিকল করে মাথার পিছে রাখেন এবং মাথা আস্তে আস্তে পিছন দিকে চাপ দিন। এরপরে হাত শিকল করে কপালে রাখেন এবং মাথা সামনের দিকে আস্তে আস্তে চাপ দিন। এভাবে বাঁশির সাহায্যো তালে তালে ব্যায়ামটি করা যেতে পারে।

কোমরের ব্যায়াম

- দু'পা সামান্য ফাককরে দুহাত কোমরে দিয়ে দাঁড়ান। এরপর যতটা সম্ভব শরীরের উপরের অংশকে বামে নিন, পরে একইভাবে ডানদিকে। বাঁশির সাহায্যে পর্যায়ক্রমে ব্যায়ামটি আট-দশ বার করা যায়।
- সোজা হয়ে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়ান। এরপর দুহাতের আঙ্গুল দিয়ে দুপায়ের আঙ্গুল স্পর্শ করার চেষ্টা করেন। পরে দুহাত কোমরে নিয়ে আসেন। এভাবে বাঁশির সাহায্যে পর্যায়ক্রমে ব্যায়ামটি করা যেতে পারে। তবে ব্যায়ামটি করার সময় হাটু ভাঙ্গবে না।
- গ. দুই পা যথাসম্ভব ফাঁক করে কোমরে হাতদিয়ে দাঁড়ান। এরপর দুহাত দিয়ে দু'পায়ের গোড়ালি ধরে মাথা যথাসম্ভব ভেতরে নেন। পরে দু হাত হিপের উপর রেখে শরীরের উপরের অংশ বাঁকিয়ে যথাসম্ভব দূরে দেখার চেষ্টা করেন। ব্যায়ামটি বাঁশির সাহায্যে পর্যায়ক্রমে আট-দশ বার করা যেতে পারে।

সমন্বয়মূলক ব্যায়াম (Co-ordination Exercise)

- সোজা হয়ে দাঁড়ান। দুই পা ফাঁক করে এবং দুই হাত কাঁধ বরাবর তুলে বাঁশির সাহায্যে তালে তালে লাফাতে থাকুন।

- সোজা হয়ে দাঁড়ান। দুই পা ফাঁক করে এবং দুই হাত মাথার উপরে তুলে তালি দিয়ে তালে তালে লাফাতে থাকুন। এটি বাঁশির সাহায্যে করা যায়।
- সোজা হয়ে দাড়ান। এরপর দুহাত দিয়ে বাম পায়ের নিচে ও মাথার উপর তালি, পরে দুহাত দিয়ে ডান পায়ের নিচে ও মাথার উপর তালি। এভাবে বাঁশির সাহায্যে তালে তালে ব্যায়ামটি করা যেতে পারে।
- সোজা হয়ে দাড়ান। এরপর এক লাফে পায়ের পাতা/টো এর উপর বসে দু'হাত থাই এর উপর রাখেন, পরে দু হাত দুই উরুর উপর দুবার শব্দকরে তিন বার সামনে তালি দেন। বাঁশির সাহায্যে তালে তালে এ ব্যায়ামটি করা যেতে পারে।

ভারসাম্য রক্ষা ব্যায়াম

সরঞ্জাম ছাড়া অথবা ছোট ছোট সরঞ্জাম দিয়ে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাহায্যে শরীরের ভারসাম্য রক্ষা করে

যে ব্যায়াম করা হয় তাকে ভারসাম্য রক্ষা ব্যায়াম বলে।

স্কিপিং রোপ (দড়ির লাফ)

দড়ির সাহায্যে ছোট লাফ দেওয়া শরীর গঠনে উপকারী এবং আনন্দদায়ক।

এক পায়ে লাফানো: দুহাতে দড়ির দুপ্রান্ত ধরে দড়ি ঘুরানোর সাথে সাথে এক পায়ে লাফাতে হবে। মাঝে মাঝে পা বদল করে নিতে হবে।

জোড়া পায়ে লাফানো: দুহাতে দড়ির দুপ্রান্ত ধরে দড়ি ঘুরানোর তালে তালে জোড়া পায়ে লাফাতে হবে। এক জায়গায়
দাঁড়িয়ে লাফানো যাবে বা চলতে চলতে অনুশীলন করা যাবে।

লাফাতে লাফাতে সঙ্গী দলভুক্ত করা: একজনে দড়ি ঘুরাবে এবং একাধিক জন দড়ির মধ্যে তালে তালে লাফাতে থাকবে।

বাঁশ বা বেতের চাকার সাহায্যে ব্যায়াম

- বেতের চাকা শূন্যে ছুড়ে দিয়ে ধরা, চাকার ভিতর দিয়ে যাওয়া-আসা, চাকার উপর দিয়ে লাফানো এবং চাকাটি কোমরে আটকে চারদিকে ঘুরানো ইত্যাদি অনেকগুলো ব্যায়াম করা যায়।

- সামনে চাকা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দৌড়ানো।
- মেঝেতে চাকা ফেলে রেখে এর ভিতর দিয়ে, বাহির দিয়ে বা পর পর ভিতর দিয়ে এক পায়ে, দুপায়ে একসাথে করে বা হাঁটু ভেঙ্গে লাফানো বা দৌড়ানো।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের সরঞ্জামবিহীন বা ছোট ছোট সরঞ্জাম দিয়ে এই ধরনের ব্যায়াম অনুশীলন করালে তাদের মধ্যে এক ধরনের সফলতা বা কৃতকার্যতার উপলব্ধি জাগ্রত হয়। যার ফলে শিক্ষার্থীরা আনন্দ ও তৃপ্তি অনুভব করে।

প্রাথমিক প্রতিবিধান

কোন দুর্ঘটনা বা প্রাকৃতিক দুর্যোগ কিংবা অন্য কোন আপদকালীন সময়ে আহত কিংবা অসুস্থ ব্যক্তিকে ডাক্তারের নিকট নিয়ে যাওয়ার পূর্বে অথবা ডাক্তারকে ঘটনা স্থলে নিয়ে আসার পূর্ব পর্যন্ত অসুস্থ ব্যক্তির অবস্থা যাতে অবনতি না ঘটে তার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করাকে প্রাথমিক প্রতিবিধান বলে।

যে জ্ঞানের দ্বারা ডাক্তারের সাহায্য পাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আহত বা অসুস্থ ব্যক্তির আরোগ্যের পথ সুগম করতে এবং তার অবস্থার যাতে আর অবনতি না ঘটে তার যথাযথ ব্যবস্থা করতে পারা যায় তাকে প্রাথমিক প্রতিবিধান বলে।

প্রাথমিক প্রতিবিধান হল চিকিৎসা শাস্ত্রের অন্তর্গত একটি প্রাথমিক বিভাগ। প্রাথমিক প্রতিবিধানকারী কখনও একজন চিকিৎসক নন। যিনি প্রাথমিক প্রতিবিধানের কাজ করেন তাঁকেই প্রাথমিক প্রতিবিধানকারী বলে।

প্রাথমিক প্রতিবিধানের উদ্দেশ্য:

- আহত ব্যক্তির জীবন রক্ষা করা।
- ক্ষতাদি যাতে বৃদ্ধি না পায় তার ব্যবস্থা করা।
- তাৎক্ষণিক প্রাথমিক চিকিৎসার শ্রেষ্ঠ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- আহত ব্যক্তি অবহেলা, কষ্ট না পায় বা বিনা চিকিৎসায় মারা না যায় তার ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- আহত ব্যক্তিকে দ্রুত ডাক্তারের নিকট বা হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করা।
- হাসপাতালে ডাক্তারের সাহায্য না পাওয়া পর্যন্ত সব দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করা।

First AID এই শব্দটি ভাংলে প্রাথমিক প্রতিবিধান কি তা সহজেই বুঝা যায়।

প্রাথমিক প্রতিবিধানের সময় বিবেচ্য বিষয়

কোন রোগীকে প্রাথমিক প্রতিবিধান প্রদান করার পূর্বে নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ রাখতে হবে:

- রোগ নির্ণয় : কী কারণে রোগ বা অসুস্থতার সৃষ্টি হয়েছে (লক্ষণ, চিহ্ন বা ইতিহাস থেকে পাওয়া যাবে)।
- চিকিৎসা: কী এবং কতটুকু চিকিৎসার প্রয়োজন।
- স্থানান্তর: রোগীকে নিরাপদ স্থানে স্থানান্তর।

প্রাথমিক প্রতিবিধানের পদ্ধতি:

প্রতিটি কাজ সঠিকভাবে সম্পাদনের জন্য কিছু সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করতে হয়। অনুরূপভাবে প্রাথমিক প্রতিবিধানের পদ্ধতি নিম্নরূপ:

- ক্ষিপ্রগতিতে অথচ শান্ত মাথায় নি:সংকোচে আগের কাজ আগে এবং পরের কাজ পরে এই নীতিতে কাজ করতে হবে।

- রোগীকে দুর্ঘটনা স্থল হতে নিরাপদ আশ্রয়ে নিয়ে যেতে হবে।
- রোগীর জ্ঞান আছে কিনা দেখতে হবে।
- নাড়ীর গতির প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে।
- শ্বাস- প্রশ্বাসের বিঘ্ন দেখা দিলে কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যবস্থা করতে হবে।
- রক্তক্ষরণ থাকলে তৎক্ষনাৎ বন্ধ করার চেষ্টা করতে হবে।
- শক্ দেখা দিলে তার প্রতিবিধান করতে হবে।
- ক্ষত থাকলে ড্রেসিং এর ব্যবস্থা করতে হবে।
- রোগীর জ্ঞান না থাকলে শরীরের কাপড় না খুলে ঢিলা করে দিতে হবে। প্রয়োজনে কেটে ফেলতে হবে।
- রোগী এবং উপস্থিত সকলকে যথাসম্ভব আশ্বাস দিতে হবে।
- অধিক ভীড় থাকলে সরাতে হবে এবং পর্যাপ্ত আলো বাতাসের ব্যবস্থা করতে হবে।
- যতটুকু না করলেই নয় শুধু ততটুকু করতে হবে। কোন ক্রমেই ডাক্তারের ভূমিকায় যাওয়া যাবে না।
- চোখের তারা অস্বাভাবিক কিনা, মুখ বিবর্ণ কিনা, মাথায় আঘাত আছে কিনা এবং রোগীকে উত্তাপ দিতে হবে কিনা এই সবের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।
- রোগীকে দ্রুত ডাক্তারের নিকট বা নিকটস্থ হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

প্রাথমিক প্রতিবিধানকারী কোন বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি দিবেন বা BBS কী?

B= Bleeding– শীঘ্রই রক্তক্ষরণ বন্ধ করা।

B= Breathing– শ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্ট হলে তার ব্যবস্থা করা।

S= Shock- শক্ হলে তার প্রতিবিধান করা।

ড্রেসিং

ক্ষতস্থানকে জীবাণুমুক্ত বা ঢেকে রাখার জন্য যে গজ, তুলা ব্যবহার করা হয় তাকে ড্রেসিং বলে। নিম্নলিখিত কারণে ড্রেসিং ব্যবহার করা হয়।

১. রক্তক্ষরণ বন্ধ করা
২. জীবাণুমুক্ত করা
৩. ক্ষতস্থানে আবার যাতে আঘাত না লাগে তার ব্যবস্থা করা

৪. ক্ষতস্থানে যাতে বাইরের দূষিত কিছু না লাগে তার ব্যবস্থা করা।

লিন্ট

জীবাণুমুক্ত ও ঔষধযুক্ত একখণ্ড কাপড়ই হলো লিন্ট। ক্ষতস্থান ভাল করে পরিষ্কার করে নিয়ে ক্ষতস্থানে এমনভাবে লিন্ট স্থাপন করতে হবে, যাতে ক্ষতস্থান সম্পূর্ণরূপে ঢেকে থাকে।

প্যাড

ক্ষতস্থানকে আরামপ্রদ রাখার জন্য যে গদি ব্যবহার করা হয় তাকে প্যাড বলে। ক্ষতস্থানে লিন্ট স্থাপন করে তার উপর প্যাড ব্যবহার করতে হয়। প্যাড, তুলা বা জীবাণুমুক্ত নরম কাপড়ের হতে পারে। প্যাড ব্যবহারের সময় লক্ষ রাখতে হবে, যাতে সম্পূর্ণ ক্ষতস্থান জুড়ে তা অবস্থান করে।

স্প্লিন্ট

ভাঙা অস্থিকে সোজা রাখার জন্য যে চটা ব্যবহার করা হয় তাকে স্প্লিন্টার বলে। ভগ্নাস্থির আকৃতির ওপর ভিত্তি করে স্প্লিন্ট এর সাইজ নির্ণয় করতে হয়। পাতলা কাঠ, হার্ডবোর্ড বা বাঁশের চটা দিয়ে স্প্লিন্ট তৈরি করা যায়। স্প্লিন্ট ব্যবহারের পূর্বে প্যাড ব্যবহার করতে হয়।

ব্যান্ডেজ

লিন্ট, প্যাড, স্প্লিন্টকে যথাস্থানে রাখার জন্য এবং ভাঙা অস্থিকে স্থির রাখার জন্য যে সাদা কাপড়টি ব্যবহার করা হয়, তাকে ব্যান্ডেজ (Bandage) বলে। ব্যান্ডেজ করার সময় কিছু বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে–

- ব্যান্ডেজ যেন পুরো ড্রেসিংটাকে ধরে রাখতে পারে;
- ব্যান্ডেজ যেন বেশি জোরে বা আলগাভাবে লাগানো না হয়;
- ক্ষতস্থানের ঠিক উপরে যেন ব্যান্ডেজের গেরো না পড়ে;
- আহত অঙ্গ অনুযায়ী নির্দিষ্ট মাপের ব্যান্ডেজের ব্যবস্থা করতে হবে;
- শক্ত কাপড়ের ব্যান্ডেজই ভাল তবে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ইলাস্টিক (Elastic) ক্রেপ ব্যান্ডেজ ব্যবহার করা হয়।

মাংসপেশীর টান (Muscle pull)

কোন মাংসপেশী যদি কাজ করতে প্রস্তুত না থাকে কিন্তু তার পরেও তার উপর অতিরিক্ত কাজ চাপানো হয়, এতে মাংসপেশীর যে পরিবর্তন হয় তাকে মাংসপেশীর টান বলে। যেমন- খেলার মাঠে দেখা যায় সঠিকভাবে ওয়ার্ম-আপ না করলে।

মাংসপেশী টানের লক্ষণ

- সাথে সাথে মাংসপেশী শক্ত হয়ে যায়।
- আহত স্থানে প্রচন্ড ব্যথা হয়।
- রোগী দাড়াতে পারে না এবং চলাফেরা করতে পারে না।

মাংসপেশী টানের প্রাথমিক প্রতিবিধান

- রোগীকে শুইয়ে দিতে হবে।
- মাংসপেশীকে প্রসারিত করার জন্য ম্যাসেজ (Massage) বা মালিশ করতে হবে।
- রোগী যেভাবে আরাম বোধ করে সেইভাবে তাকে শুইয়ে থাকতে দিতে হবে।
- মাংসপেশী প্রসারণের জন্য muscle relaxation drug ব্যবহার করতে হবে।
- রোগীকে দ্রুত ডাক্তারের নিকট বা হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

শক (Shock)

কোন আকর্ষিক দুর্ঘটনা ঘটলে, প্রচণ্ড আঘাত পেলে, নিকট আত্মীয়ের দু:সংবাদ শ্রবণ করলে ও অসুখের পর মস্তিষ্কের স্নায়ুমন্ডলীর ক্রিয়ার যে ব্যাঘাত সৃষ্টি হয় তাকে শক্ বলে। ইহা অল্প মূর্ছা হতে আরম্ভ করে এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।

শক্রের প্রাথমিক প্রতিবিধান

- রোগীকে নিরাপদ আশ্রয়ে নিয়ে যেতে হবে এবং খোলা বাতাসের ব্যবস্থা করতে হবে।
- রোগীকে সর্বদা সাহস প্রদান করতে হবে।
- রোগীর শরীরে উত্তাপ বৃদ্ধি করার জন্য কম্বল দিয়ে ঢেকে রাখতে হবে।
- মস্তিষ্কে রক্ত সঞ্চালনে সহায়তা করবে, রোগীর মাথা একটু নীচু এবং পা একটু উঁচুভাবে শয়ন করাতে হবে। রক্তক্ষরণ হলে তা তাৎক্ষনিক বন্ধ করতে হবে।
- রোগীর সহিত উৎসাহমূলক কথাবার্তা বলতে হবে, যাতে রোগীর মানসিক ব্যাকুলতা না আসে সেইদিকে দৃষ্টি দিতে হবে।
- রোগীর পরিধেয় বস্ত্রাদি ঢিলা করে দিতে হবে।
- রোগীর যদি জ্ঞান থাকে, রক্তপাত না হয় ও গলধা:করণ করতে পারে। তবে তাকে কড়া গরম চা ও কফি একটু বেশী চিনি দিয়ে খাওয়ানো যেতে পারে।
- রোগীকে কাত করে শোয়াতে হবে। যদি বমি করে ও শ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্ট হয়, তাহলে মুখ কাত করে উপুর করে শোয়াতে হবে।

হাড় ভাঙ্গা (Fracture)

দেহ কাঠামোর কোন অস্থি বা হাড় যদি দুই বা ততোধিক অংশে বিভক্ত হয়ে যায় তাকে হাড় ভাঙ্গা বলে। **হাড় ভাঙ্গার প্রাথমিক প্রতিবিধান**

- হাড় ভাঙ্গা রোগীর চিকিৎসা যতদূর সম্ভব ঘটনাস্থলেই করতে হবে। কারণ সেখান থেকে রোগীকে সরানোর সময় আঘাত বৃদ্ধি পেতে পারে। তবে ঘটনাস্থলে যদি প্রাণহানীর আশংকা থাকে তাহলে অত্যন্ত সাবধানের সহিত রোগীকে নিরাপদ স্থানে নিয়ে চিকিৎসা করতে হবে।
- রোগী যদি অচেতন হয়ে যায় তবে জ্ঞান ফিরাবার ব্যবস্থা করবে এবং জিহবা আটকে গেলে শ্বাস কষ্ট হতে পারে সেই দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।
- আহত স্থানে রক্তক্ষরণ বন্ধ করতে হবে এবং ক্ষতের চিকিৎসা করতে হবে।
- হাড় ভাঙ্গার সংগে সংগে ঠান্ডা পানি বা বরফ দিয়ে আহত অঙ্গটি অবশ করতে হবে।
- রোগীকে স্থানান্তরের আগে ভাঙ্গা স্থান স্বাভাবিকভাবে স্থাপন করে স্প্লিন্ট ও ব্যান্ডেজের সাহায্যে অঙ্গটি অনড় রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। তবে ভাঙ্গা স্থানের উপর ব্যান্ডেজ বাঁধতে নেই।
- রোগীকে দ্রুত ডাক্তারের নিকট অথবা নিকটস্থ হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

হাড় মচকানো (Sprain)

হাড়ের সংযোগ স্থান সঞ্চালনের সময় হঠাৎ মোচড়ায়ে গেলে বা বেঁকে গেলে সংযোগ স্থান সংলগ্ন স্নায়ুর স্তরে টান পড়ে বা ছিড়ে যে অসুবিধার সৃষ্টি হয় তাকে হাড় মচকান বলে।

- আহত অঙ্গে ব্যথা অনুভব করে।
- সন্ধি স্থল ফুলে যায়।
- আহত অঙ্গের চামড়ার রং বিবর্ণ হয়। যেমন- নীল বা লাল আকার ধারণ করে।
- স্বাভাবিকভাবে নাড়াচাড়া করা যায় এবং চলার সময় আহত অঙ্গে ব্যথা বৃদ্ধি পায়।

হাড় মচকানোর প্রাথমিক প্রতিবিধান

- আঘাতের সঙ্গে সঙ্গে আহত অঙ্গ ঠান্ডা পানি বা বরফ লাগানোর ব্যবস্থা করতে হবে।
- আহত স্থানটি নাড়াচাড়া করতে দেয়া যাবে না।
- মচকানো স্থানটি যথা সম্ভব আরাম দায়ক অবস্থায় রাখতে হবে।
- আহত স্থানে হাড় ভাঙ্গার ব্যন্ডেজ প্রয়োগ করতে হবে।
- ব্যান্ডেজ সব সময় ভিজা রাখবে, সম্ভব হলে বরফ লাগাতে হবে।
- প্রতিটি মচকানো হাড়কে ভেঙ্গে গেছে এই অনুমানের উপর ভিত্তি করে চিকিৎসা চালাতে হবে।
- রোগীকে দ্রুত ডাক্তারের নিকট বা নিকটস্থ হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

ক্ষত (Wound)

দেহের কোন তন্ত্র ছিন্ন হলে বা দেহ তন্তু দুই বা ততোধিক অংশে বিভক্ত হলে বা দেহতন্ত্র ছিদ্র হলে তাকে ক্ষত বলে। সাধারণভাবে ত্বক কেটে রক্তপাত হলে তাকে ক্ষত বলে।

ক্ষতের প্রাথমিক প্রতিবিধান

- রোগীকে শোয়ায়ে দিতে হবে যাতে রোগী সহজ ও নিশ্চলভাবে শুইয়ে থাকতে পারে।
- আহত হওয়ার সাথে সাথে বরফ লাগাতে হবে।
- রোগীকে যথাসম্ভব কম নাড়াচাড়া করতে হবে।
- ক্ষত স্থান এন্টিসেপটিক পদার্থ দিয়ে পরিষ্কার করতে হবে।
- রক্তক্ষরণ বন্ধ করার জন্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ চাপ দিতে হবে।
- ক্ষত স্থানে কিছু ঢুকলে তা তুলে ফেলতে হবে।
- ক্ষত স্থানে রক্ত জমাট বাঁধলে উক্ত জমাট রক্ত সরাতে চেষ্টা করবে না।
- শক্ দেখা দিলে তার চিকিৎসা করতে হবে।
- ক্ষত স্থানে জীবাণুমুক্ত প্যাড ব্যবহার করতে হবে।

নাক থেকে রক্তক্ষরণের প্রাথমিক প্রতিবিধান:

- রোগীকে একটি চেয়ারে বসাতে হবে যদি ঘরের ভিতর থাকে তবে জানালা খুলে দিতে হবে, যে দিক থেকে বাতাস আসতে সেদিকে মুখ করে বসাতে হবে।
- মাথা সোজা রেখে এবং সামান্য একটু পিছনে হেলান দিয়ে বসাতে হবে।
- নাকে বরফ লাগাতে হবে।
- ঘাড় বুক ও কোমরের কাপড় ঢিলা করে দিতে হবে।
- নাক দিয়ে নি:শ্বাস না নিয়ে মুখ দিয়ে নি:শ্বাস নিতে বলতে হবে।
- রোগীকে নাক ঝাড়তে দেয়া ও রোদে নেওয়া যাবে না।
- নাক চেপে ধরে এবং মুখ দিয়ে নি:শ্বাস নিতে বলবে, তবে খেয়াল রাখবে নাক যেন বন্ধ না হয়।
- দ্রুত ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে।

পানিতে ডোবা:

প্রাথমিক প্রতিবিধান-

- মুহূর্ত কাল বিলম্ব না করে জলমগ্ন ব্যক্তিকে পানি হতে উপরে উঠাতে হবে।
- জ্ঞান আছে কিনা পরীক্ষা করতে হবে।
- জ্ঞান না থাকলে রোগীকে উপুর করে শোয়াও মাথা যে কোন দিকে কাত করে দিতে হবে। মুখ খোলা রাখবে তারপর পিঠেই দুই পার্শ্বে চাপ দিয়ে পানি বের করতে হবে।
- রোগী শিশু হলে মাথার উপরে তুলে পা ধরে চারপার্শ্বে ঘুরাতে হবে এতে পানি বাহির হয়ে যাবে।

- রোগীর ভেজা কাপড় পরিবর্তন করে কম্বল দিয়ে শরীর ঢেকে দিতে হবে।
- জলমগ্ন ব্যক্তির শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হলে কৃত্রিম উপায়ে তা সচল করতে হবে।
- রোগীকে দ্রুত ডাক্তারের নিকট বা নিকটস্থ হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

দৈনন্দিন জীবনে দুর্ঘটনা এড়াবার সতর্কতামূলক ব্যবস্থা

আমাদের জীবনে যে কোন সময় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। এ জন্য আমাদের সতর্ক থাকতে হবে।

১। বাড়িতে চুলা, বিদ্যুৎ, কাচের দ্রব্যাদি, দা, ছুরি, ব্লেড ইত্যাদি ব্যবহারে সতর্ক হতে হবে। ছোটদের এসব থেকে নিরাপদে রাখতে হবে।

২। রাস্তায় চলাচলের জন্য রাস্তার ট্রাফিক আইন মেনে চলতে হবে।

৩। বাসে অথবা গাড়িতে সতর্কতার সাথে উঠতে ও নামতে হবে।

৪। সাঁতার না জানলে নৌকায় বা লঞ্চে চলাচলে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

৫। দুর্ঘটনা ঘটলে সাথে সাথে কাছাকাছি সাহায্যকারীর সহায়তা নিতে হবে। হাসপাতালের ও ডাক্তারের ফোননম্বর সাথে রাখতে হবে।

কাব-স্কাউটিং

স্কাউট আন্দোলনের জনক ও স্কাউটিংয়ের পটভূমি

বি-পির পরিচয়:

স্কাউট আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা রবার্ট স্টিফেনশন স্মিথ লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল অব গিলওয়েল। সারা বিশ্বে স্কাউসদের কাছে তিনি "বি-পি" নামে পরিচিত। তার জন্ম হয়েছিল ১৮৫৭ সালের বাইশে ফেব্রুয়ারি লন্ডনের হাইড পার্কে। ১৮৫০ সালে তিনি লন্ডন নগরের প্রসিদ্ধ চার্টার হাউস স্কুলে ভর্তি হন। ছোট বেলা থেকেই তিনি কৌতুহলি ছিলেন। এজন্য প্রকৃতির সাথে তার নিবিড় সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ১৮৭৬ সালে সেনাবাহিনীতে "সাব-লেফটেন্যান্ট' হিসেবে সরাসরি যোগদান করেন। মাত্র ৪৩ বছর বয়সে সর্বকনিষ্ঠ মেজর জেনারেল হিসেবে স্বীকৃতি পান। ১৯০৭ সালে তিনি চাকরি জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করেন। এ সময় থেকে তিনি বয় স্কাউটের গোড়াপত্তনের কাজে বিশেষ মনোযোগী হন। সে লক্ষ্যে তিনি ১৮৫৭ সালে পার্ল হারবারের বাউন্সি দ্বীপে পরীক্ষামূলকভাবে স্কাউটের প্রথম ক্যাম্পের আয়োজন করেন। এটিই বিশ্বের প্রথম স্কাউট ক্যাম্প।

পাক ভারত ও বাংলাদেশে স্কাউটিং:

ভারতে বসবাসরত ইংরেজ বালকদের জন্য ১৯১০ সালে প্রথমে কলিকাতা, মাদ্রাজ ও জব্বলপুরে স্কাউটিং প্রবর্তিত হয়। ভারতবাসীদের জন্য স্কাউটিং ছিল নিষিদ্ধ। ভারতবাসীদের উদ্যোগ এবং বি-পি- এর বারংবার অনুরোধের প্রেক্ষিতে বৃটিশ সরকার ১৯১৯ সালে ভারতবাসীদের স্কাউটিং করার সুযোগ দেয়। ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষের ভারত ও পাকিস্তান নামে দুইটি পৃথক রাষ্ট্র হিসাবে গঠিত হয়। বর্তমান বাংলাদেশ পাকিস্তানের "পূর্ব পাকিস্তান" প্রদেশ ছিল। ১৯৪৭ সালে ১লা ডিসেম্বর করাচীতে পাকিস্তান বয় স্কাউট এসোসিয়েশন গঠিত হয়। ১৯৪৭ সালের ২২ মে, ঢাকায় ইস্ট বেংগল স্কাউট এসোসিয়েশন গঠিত হয়।

স্বাধীনতা উত্তরকালে ১৯৭২ সালে ৮ এবং ৯ এপ্রিল ঢাকায় অনুষ্ঠিত দেশের সমগ্র স্কাউট নেতৃবৃন্দ এক কাউন্সিল সবায় মিলিত হয়ে "বাংলাদেশ স্কাউট সমিতি" গঠন করেন। সে বছর সেপ্টেম্বরে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ১১১ নং অর্ডিনেন্স বলে **"বাংলাদেশ বয় স্কাউট সমিতি"** সরকারী স্বীকৃতি লাভ করে। ১৯৭৪ সালের ১লা জুন, বিশ্ব স্কাউট সংস্থা বাংলাদেশ বয় স্কাউট এসোসিয়েশনকে ১০৫ তম জাতীয় সদস্য সংস্থা হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে। ১৯৭৮ সালে এর নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় **"বাংলাদেশ স্কাউটস"**।

বয়সভিত্তিক স্তরবিন্যাস

স্কাউট আন্দোলন সকল ধরনের ছেলে-মেয়েদের জন্য উন্মুক্ত। সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার সুবিধার্থে বাংলাদেশে স্কাউটিং তিনটি শাখায় বিভক্ত। যথা:

১. কাব-স্কাউট: যে সকল কিশোর-কিশোরীদের বয়স ৬ বছরের বেশি কিন্তু ১১ বছরের কম।

২. স্কাউট: যে সকল বালক-বালিকার বয়স ১১ বছর বা তার চেয়ে বেশি কিন্তু ১৭ বছরের কম।

৩. রোভার: যে সকল তরুণ-তরুণী কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে অথবা যাদের বয়স ১৭ বা তার চেয়ে বেশি কিন্তু ২৫ বছরের কম।

স্কাউট আন্দোলনের উদ্দেশ্য

স্কাউট আন্দোলনের উদ্দেশ্য হল ছেলে-মেয়েদের শারীরিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, সামাজিক, আধ্যাত্মিক ও মানসিক দিকগুলোর পরিপূর্ণ অন্তর্নিহিত ক্ষমতা বিকাশে অবদান রাখা, যাতে করে তারা ভারসাম্যপূর্ণ ব্যক্তি, দায়িত্বশীল নাগরিক এবং স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সদস্য হিসেবে জীবন যাপন করতে পারে।

স্কাউট আন্দোলনের মূলনীতি

স্কাউট আন্দোলন নিম্নে বর্ণিত তিনটি মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত (প্রতিজ্ঞা ও আইনের সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে) :

১) স্রষ্টার প্রতি কর্তব্য পালন (আধ্যাত্মিক দিক)

২) অপরের প্রতি কর্তব্য পালন (সামাজিক দিক)

৩) নিজের প্রতি কর্তব্য পালন (ব্যক্তিগত দিক)।

বাংলাদেশ স্কাউটসের লক্ষ্য

ক স্কাউটিং পদ্ধতি ও স্কাউট আন্দোলনের বিশ্ব সংস্থা (ওয়ার্ল্ড অর্গানাইজেশন অব দ্য স্কাউট মুভমেন্ট) এর অনুসৃত নিয়মে প্রশিক্ষণ দিয়ে শিশু-কিশোর/কিশোরী ও যুবক/যুবতীদের বিশ্বাসী, সৎ, চরিত্রবান, আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা।

খ দেশের অভ্যন্তরে বাংলাদেশ স্কাউটসের সমভাবাপন্ন অরাজনৈতিক, সামাজিক ও অসাম্প্রদায়িক যুব প্রতিষ্ঠান, বিশেষত বাংলাদেশ গার্ল গাইডসের সংগে বন্ধুত্বমূলক ও পরিপূরক সম্পর্ক বজায় রাখা।

গ বহির্বিশ্বে স্কাউট আন্দোলনের বিশ্ব সংস্থা (ওয়ার্ল্ড অর্গানাইজেশন অব দ্য স্কাউট মুভমেন্ট) এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় স্কাউট অঞ্চল ও বিভিন্ন জাতীয় স্কাউট সংস্থার সঙ্গে মতামত, স্কাউট, স্কাউটার ও ট্রেইনার বিনিময় করে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও সৌহার্দ্য বৃদ্ধির প্রয়াসী হওয়া। ।

কাব স্কাউট প্রতিজ্ঞা

আমি প্রতিজ্ঞা করছি যে,

- আল্লাহ ও আমার দেশের প্রতি কর্তব্য পালন করতে
- প্রতিদিন কারো না কারো উপকার করতে
- কাব স্কাউট আইন মেনে চলতে
  আমি আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করব।

("আল্লাহ" শব্দের পরিবর্তে নিজ নিজ ধর্মীয় বিশ্বাস অনুসারে সৃষ্টিকর্তার নাম উচ্চারণ করা যাবে)

কাব আইন

- বড়দের কথা মেনে চলা
- নিজেদের খেয়ালে কিছু না করা।

মটো (কাব-স্কাউট, স্কাউট ও রোভার একত্রে)

"সেবার জন্য সদা প্রস্তুত থাকতে যথাসাধ্য চেষ্টা করা"–সুষ্ঠুভাবে অনুসরণের জন্য স্কাউট ও রোভারদের মধ্যে মটোকে নিম্নলিখিতভাবে ভাগ করা হয়েছে–

কাব মটো–"যথাসাধ্য চেষ্টা করা"

স্কাউট মটো–"সদা প্রস্তুত"

রোভার মটো–"সেবা"

এই মটোকে সামনে রেখে কাব, স্কাউট ও রোভাররা তাদের বয়স বাড়ার সাথে সাথে নিজেদের জীবনকে গড়ে তোলার চেষ্টা করে এবং সুনাগরিক রূপে গড়ে ওঠে।

একটি কাব দল খোলার জন্য যা যা প্রয়োজন

- ২৪ জন উৎসাহী বালক/বালিকা
- একজন উৎসাহী বয়স্ক লিডার
- কাব দল পরিচালনার জন্য একটি কাব দল নির্বাহী কমিটি
- দল পরিচালনার জন্য কিছু তহবিল
- দলের কাজ করার জন্য একটি ছোট্ট কক্ষ বা স্কাউট ডেন
- কাবিং সংক্রান্ত আকর্ষণীয় প্রোগ্রাম
- প্রতিষ্ঠান প্রধানের পৃষ্ঠপোষকতা
- স্থানীয় বিশিষ্ট গন্যমান্য ব্যক্তি/অভিভাবকগণের সদিচ্ছা-সমর্থন।
- কাব ইউনিট গঠনের পর উপজেলা, জেলা ও অঞ্চল পর্যায়ে নির্দিষ্ট ফরমে আবেদন করে ইউনিট রেজিস্ট্রেশন করাতে হবে। ইউনিট রেজিস্ট্রেশন ফরম উপজেলা স্কাউটসে পাওয়া যাবে। উপজেলা স্কাউট সম্পাদকের সাথে যোগাযোগ করে কাগজপত্র ও নির্ধারিত রেজিস্ট্রেশন ফি জমা দিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়।

ষষ্ঠক পদ্ধতি

কাব স্কাউটদের সকল কাজ ষষ্ঠক পদ্ধতিতে পরিচালিত হয়। স্কাউটিংয়ে বালক-বালিকাদের নেতৃত্ব বিকাশের লক্ষ্যে একটি কাব ইউনিট (প্যাক)কে ছোট ছোট ভাগে ভাগ করে কাব-স্কাউট প্রোগ্রামসহ ইউনিটের যাবতীয় কাজ বাস্তবায়নের পদ্ধতিকে ষষ্ঠক পদ্ধতি বলে। এক কথায় বলা যায়, কাবিং-এর প্রচলিত ট্রেনিং পদ্ধতিই হচ্ছে ষষ্ঠক পদ্ধতি।

ষষ্ঠক গঠন

একটি কাব ইউনিটে সর্বনিম্ন ২টি ও সর্বোচ্চ ৪টি ষষ্ঠক থাকে। ৬ জন কাব বালক-বালিকা নিয়ে একটি ষষ্ঠক গঠিত হয়। ষষ্ঠক নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য প্রতিটি ষষ্ঠকে একজন নেতা থাকে। এই নেতাকে ষষ্ঠক নেতা বলে। ষষ্ঠক নেতার কাজে সহায়তা করার জন্য প্রত্যেক ষষ্ঠকে একজন সহকারী ষষ্ঠক নেতা থাকে। সকল ষষ্ঠকের মধ্যে উত্তম সমন্বয় সাধন ও ষষ্ঠকসমূহের কাজে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য ষষ্ঠক নেতাদের মধ্য থেকে যোগ্যতম একজনের উপর দায়িত্ব প্রদান করা হয়, তাকে সিনিয়র ষষ্ঠক নেতা বলে।

স্কাউট ডেন

কাব/স্কাউটদের জন্য নির্ধারিত কক্ষকে স্কাউট ডেন বলে। কক্ষের চারটি কোণ চার ষষ্ঠক/উপদলের জন্য বরাদ্দ থাকে। প্রতিটি কোণকে ষষ্ঠক কর্নার বলা হয়। স্ব-স্ব ষষ্ঠক কর্নারে স্ব-স্ব ষষ্ঠকের উপকরণ বা প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সাজিয়ে রাখতে হয়।

ইউনিট লিডার

একজন দক্ষ ও অভিজ্ঞ ইউনিট লিডার হতে হলে তাকে বিভিন্ন যোগ্যতা ও গুণাবলিসম্পন্ন হতে হবে। ইউনিট লিডারের যোগ্যতা ও গুণাবলি নিম্নরূপ:

যোগ্যতা

ক ইউনিট লিডারের বয়স অবশ্যই ২০ থেকে ৬৫ এবং সহকারী ইউনিট লিডারের বয়স অবশ্যই ১৮ থেকে ৬৫ বছরের মধ্যে হতে হবে।

খ অনুমোদিত ইউনিট লিডারকে সাফল্যের সাথে বেসিক কোর্স সম্পন্ন করতে হবে।

গ তাঁকে স্কাউট আদর্শে বিশ্বাসী হতে হবে।

ঘ ইউনিট লিডারের গুণাবলিসম্পন্ন হতে হবে।

ইউনিট লিডারের গুণাবলি

- স্কাউট অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হতে হবে
- স্কাউটদের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা থাকতে হবে
- ঐকান্তিকতা থাকতে হবে
- কুসংস্কারমুক্ত হতে হবে

- দু:সাধ্য সম্পাদনে সাহসী হতে হবে
- সদিচ্ছা থাকতে হবে
- কর্মতৎপর হতে হবে
- সৌজন্যবোধ থাকতে হবে
- পিতা-মাতার মত অভিভাবকসুলভ হতে হবে।

ক্রমোন্নতিশীল প্রশিক্ষণ পদ্ধতি (ব্যাজ পদ্ধতি) ও কাব প্রোগ্রাম (Progressive training) (কাব শাখা)

স্কাউট আন্দোলনের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য হল শিশু, কিশোর ও যুবকদেরকে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দিয়ে তাঁদের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল ও যোগ্য মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তোলা। অবসর সময়কে কাজে লাগিয়ে বৈচিত্র্যময় কর্মসূচির মাধ্যমে একজন স্কাউটকে পর্যায়ক্রমিক প্রশিক্ষণ নিয়ে ক্রমান্বয়ে নিজেকে যোগ্যতর করে গড়ে তোলার ধারাবাহিক প্রক্রিয়াকে ক্রমোন্নতিশীল প্রশিক্ষণ পদ্ধতি বলে। ক্রমোন্নতিশীল প্রশিক্ষণ পদ্ধতি স্কাউট পদ্ধতির অন্যতম প্রশিক্ষণ পদ্ধতি।

ধাপে ধাপে প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষতা বৃদ্ধির ধারাকে অব্যাহত রাখার জন্য বয়স ভেদে চাহিদানুসারে আনন্দমুখর প্রোগ্রামের মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর দক্ষতা অর্জনের স্বীকৃতি স্বরূপ অনুমোদিত ব্যাজ এবং অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়ে থাকে। এই জন্য ক্রমোন্নতিশীল প্রশিক্ষণকে ব্যাজ পদ্ধতিও বলা হয়।

ব্যাজ পদ্ধতি প্রবর্তনের উদ্দেশ্য:

১। দক্ষতা বৃদ্ধিতে আগ্রহী করা;

২। বিভিন্ন বিষয়ে জানার কৌতুহল সৃষ্টি করা;

৩। স্কাউটিংয়ের চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হওয়া;

৪। নেতৃত্বের বিকাশ ঘটানো;

৫। আত্ম-উন্নয়নবোধে সচেতনতা সৃষ্টি করা।

সর্বোপরি, ব্যাজ পদ্ধতির মাধ্যমে জ্ঞান, দক্ষতা এবং দৃষ্টিভংগীর উন্নয়ন সাধন করে সৎ, চরিত্রবান, আদর্শ নাগরিক গড়ে তোলা সম্ভব।

ব্যাজের প্রকারভেদ:

ব্যাজসাধারনত দুই প্রকার:

১. দক্ষতা বা এফিসিয়েন্সি ব্যাজ এবং
২. পারদর্শিতা বা প্রফিসিয়েন্সি ব্যাজ।

১) দক্ষতা বা এফিসিয়েন্সি ব্যাজ

এই ব্যাজ অর্জনের মাধ্যমে কাব শিশুদের জ্ঞান, দক্ষতা এবং দৃষ্টিভঙ্গির (attitude) উন্নয়ন সাধন করা সম্ভব। এই ব্যাজ চার প্রকার। যথা–

(ক) সদস্য ব্যাজ, (খ) তারা ব্যাজ, (গ) চাঁদ ব্যাজ, (ঘ) চাঁদতারা ব্যাজ

২)পারদর্শিতা ব্যাজ বা প্রফিসিয়েন্সি ব্যাজ

এই ব্যাজের মাধ্যমে একজন কাব তার আগ্রহ ও পছন্দ অনুসারে বিভিন্ন বিষয়ের উপর দক্ষতা বৃদ্ধি করতে পারে। কাবিংয়ে মোট ৪০টি পারদর্শিতা ব্যাজ আছে। নিম্নে এফিসিয়েন্সি ও প্রফিসিয়েন্সি ব্যাজ অর্জনের নিয়ম বর্ণনা করা হলো।

সদস্য ব্যাজ

নবাগত হিসেবে বালক/বালিকাকে সদস্য স্তরের বিষয়গুলি তিন মাস অনুশীলন করে পরীক্ষা শেষে দীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে এই ব্যাজ ইউনিট লিডার বাম পকেটের মাঝখানে পরিয়ে দিবেন।

তারা ব্যাজ : সদস্য ব্যাজ পাওয়ার কম পক্ষে ছয়-সাত মাস পরে তারা ব্যাজের সিলেবাসসহ নিম্নোক্ত ৮টি পারদর্শিতা ব্যাজের যে কোন দু'টি ব্যাজ অর্জন করতে হবে। পারদর্শিতা ব্যাজগুলো হলো–(১) সমাজসেবা; (২) গৃহ পরিচর্যা; (৩) চিত্তবিনোদন; (৪) পাখি পর্যবেক্ষণ; (৫) খেলনা তৈরি; (৬) খেলাধুলা; (৭) দড়ির কাজ; (৮) সেলাই কাজ; (৯) শিশু অধিকার। তারা ব্যাজ পোশাকের বাম হাতের কনুই এবং কাঁধের মাঝখানে পরতে হয়। পারদর্শিতা ব্যাজগুলো ডান হাতের কনুই এবং কাঁধের মধ্যে পরতে হবে।

চাঁদ ব্যাজ

তারা ব্যাজ অর্জনের পর কমপক্ষে ৬ মাস পরে চাঁদ ব্যাজের সিলেবাসসহ নিম্নোক্ত ১০টি পারদর্শিতা ব্যাজের যে কোন তিনটি ব্যাজ অর্জন করতে হবে। পারদর্শিতা ব্যাজগুলো হলো–(১) কৃষ্টি; (২) সংগ্রহ; (৩) প্রকৃতি ও পরিবেশ; (৪) কবুতর পোষা; (৫) বনকলা; (৬) সবজি চাষ; (৭) মডেল তৈরি; (৮) ক্রীড়াকুশলী; (৯) সাঁতার; (১০) হস্তলিপি। তারা ব্যাজ খুলে ফেলে সেই স্থানে চাঁদ ব্যাজ পরতে হয় এবং পারদর্শিতা ব্যাজ পূর্বের নিয়মে পরতে হবে। পূর্বের ব্যাজগুলো লাগানো থাকবে।

চাঁদতারা ব্যাজ

চাঁদ ব্যাজ অর্জনের পর কমপক্ষে ৬ মাস পরে উক্ত ব্যাজের সিলেবাস সমাপ্তসহ নিম্নোক্ত ১৩টি পারদর্শিতা ব্যাজের যে কোন তিনটি ব্যাজ অর্জন করতে হবে। পারদর্শিতা ব্যাজগুলো হলো–(১) জনস্বাস্থ্য; (২) প্রাথমিক প্রতিবিধান; (৩) নিরাপত্তা; (৪) বই বাঁধাই; (৫) পরিবেশ সংরক্ষণ; (৬) আবহাওয়া; (৭) মুরগি পালন; (৮) ফুল বাগান; (৯) চিত্রকলা; (১০) সাইকেল চালনা; (১১) ক্রীড়া; (১২) হাঁস পালন; (১৩) ভূগোল; (১৪) কোয়েল পাখি পালক। এ ব্যাজ ও পারদর্শিতা ব্যাজ পূর্বের নিয়মে পরতে হবে।

শাপলা কাব অ্যাওয়ার্ড

একজন কাবকে চাঁদতারা ব্যাজ অর্জনের অন্ততপক্ষে তিন মাস পরে শাপলা কাব অ্যাওয়ার্ডের সিলেবাস সমাপ্তসহ নিম্নোক্ত ৭টি পারদর্শিতা ব্যাজের যে কোন ৩টি ব্যাজ অর্জন করতে হবে। সাঁতার ব্যাজটি আবশ্যকীয়ভাবে অর্জন করতে হবে।

ব্যাজগুলো হল–(১) সাঁতার; (২) সাক্ষরতা; (৩) টবে চাষ; (৪) কম্পিউটার; (৫) ব্যক্তিগত লাইব্রেরি; (৬) রান্না; (৭) নকশা তৈরি। এই অ্যাওয়ার্ডটি ডান পকেটের উপর পরিধান করবে। স্কাউট ও রোভার শাখায় অংশগ্রহণকালীন সময়েও এই অ্যাওয়ার্ড পরিধান করতে পারবে।

দুস্থ মানবতার সেবা, নৈতিক মূল্যবোধের উন্নয়ন, সুসমন্বিত শারীরিক ও মানসিক বিকাশ, ধর্মীয় সহনশীলতা প্রভৃতি গুণাবলি অর্জনের সহায়ক শক্তি হিসেবে স্কাউটিং আন্দোলন বিশ্বব্যাপী প্রশংসণীয় ভূমিকা রেখে চলেছে। বাংলাদেশও

এই কার্যক্রমে গর্বিত অংশীদার হিসেবে ইতোমধ্যে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়: বিশ্ববরেণ্য খেলোয়াড়দের পরিচিতি

জে, সি, ওয়েন্স

অলিম্পিক তথা বিশ্ব ক্রীড়াঙ্গনে অবিস্মরণীয় কালজয়ী কীর্তি প্রদর্শন করে যাঁরা অমর হয়ে আছেন জে, সি, ওয়েন্স তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তিনি ১৯১৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রের এক কৃষ্ণকায় পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৩৬ সালে বার্লিন অলিম্পিকে তিনি ১০০ মিটার দৌড়, ২০০ মিটার দৌড়, দীর্ঘলাভ ও (৪×১০০) মি: রিলে-তে স্বর্ণপদক লাভ করেন। আর্য না হওয়ার কারণে তদানীন্তন জার্মানীর একনায়ক এডলফ হিটলার তাকে পদক প্রদানে অস্বীকার করেন। বার্লিন অলিম্পিকে জে সি ওয়েন্স দীর্ঘলাফে ৮.০৬ মি লাফিয়ে বিশ্বে রেকর্ড করেন। যে রেকর্ড ১৯৬৮ সালের মেক্সিকো অলিম্পিক পর্যন্ত অম্লান ছিল। ১৯৮০ সালে এ বরেণ্য এ্যাথলেট মৃত্যুবরণ করেন।

পেলে

ফুটবলের রাজা পেলেন নাম না জানে এমন ফুটবলমোদী পৃথিবীতে নেই বললেই চলে। ব্রাজিলের এ কালোমানিক তাঁর চমকপ্রদ ক্রীড়াশৈলীর কারণে সর্বকালের সর্বসেরা ফুটবলার হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাঁর পুরো নাম এডগণ এ্যারোন্টস ডু নাসিমেন্টো। ডাকনাম ডিকো। পেলে তাঁর পোশাকী নাম। ১৯৪০ সালের ২৩ অক্টোবর ব্রাজিলের ছোট শহর টেসাকোরাপের এক দরিদ্র নিগ্রো পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর ফুটবল জীবন শুর হয় মাত্র ১৬ বছর বয়সে। ১৯৫৬ সালে সান্টোসের হয়ে প্রথম বিভাগে খেলেন। ১৯৫৭ সালে ব্রাজিল দলে খেলার সুযোগ পান। ১৯৫৮ সালে পেলের কৃতিত্বে ব্রাজিল বিশ্বকাপ জয় করে। ১৯৬২ সালে আহত হলে বিশ্বকাপে পুরো ম্যাচ খেলতে পারেন নি। ১৯৬৬ এর বিশ্বকাপে তাঁকে আহত করা হয়। ১৯৭০ সালে ব্রাজিলের কাপ জয়ের গর্বিত নায়ক পেলে। ১৯৭১ সালে পেলে ফুটবল থেকে অবসর নেন। পেলের ২০ বছর খেলোয়াড়ী জীবনে ১৯২১টি প্রথম শ্রেণীর ম্যাচ খেলায় ১২৬৮টি গোল করেছেন। পেলে বিশ্বকাপে ১২টি গোল করেন। ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট নিকগণ পেলের সাথে ছবি তুলে তাতে পেলের অটোগ্রাফ নিয়েছেন।

ডিয়াগো ম্যারাডোনা

ডিয়াগো ম্যারাডোনাকে ফুটবলের সম্রাট বলা হয়। ১৯৬২ সালে আর্জেন্টিনার বুয়েন্স আয়ার্সে এক দরিদ্র পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। দরিদ্র কারখানা শ্রমিক পিতার পক্ষে নতুন বল কিনে দেয়ার সামর্থ্য না থাকায় ন্যাকড়া দিয়ে তৈরি বল দিয়ে তার ফুটবল জীবন শুরু হয়। মাত্র ১৫ বছরে প্রথম বিভাগে খেলার সুযোগ পান। মাত্র ১৬ বছর বয়সে তিনি আর্জেন্টিনা যুবদলের হয়ে যুব বিশ্বকাপ জয় করেন। ১৭ বছর বয়সে জাতীয় দলের হয়ে হাঙ্গেরীর বিপক্ষে খেলেন। ১৯৮২ সালে বিশ্বকাপে তিনি আশানুরূপ নৈপুণ্য দেখাতে পারলেন না। ১৯৮৬ সালের বিশ্বকাপে ম্যারাডোনার একক কৃতিত্বে আর্জেন্টিনা চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। ১৯৮৬ সালের বিশ্বকাপে তাঁর দৃষ্টিনন্দন, অনুপম ক্রীড়াশৈলী বিশ্বের অগণিত ফুটবলমোদীদের অনেকদিন মনে থাকবে। বিশেষ করে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে, দেয়া ঈশ্বরের হাত-এর গোল, আর মধ্যমাঠ থেকে বল নিয়ে ইংল্যান্ডের পাঁচ ডিফেন্ডারকে কাটিয়ে একক প্রচেষ্টার সেই গোল চিরস্মরণীয় হয়ে আছে ফুটবলের ইতিহাসে। ১৯৮৬ মেক্সিকো বিশ্বকাপে ম্যারোডোনা সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হয়। ১৯৯০ সালের ১৩ তম বিশ্বকাপে ম্যারাডোনা শিরোপা জয় করতে না পারলে একটি সাধারণ মানের দল নিয়ে ফাইনালে পৌঁছে যান। ১৯৯৪ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপের অংশ নিলেও তিনি নিজেকে তেমনভাবে মেলে ধরতে পারেননি।

মোহাম্মদ আলী ক্লে

বিশ্বমুষ্টিযুদ্ধের ইতিহাসে মোহাম্মদ আলী এক অবিস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। তাঁকে বলা হয় সর্বকালের শ্রেষ্ঠ মুষ্টিযোদ্ধা। নিজস্ব ঢং, ক্রীড়াশৈলী, উদ্ভাবনী শক্তির মাধ্যমেই তিনি মুষ্টিযুদ্ধের মত এক অমানবিক হিংস্র খেলাকে বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয় করেছেন। ১৯৬০ সালে রোম অলিম্পিকে লাইট হেভিওয়েটে স্বর্নপদক জিতে তিনি সকলের নজর কেড়ে নেন। ১৯৬৮ সালে তদানীন্তন হেভিওয়েট বিশ্বচ্যাম্পিয়ন সনি লিষ্টনকে প্রথম রাউন্ডেই নক-আউট পরাজিত করে তিনি বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হন। ভিয়েতনাম যুদ্ধে যোগদানে অস্বীকৃতির কারণে যুক্তরাষ্ট্র সরকার তাঁর পদক কেড়ে নেয়। ১৯৭৪ সালে তিনি জন ফোরম্যানকে পরাভূত করে দ্বিতীয় বার বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হন। এরপর লিয়ন স্পিংসকে পরাজিত করে ১৯৭৮ সালে তৃতীয়বার বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হন। মানবিক মূল্যবোধ, অনুপম চরিত্র, আর্ত-মানবতার সেবায় মোহাম্মদ আলী নিবেদিত প্রাণ।

স্যার ডোনাল্ড ব্রাডম্যান

ক্রিকেট কিংবদন্তীর মহানায়ক স্যার ডোনাল্ড ব্রাডম্যান ১৯০৮ সালে অস্ট্রেলিয়ার নিউসাউথ ওয়েলসে জন্মগ্রহণ করেন। ক্রিকেট অঙ্গনে প্রবাদ পুরুষ ডন ব্রাডম্যান যে সর্বকালের সেরা খেলোয়ার ছিলেন সেই ব্যাপারে কারো কোন সন্দেহ নেই। তিনি অসংখ্য রেকর্ডে ভরিয়ে দেন ক্রিকেট অঙ্গন। ক্রিকেট থাকবে যতদিন এই নামটি ততদিন উজ্জল নক্ষত্রের মতো জ্বল জ্বল করবে। ব্রাডম্যান এবং ক্রিকেট যেন মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ, একটা থেকে আরেকটা আলাদা করা সম্ভব নয়। তিনি শুধু একজন ক্রিকেটারই নন, একজন দক্ষ প্রশাসক এবং সিলেক্টর হিসাবে বিশেষ সুনাম অর্জন করেন।

ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ১৯২৮ সালে ব্রাডম্যান টেস্ট কেরিয়ার শুরু করে প্রথম সিরিজেই ৯৭৪ রান সংগ্রহ করে বিশ্ব রেকর্ড গড়ে সবাইকে তাক লাগিয়ে দেন। এই সিরিজে তার রানের গড় ছিল ১৩৯.৫০। পরবর্তীতে ১৯৩১ মৌসুমে দক্ষিন আফ্রিকার বিরুদ্ধে পাঁচ টেস্ট সিরিজে ২০১.৫০ গড়ে রেকর্ড সংখ্যক ৮০৫ রান করে ক্রিকেট অঙ্গনে এই মহানায়কের আগমন বার্তা সবাইকে জানিয়ে দেন। ৫২টি টেস্টে মাত্র ৮০টি ইনিংস খেলে তিনি ২৯টি সেঞ্চুরী করেন যার মধ্যে ১২টি ডাবল সেঞ্চুরী এবং ২টি ট্রিপল সেঞ্চুরী রয়েছে। ব্রাডম্যান তিনবার তার জুটির সঙ্গে বিশ্বরেকর্ড পার্টনারশীপ গড়েন। তাঁর টেস্ট কেরিয়ার এক ইনিংসে সর্বোচ্চ ৩৩৪ রান সংগ্রহ করার রেকর্ড দীর্ঘদিন অম্লান ছিল। এছাড়া তিনি প্রথমশ্রেণীর ক্রিকেটে মাত্র ২২ বলে সেঞ্চুরী এবং একদিনের ক্রিকেটে ট্রিপল সেঞ্চুরী করার কৃতিত্ব অর্জন করেন। রানিং মেশিন হিসাবে খ্যাত ব্রাডম্যান ৫২টি টেস্টে ৮০ ইনিংসে ১০ বার অপরাজিত থেকে ২৯টি শত রানসহ ৯৯.৯৪ গড়ে ৬৯৯৬ রান সংগ্রহ করা ছাড়াও ২টি উইকেট এবং ৩২টি ক্যাচ ধরেন। জীবনের শেষ টেস্টে তিনি শূন্য রানে আউট হন। এই টেস্টে মাত্র ৪ রান করতে পারলেই সংগৃহীত রানের গড় ১০০ হতো।

ব্রজেন দাশ

ইংলিজ চ্যানেল বিজয়ী বাঙালি ব্রজেন দাশের নাম কার না জানা। ঢাকার ছেলে সাঁতারু ব্রজেন দাশ চার বছরে পরপর ছয়বার ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করেন। তাঁর এ বিরল কৃতিত্বের জন্য ইংল্যান্ডের রাণী এলিজাবেথ কৌতুক করে বলেছিলেন মি: দাশ। আপনি কি ইংলিশ চ্যানেলকে গোসলখানায় পরিণত করেছেন। সাঁতারের এ অসাধারণ কৃতিত্বের জন্য ৬০ এর দশকে তৎকালীন পাকিস্তান সরকার তাকে ফাইভ অভ পারফরমেন্স খেতাব দিয়েছিলেন।১৯৫৮ সালে বাঙালি ব্রজেন দাশ ২৯ জন সাঁতারু প্রতিযোগীর মধ্যে প্রথম হয়ে ফ্রান্সের গ্রীজনিজ উপকূল হতে সাঁতার কেটে ইংল্যান্ডের ভোবার উপকূল পর্যন্ত ৩৫ কিলোমিটার অতিক্রম করে সাঁতারের জগতে এক অনন্য ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলেন। তিনি ১৯৫৮-১৯৬১ সাল পর্যন্ত ৬ বার ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করে এক বিরল গৌরব অর্জন করেন। ১৯৬১ সালে দুবার অতিক্রম করে দুবারই বিশ্ব রেকর্ড সৃষ্টি করেন। মি: দাশ ব্যক্তিগত জীবনে একজন ব্যবসায়ি ছিলেন। ঢাকার ফরাসগঞ্জ এবং স্বামীবাগে তাদের পৈত্রিক ব্যবসা ছিল। সেখানে লেগে থেকেও তিনি সাঁতারে অসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন।

কলসিন্দুরের মেয়েদের কীর্তিগাথা

ময়মনসিংহ জেলার ধোবাউড়া থানার কলসিন্দুর গ্রামে অবস্থিত কলসিন্দুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। ময়মনসিংহ শহর থেকে প্রায় ৬০ কি: মি: দূরে চিরসবুজে ঘেরা গারো পাহাড়ের পাশে প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবস্থিত গ্রাম কলসিন্দুর যেখানের মানুষেরা অতি সাধারণভাবে জীবন যাপন করে। যার অধিকাংশই অ-শিক্ষিত ও খেটে খাওয়া মানুষ। আধুনিক জীবন থেকে যাদের অবস্থান এখনও অনেক অনেক দূরে। খেলাধূলা সম্পর্কেও যাদের তেমন কোন ধারনা ছিল না। সে গ্রামটিই আজ বাংলাদেশের গর্বের একটি বিষয় হয়ে দাড়িয়েছে। কলসিন্দুরের মেয়েরা আজ দেশের ভিতরে এবং বিদেশের মাটিতে মহিলা ফুটবলে বাংলাদেশকে অন্যভাবে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে। আর কৃর্তিত্তের জন্য প্রতিকূল পরিবেশে যে দুজন ব্যক্তি তাদের নিরলস পরিশ্রম ত্যাগ-তিতিক্ষা, প্রবল ইচ্ছাশক্তি ও আগ্রহ নিয়ে কাজ করেছেন তারা হলেন মো: মফিজ উদ্দিন (সহকারি শিক্ষক, কলসিন্দুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়) এবং মিনতি রানী শীল (প্রধান শিক্ষক, কলসিন্দুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়)।

বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্টকেই কলসিন্দুরের যাত্রা শুরুর শুভক্ষণ বলা যায়। সহকারি শিক্ষক মো: মফিজ উদ্দিন ওরফে মফিজ যিনি হলেন এর আসল কারিগর। মফিজ সাহেব কোন পেশাদার বা নাম করা ফুটবল খেলোয়াড় ছিলেন না। ছোটবেলায় বন্ধুদের সাথে গ্রামে একটু আধটু খেলাধূলা করেছেন। তবে খেলাধূলার প্রতি তার ছিল এক প্রবল টান, যার থেকে তিনি প্রথমে ২০১১ সালে বঙ্গমাতা প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্টে তার স্কুল কলসিন্দুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অংশ গ্রহণ করে। কিন্তু তার এই উদ্যোগ বা প্রচেষ্টার পথ খুব সহজ ছিল না। গ্রামের সহজ-সরল মানুষেরা মেয়েদের ফুটবল খেলাকে কোন রকমের মেনে নিতে পারছিল না। প্রথম দিকে স্কুলের মেয়ে শিক্ষর্থীদের ফুটবল খেলার কথা বললে তারা লুকিয়ে পড়তো। এমকি স্কুলে আসতো না। অভিভাবকেরা অভিযোগ করতো, এছাড়া ধর্মীয় অনুশাসনের কথা বলেও নানাভাবে চাপ সৃষ্টি করা হতো তার উপর। এরূপ চরম প্রতিকূল পরিবেশেও খেলা পাগল মফিজ সাহেব প্রধান শিক্ষক মিনতি রাণী শীল এর সহযোগীতায় তার প্রচেষ্টা অব্যহত রাখেন। স্কুল শেষে শিক্ষার্থীদের বাড়ী বাড়ী যেয়ে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের বোঝাতে থাকেন এবং গ্রামের গন্যমান্য ব্যক্তিদের সহযোগীতা কামনা করেন। এভাবে চলতে থাকে মফিজ সাহেবের যাত্রা। স্কুল শেষে মফিজ সাহেবের সহকর্মীরা যখন যার যার বাড়ীতে ফিরে যান মফিজ সাহেব তখন প্রধান শিক্ষকের সহযোগীতায় মেয়েদের নিয়ে স্কুলের মাঠে ফুটবল প্রাকটিস শুরু করেন। প্রাকটিস শেষে মেয়েদেরকে যার যার বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে পরবর্তী দিনের কর্মপরিকল্পনা ঠিক করেন। অত:পর প্রধান শিক্ষকের সাথে আলোচনা শেষে রাতে বাড়ীতে ফেরেন।

এভাবে পথ-পরিক্রমায় বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিব গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট ২০১১ ও ২০১২ সালে কলসিন্দুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ঢাকা বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। এর ফলে খেলোয়াড়, অভিভাবক ও গ্রামের মানুষের ধ্যান- ধারণায় কিছুটা ইতিবাচক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। এতে করে মফিজ সাহেবের চলার পথের বাঁধা কিছুটা কমে আসে।

বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিব গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট ২০১৩ সালে কলসিন্দুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয় পর্যায়ে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। গ্রামের মানুষেরা টেলিভিশনের পর্দায় মেয়েদের খেলা দেখেন এবং আনন্দে উদ্বেলিত হয়। এখান থেকেই মফিজ সাহেবের অধিকাংশ বাঁধা বিপত্তির দূরীভূত হয় ও নতুন

করে পথ চলা শুরু হয়। অভিভাবক ও গ্রামের মানুষেরাও খেলাধূলার প্রতি মেয়েদের উৎসাহ দিতে থাকেন। অভিভাবকগণ মেয়েদের বিকেলবেলা মাঠে খেলতে যাওয়ার তাগিদ দিতে থাকেন।

মফিজ সাহেব ও কলসিন্দুরের মেয়েরা এখানেই থেমে থাকেননি। শ্রীলঙ্কায় অনুষ্ঠিত এএফসি অনুর্ধ্ব- ১৪ বালিকা আঞ্চলিক (মধ্য ও দক্ষিণ) ফুটবল চ্যাম্পিয়নশীপ ২০১৩ তে কলসিন্দুরের ২ জন খেলোয়াড় (তাসলিমা ও মার্জিয়া) বাংলাদেশের হয়ে অংশ গ্রহণ করে। এ টুর্নামেন্টে বাংলাদেশ তৃতীয় স্থান ও ফেয়ার প্লে ট্রফি লাভ করেন।

নেপালে অনুষ্ঠিত অনুর্ধ্ব- ১৪ ফুটবল চ্যাম্পিয়নশীপে বাংলাদেশ দল চ্যাম্পিয়ন হওয়ার কৃতিত্ব অর্জন করেন। বাংলাদেশ দলের খেলোয়াড়দের মধ্যে ১০ জন খেলোয়াড় ছিল কলসিন্দুরের। যারা- তাসলিমা, মাহমুদা, রূপা, শিউলি আজিম, নাজমা, শামসুন্নাহার, সানজিদা, মারিয়া মান্দা, মার্জিয়া ও তহুরা।

তাজিকিস্থানে অনুষ্ঠিত অনুর্ধ্ব- ১৪ বালিকা ফুটবল চ্যাম্পিয়নশীপ ২০১৬ তে বাংলাদেশ চ্যাম্পীয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। যারা- তাসলিমা, মাহমুদা, শামসুন্নাহার, নাজমা, মারিয়া মান্দা, সাজেদা, মার্জিয়া ও তহুরা।

মহিলা ফুটবলে বাংলাদেশ যে গৌরব অর্জন করে চলেছে তার মূলে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে কলসিন্দুরের মেয়েরা। মহিলা ফুটবলে বাংলাদেশ অনেক দূর এগিয়ে গেছে। এশিয়ান মহিলা ফুটবলে বাংলাদেশ দল ভিন্ন উচ্চতায় অবস্থান করছে।

কলসিন্দুরের মেয়েদের কৃতিত্বে খুশি হয়ে গণপজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে ২০১৬ সালে খেলোয়াড়সহ গ্রামের ৮০৩টি পরিবারে বিনাখরচে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই অর্জনে আনন্দচিত্তে কলসিন্দুরের মেয়েদের স্কুলে যাতায়াত ও বিভিন্ন যায়গায় খেলতে যাওয়ার জন্য একটি বাস উপহার দেওয়ার ইচ্ছাপোষণ করেছেন।

খেলাধূলা শুধুমাত্র শারীরিক ও মানসিক বিকাশ সাধনই করেন না। এর মাধ্যমে নিজেকে গ্রাম ও দেশকে বিশ্বের দরবারে আলাদাভাবে পরিচয় করে দেওয়ার সুযোগ হয়। নিরলস পরিশ্রম ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টাই মানুষকে যশ, খ্যাতি, সম্মান এনে দিতে পারে। সকল প্রতিকূলতার বেড়াজাল ভেঙ্গে জাতির কাঙ্খিত সাফল্যের অংশিদার হতে পারে।

একজন মফিজ সাহেব (সহকারি শিক্ষক, কলসিন্দুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়) ও মিনতি রাণী শীল (প্রধান শিক্ষক কলসিন্দুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়) তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এ কৃতিত্বে তাদের আর একজন সহযোগীর কথা না বললেই নয়। যিনি প্রধান শিক্ষক মিনতি রানী শীল এর একমাত্র পুত্র মি: রাজীব।

জাতীয় পর্যায়ে কলসিন্দুরের মেয়েদের এই অর্জনের ফলে তাদের পরিবার ও গ্রামের মানুষের জীবন যাত্রায় ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। কলসিন্দুরের মানুষের আগ্রহের জায়গাটি প্রতিদিন বিকেলে খেলার মাঠে মেয়েদের সরব উপস্থিতি। এতেই বোঝা যায় সভ্যতা বিকাশের খেলাধূলার ভূমিকা কতটাই অপরিহার্য।

খেলাধূলা হলো পৃথিবীর একমাত্র সুস্থ্য বিনোদন। আমাদের দেশের সকল স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিশেষ করে প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থীদের পড়ালেখার সাথে সাথে খেলাধূলা বাধ্যতামূলক হওয়া প্রয়োজন। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সুস্থ্য, সুন্দর ও সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের পথ দেখানো সম্ভব।

তাই আসেন সবাই বলি-

চলো চলো মাঠে চলো

মাদক ও সন্ত্রাসকে না বলো।

মাদক ও সন্ত্রাসকে না বলো

চলো চলো মাঠে চলো।

"সম্ভাবনার ভবিষ্যৎ গড়ো"

সপ্তম অধ্যায়: পাঠ পরিকল্পনা ও শিখনক্রম

নমুনা পাঠ পরিকল্পনা

<table>
<tr><th colspan="3">বিদ্যালয়ের নাম: আদর্শ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়</th></tr>
<tr><td>প
রি
চি
তি</td><td>শিক্ষকের নাম :মুনইমু আখতার
পরিচিতি মান : ১০০
শিক্ষাবর্ষ : ২০১৬-২০১৭
প্রোগ্রাম :ডিপিএড
পিটিআই ঃ পিটিআই, রাজশাহী</td><td>শ্রেণি :তৃতীয়
বিষয় :শারীরিক শিক্ষা
পাঠ শিরোনাম : দৈনিক সমাবেশ
পাঠ্যাংশ : দৈনিক সমাবেশে অংশগ্রহণ (পাঠ-০১)
সময় : ৪০ মিনিট
তারিখ : ০১/০১/২০১৬ খ্রিস্টাব্দ</td></tr>
<tr><td>শি
খ
ন
ফ
ল</td><td colspan="2">২.৩.১ দৈনিক সমাবেশে শৃঙ্খলার সাথে লাইন ও ফাইল ঠিক করে দাঁড়াতে পারবে।

২.৩.২ সমাবেশে জাতীয় পতাকার প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও জাতীয় সংগীত গাইতে পারবে।</td></tr>
</table>

শিখন শেখানো কার্যাবলি				
সোপান	বিষয়	শিক্ষকের কাজ	শিক্ষার্থীর কাজ	সময়
প্র স্ত তি	১. শুভেচ্ছা ও কুশল বিনিময়:	শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শুভেচ্ছা ও কুশল বিনিময় করব।	শিক্ষার্থীরা দাঁড়িয়ে সম্মান জানাবে ও কুশল বিনিময় করবে।	০৭ মিনিট
	২. শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনা:	আগণ ব্যবস্থাপনার পুনর্বিন্যাস করব (প্রয়োজনে)।	শিক্ষার্থীরা সহায়তা করবে।	
	৩. আবেগ সৃষ্টি:	জাতীয় সংগীতের মাধ্যমে আবেগ সৃষ্টি করব।	শিক্ষার্থীরা সক্রিয় অংশগ্রহণ করবে।	
	৪. পূর্বজ্ঞান যাচাই:	নিম্নরূপ প্রশ্নের মাধ্যমে পাঠ সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাই করব। ১/ সবুজের মাঝে লাল বৃত্ত দ্বারা কোন পতাকা বোঝানো হয়? ২/ প্রত্যেকদিন ক্লাস শুরুর আগে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা ধারাবাহিকভাবে যে সকল কাজ সম্পন্ন করেন তাকে কী বলা হয়?	শিক্ষার্থীরা সম্ভাব্য উত্তর দিতে চেষ্টা করবে। ১/ আমাদের জাতীয় পতাকা ২/ দৈনিক সমাবেশ	
	৫. পাঠ ঘোষণা:	পাঠ ঘোষণা করব ও পাঠ শিরোনাম বোর্ডে লিখব।	শিক্ষার্থীরা নিজ নিজ খাতায় পাঠ শিরোনাম লিখে নেবে।	
উ প স্থা প ন	১. ছবি প্রদর্শন:	শিক্ষার্থীদের পাঠ সংশ্লিষ্ট ছবি দেখতে দিয়ে একাকী চিন্তা ও দলে আলোচনা করে ছবি সম্পর্কে বলতে দেব।	শিক্ষার্থীরা নির্দেশমত কাজ করবে এবং প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করবে।	২৫ মিনিট
	২. বিষয়বস্তুর বিবরণ ও প্রশ্নোত্তরে আলোচনা:	অত:পর মাল্টিমিডিয়ার সাহায্যে ভিডিও প্রদর্শনের মাধ্যমে ও প্রশ্নোত্তরে দৈনিক সমাবেশ, লাইন, ফাইল সম্পর্কে আরো স্পষ্ট ধারণা পেতে সহায়তা করব।	শিক্ষার্থীরা ভিডিও দেখে বোঝার চেষ্টা করবে এবং ছোট ছোট প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে চেষ্টা করবে।	

	৩. দলে ও জোড়ায় কাজ (মাঠে)	শিক্ষার্থীদের কয়েকটি দলে ভাগ করে ও জোড়ায় অনুশীলন করতে সহায়তা করব। যেমন:- ০১ । দলে: লাইন ফাইল তেরি ও সোজা করা, জাতীয় পতাকার প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া। ০২ । জোড়ায়: জাতীয় পতাকার প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া।	শিক্ষার্থীরা নির্দেশনা অনুযায়ী অনুশীলন করবে।	
মূ ল্যা য় ন	প্রদর্শন (দলে ও জোড়ায়/একক)	শিক্ষাথীদের পাঠের অগ্রগতি যাচাইয়ের জন্য (দলে ও জোড়ায়) নির্দেশনা অনুযায়ী কাজকরতে দেব। যেমন: ০১। লাইন ফাইল সোজাকরে দাড়াও (দলীয়) ০২। জাতীয় পতাকার প্রতি সম্মান প্রদর্শন কর (দলে ও একক) ০৩। সমস্বরে জাতীয় সঙ্গীত আরাম্ভ কর (দলে ও জোড়ায়) প্রয়োজনে ফিডব্যাক/ নিরাময়ের ব্যবস্থা করবো।	শিক্ষার্থীরা নির্দেশনা অনুযায়ী কাজ করবে।	৮ মিনিট
পাঠ সমাপ্তি ও শ্রেণিকক্ষ ত্যাগ:		বোর্ড পরিস্কার করে উপকরণাদি গুছিয়ে শিক্ষার্থীদের ধন্যবাদ জানিয়ে শ্রেণিকক্ষ ত্যাগ করব।	শিক্ষার্থীরা দাঁড়িয়ে শিক্ষককে সম্মান জানাবে।	
উপকরণ:		MMP, বাঁশি, পাঠ সংশ্লিষ্ট ছবি		

নমুনা পাঠ পরিকল্পনা

	বিদ্যালয়ের নাম : শিশুমেলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়					
পরিচিতি	শিক্ষকের নাম	:	মুর্শিদা জাহান কথা	শ্রেণি	:	চতুর্থ
	পরিচিতি মান	:	২০০	বিষয়	:	শারীরিক শিক্ষা
	শিক্ষাবর্ষ	:	২০১৭-১৮	পাঠ শিরোনাম	:	ফুটবল
	কোর্স	:	ডি পি এড	পাঠ্যাংশ	:	বল পাসিং ও ট্রাপিং/ রিসিভিং
	পি টি আই	:	পি টি আই, খুলনা	সময়	:	৪০ মিঃ
				তারিখ	:	০৭/০৮/২০১৮ খ্রিঃ
শিখনফল	০১। সামনা সামনি দাঁড়িয়ে একজন আরেকজনের কাছে রোলিং পাস দিতে পারবে। ০২। খেলার মধ্যে সোল ট্রাপিং ও থাই ট্রাপিং করতে পারবে।					

শিখন-শেখানো কার্যাবলি				
সোপান	বিষয়	শিক্ষকের কাজ	শিক্ষার্থীর কাজ	সময়
প্রস্তুতি	১. সালাম ও কুশল বিনিময় :	শ্রেণি কক্ষে প্রবেশ করে সালাম ও কুশল বিনিময় করব	শিক্ষার্থীরা দাঁড়িয়ে সম্মান জানাবে ও কুশল বিনিময় করবে	৭ মিনিট
	২. শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনা :	আগণ ব্যবস্থাপনার পূণবিন্যাস করব (প্রয়োজনে)	শিক্ষার্থীরা সহায়তা করবে	
	৩. আবেগ সৃষ্টি :	একজন বরেণ্য খেলেয়াড়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয়ের মাধ্যমে	শিক্ষার্থীরা সক্রিয় অংশ গ্রহণ করবে	
	৪. পূর্বজ্ঞান যাচাই :	ছোট ছোট প্রশ্নের মাধ্যমে পূর্বজ্ঞান যাচাই করব। যেমন– (ক) আমরা পা দিয়ে কোন খেলা করি। (খ) কিভাবে বল রিসিভ/ট্রাপ করতে হয়।	শিক্ষার্থীর সম্ভাব্য উত্তর দিতে চেষ্টা করবে। (ক) ফুটবল, (খ) পা দিয়ে, বুক দিয়ে, মাথা দিয়ে।	
	৫. পাঠ ঘোষনা :	পাঠ ঘোষনা করে বোর্ডে পাঠশিরোনাম লিখব	শিক্ষার্থীরা নিজ নিজ খাতায় পাঠ শিরোনাম লিখে নেবে	
উপস্থাপন	১. ছবি প্রদর্শন :	শিক্ষার্থীদের পাঠ সংশ্লিষ্ট ছবি দেখতে দিয়ে একাকী চিন্তা ও দলে আলোচনা করে ছবি সম্পর্কে বলতে বলব	শিক্ষার্থীরা নির্দেশমত কাজ করবে ও প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করবে।	২৫ মিনিট
	২. বিষয়বস্তুর বিবরণ ও প্রশ্নোত্তরে আলোচনা :	ভিডিও প্রদর্শন ও প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে বিষয়বস্তু সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পেতে সহায়তা করব।	শিক্ষার্থীরা ভিডিও দেখে বোঝার চেষ্টা করবে এবং ছোট ছোট প্রশ্নের উত্তর দেবে।	
	৩. পাঠ্য পুস্তক পঠন :	শিক্ষার্থীদের নিম্নস্বরে (পাঠ্যাংশ) পড়তে সহায়তা করব।	শিক্ষার্থীকে নিম্নস্বরে (পাঠ্যাংশ) পড়বে।	
	৫। দলে ও জোড়ায় কাজপ্রদান (মাঠে)	শিক্ষার্থীদের কয়েকটি দলে ভাগকরে ও জোড়ায় অনুশীল করতে সহায়তা করব। যেমন : দলে-	শিক্ষর্থীরা নির্দেশনা অনুযায়ী অনুশীল করবে।	

		০১। বল রোলিং পাস করা। ০২। বল সোল ট্রাপ/ রিসিভ করা। ০৩। বল থাই ট্রাপ/রিসিভ করা। জোড়ায়: ০১। বল রোলিং পাস করা ০২। বল সোল ট্রাপ/ রিসিভ করা। ০৩। বল থাই ট্রাপ/রিসিভ করা।		
মূল্যায়ন	৫। প্রদর্শন (দলগত ও জোড়ায়)	শিক্ষার্থীদের পাঠের অগ্রগতি যাচাই করার জন্য (দলীয় ও জোড়ায়) নির্দেশনা অনুযায়ী কাজ করতে দেব। যেমন: দলীয় ০১। বল রোলিং পাস দাও। ০২। বল সোল ট্রাপ/ রিসিভ কর। ০৩। বল থাই ট্রাপ/ রিসিভ কর। জোড়ায় :- ০১। বল রোলিং পাস দাও ০২। বল সোল ট্রাপ/ রিসিভ কর। ০৩। বল থাই ট্রাপ/ রিসিভ কর। প্রয়োজনে ফিডব্যাক/ নিরাময়ের ব্যবস্থা করবো।	শিক্ষর্থীরা নির্দেশনা অনুযায়ী অনুশীল করবে।	৮ মিনিট

পাঠ সমাপ্তি ও শ্রেণিকক্ষ ত্যাগ:	বোর্ড পরিস্কার করে সকল সরঞ্জামাদি গুছিয়ে ধন্যবাদ জানিয়ে শ্রেণিকক্ষ ত্যাগ ।	শিক্ষার্থীরা দাড়িয়ে সম্মান জানাবে।	
উপকরণ	মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, ছবি, কোন, বাশি ও ৪টি ফুটবল।		

সহায়কগ্রন্থপঞ্জি

১. মোঃ আবদুল হক (১৯৯৪), শারীরিক শিক্ষার সংগঠন ও প্রশাসন, দিশা প্রিন্টার্স, চতুর্থ সংস্করণ, রাজশাহী।

২. মোঃ মকবুল মাহমুদ ভূঁইয়া (১৯৯৯), স্বাস্থ্য শিক্ষা ও প্রাথমিক চিকিৎসা, উত্তরা অবসেট প্রিন্টিং প্রেস, রাজশাহী।

৩. মুহাঃ খায়রুল ইসলাম খান ও সুদর্শন ভৌমিক (২০০২), শারীরিক শিক্ষার তত্ত্ব ও নীতি, প্রিন্টিং নেটওয়ার্ক, কাটাবন , ঢাকা।

৪. আব্দুল মালেক তালুকদার (২০০০), মাইনর গেমস (মজার খেলা), র‌্যাংক কালারগ্রাফিক্স, পুরানা পল্টন, ঢাকা।

৫. রতন কুমার সরকার (২০০১), ব্যাডমিন্টনের আইন কানুন, উত্তরণ প্রেস, রাজশাহী ।

৬. মোঃ মাজহারুন পারভেজ (১৯৯৩), ক্রিকেট খেলার নিয়ম কানুন, আর্শিবাদপ্রকাশনী, ঢাকা ।

৭. মোঃ আব্দুল হামিদ (১৯৯৬), খেলাধুলার আইন কানুন, নওরোজ সাহিত্য সংসদ, বাংলাবাজার ঢাকা।

৮. ব্রিটিশ কাউন্সিল বাংলাদেশ (২০১২), খেলতে খেলতে শেখা, ঢাকা ।

৯. মোঃ বিল্লাল হোসেন (২০০১), প্রশ্নোত্তরে এ্যাথলেটিক্স, ঢাকা।

১০. আহম্মেদ জাকি রায়হান (২০১৫), এক্সপ্রেসিভ আর্ট (শারীরিক শিক্ষা), জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী (নেপ), পরিমার্জিত সংস্করণ, ময়মনসিংহ।

১১. সৈয়দ মাজহারুল পারভেজ (২০১০), ক্রিকেট খেলার আইন-কানুন, সাহিত্যমালা, ঢাকা।

১২. ডাঃ মহসীন উদদীন আহমেদ (২০১৬), প্রাথমিক চিকিৎসা, আলোঘর, ঢাকা।